তথ্য অধিকার আইন

তৃণমূলের কণ্ঠস্বর

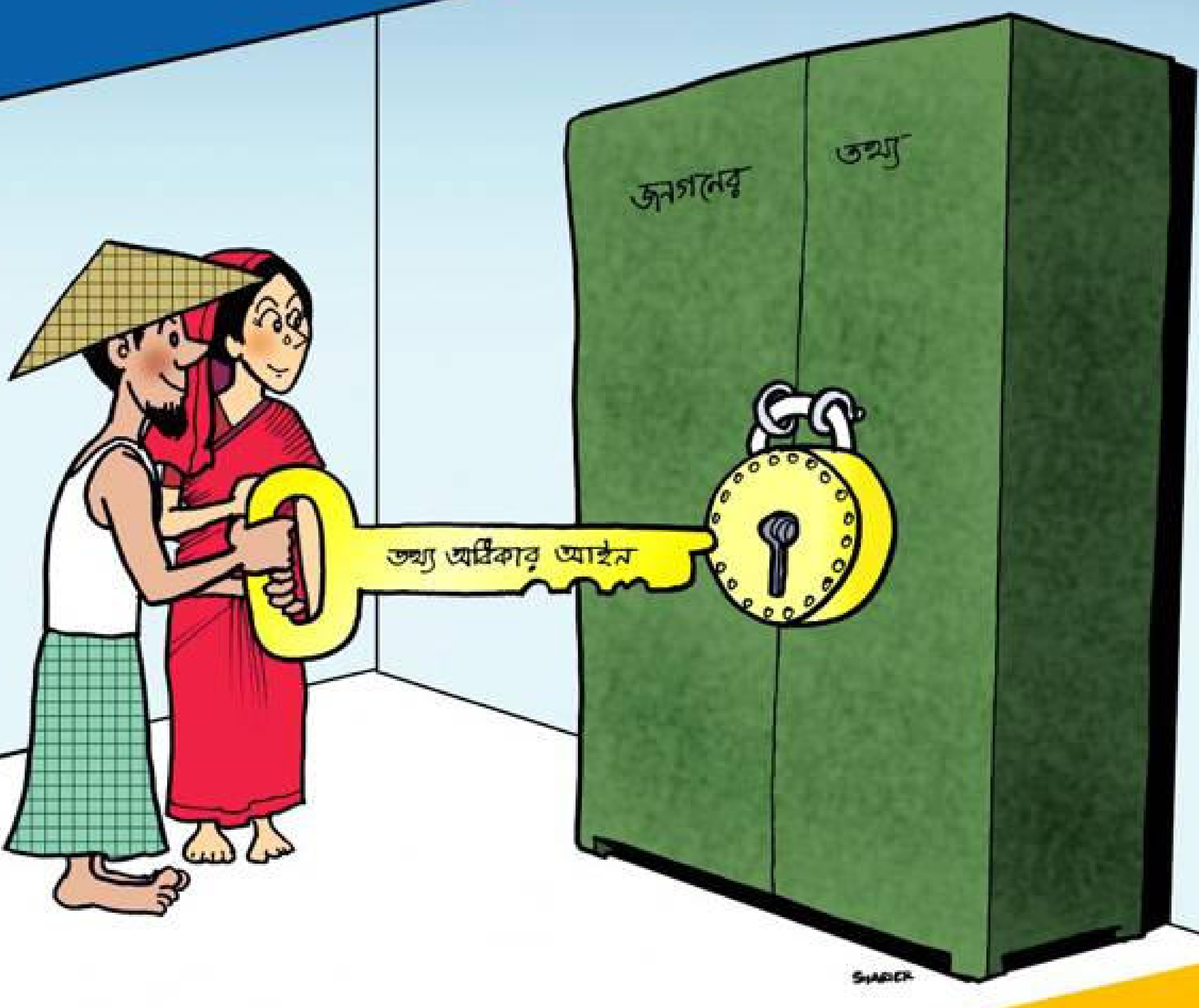

তথ্য অধিকার আইন

তৃণমূলের কণ্ঠস্বর

USAID
PROGATI Promoting governance, accountability, transparency and integrity
MRDI

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ২০১০

সংকলন ও সম্পাদনা : অনন্য রায়হান

ডিজাইন : গোলাম মোস্তফা কিরণ, মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

ISBN : 978-984-33-2790-1

বাংলাদেশে মুদ্রিত

MRDI

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
২/৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮০-২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮০-২-৯১৩৪৭১৭
ই-মেইল : bmrdi@yahoo.com, mrdi@citech.net

বিষয়সূচি

ভূমিকা ১

সংক্ষিপ্তসার
ক. তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা ৪
খ. তথ্য কমিশন সম্পর্কে ধারণা ৬
গ. তথ্য অধিকার আইনের সবলতা দুর্বলতা ৭
ঘ. তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের ঘটনাসমূহ ৮
ঙ. তথ্য অধিকার প্রয়োগে/বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ৯
চ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে করণীয়সমূহ ১১
ছ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিমাপের মাপকাঠিসমূহ ১৫
উপসংহার ১৭

বিভাগীয় আলোচনাসমূহ
খুলনা বিভাগ ২৪
রাজশাহী বিভাগ ৪৬
চট্টগ্রাম বিভাগ ৭২
বরিশাল বিভাগ ৯৮
সিলেট বিভাগ ১২৮
জাতীয় সেমিনার ১৩৬
অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের তালিকা ১৬০

ভূমিকা

সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের জবাবদিহিতা সৃষ্টিতে তথ্য অধিকারের গুরুত্ব নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। সংবাদপত্র, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের জনমত সৃষ্টি, আন্দোলন এবং সরকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করার ফসল হলো ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ২০তম আইন হিসেবে তথ্য অধিকার আইন অনুমোদন। সরকারের সদিচ্ছা এবং নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার মনোভাব এ ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করেছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পর আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং অন্যান্য স্বার্থগোষ্ঠীর ধারণা কী এবং আইন কার্যকর করতে করণীয় কী, জানা জরুরি। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা, সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে জানতে ইউএসএআইডি প্রগতির সহযোগিতায় ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) সারা দেশে বিভাগীয় শহরগুলোতে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম বিভাগীয় শহরে চারটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া সিলেট বিভাগের তথ্য অধিকার-সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের লিখিত মতামত নেয়া হয়। মতবিনিময় সভায় যেসব স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সেগুলো হলো : মিডিয়া (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক), শিক্ষা (শিক্ষক ও ছাত্র), আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, উন্নয়ন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ইত্যাদি। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যার শ্রুতি ধারণ করা হয়। এ ছাড়া কয়েকটি বিষয়ে লিখিত মতামত আহ্বান করা হয়। বিভাগীয় মতবিনিময় সভাগুলোর আলোচনার সারসংক্ষেপ ঢাকার জাতীয় সেমিনার *রাইট টু ইনফরমেশন: হাউ টু মুভ ফরওয়ার্ড*-এ উপস্থাপিত হয়। জাতীয় সেমিনারে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী মহোদয়, তথ্যসচিব, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত, প্রধান তথ্য কমিশনার এবং আরটিআই ফোরামের আহ্বায়ক। আলোচক হিসেবে ছিলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ও ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম। আরও উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় শহরগুলো থেকে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ। এই রচনাটি মূলত বিভাগীয় মতবিনিময় সভা এবং জাতীয় সেমিনারের আলোচনার ও লিখিত মতামতের সংশ্লেষ মাত্র। এই রচনাটির সঙ্গে সংযুক্ত আছে বিভাগীয় সভাগুলো এবং জাতীয় সেমিনারের সম্পূর্ণ আলোচনার লিখিত রূপ।

আলোচনায় মানুষের আশা, বিশ্বাস, ভূমিকা ও করণীয় নিয়ে খুব খোলামেলা মতামত উঠে এসেছে। মতামত সংকলনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, যেন মতপ্রদানকারী কারো পূর্বানুমতি ছাড়া নাম প্রকাশ না পায়। অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে বক্তব্য বিকৃত না করে ভাষাগত পরিমার্জন করা হয়েছে। এই আলোচনা সংকলনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের চিন্তার গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে এবং সামনের দিনে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সুফল পেতে দিক-নির্দেশনা উঠে এসেছে।

সংকলনটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

১. সংক্ষিপ্তসার

২. বিভাগীয় আলোচনাসমূহ

মতবিনিময় সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ব্যুরো-প্রধান ফরিদ হোসেন; ডি.নেটের নির্বাহী পরিচালক ড. অনন্য রায়হান, আইন বিশেষজ্ঞ মো. মইনুল কবির; ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম। র‍্যাপোর্টিয়ার ছিলেন ডি.নেটের প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টেন্ট শেখ রফিকুল ইসলাম। তারা সকলেই কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

জাতীয় সেমিনারসহ সকল মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

বিভাগীয় সভাগুলোর আয়োজন ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমাদের ধন্যবাদ এমআরডিআই-এর সমন্বয়কারী সাংবাদিক এম নাসিরুল হক, চট্টগ্রাম; এস এম হাবিব, খুলনা; লিটন বাশার, বরিশাল; আনোয়ার আলী সরকার, রাজশাহী এবং সংগ্রাম সিংহ, সিলেট- এর প্রতি।

সংকলনটি প্রকাশ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ইউএসএআইডি প্রগতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার দাবিদার ।

সংক্ষিপ্তসার

ক তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা

বিভাগীয় শহরগুলোতে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির আলোচনায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে ধারণার বিষয়টি সরাসরি আলোচনায় আসে। এ ছাড়া বক্তাদের আলোচনা থেকেও তথ্য অধিকার ও আইন সম্পর্কে বিদ্যমান ধারণা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে।

সাধারণভাবে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সবার মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণার আভাস মিললেও তথ্য অধিকার আইন নিয়ে অধিকাংশের স্পষ্ট ধারণার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, এখনো অধিকাংশের ধারণা—তথ্য অধিকার আইনের সুবিধাভোগী হচ্ছে গবেষক, সাংবাদিক ও আইনজীবী। তথ্য কমিশনের কার্যপরিধি নিয়েও বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক বিভ্রান্তি লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া আইনের প্রয়োগ, প্রস্তুতি ও করণীয় নির্ধারণের থেকে আইনের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনায় উৎসাহ বেশি লক্ষ করা গেছে। আইন বাস্তবায়নে নিজেদের ভূমিকার চেয়ে সরকারের ত্রুটি অন্বেষণে আগ্রহ বেশি দেখা গেছে। তা ছাড়া আইন কার্যকর করতে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হয়েছে বেশি, এই সংশ্লেষ সংশ্লিষ্ট অংশের দৈর্ঘ্যও তার প্রমাণ।

সার্বিকভাবে আইন সম্পর্কে ধারণাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

ইতিবাচক ধারণাসমূহ

- আইনটিকে সময়োপযোগী ও জনবান্ধব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, এতে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে।
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এই আইনটি গণতন্ত্রকে আরো সুসংহত করবে। জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এ আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। এই আইনটি পাস হওয়া এবং তার বাস্তবায়নের কারণে আমাদের অনেক অধিকার রক্ষিত হবে।
- 'তথ্য অধিকার আইনটি জনগণের মৌলিক অধিকারকে আরো বেশি কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য বা নিশ্চিত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।'
- তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা গেলে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে, চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।
- 'এই আইনের মাধ্যমে আমরা এখন আমাদের অধিকারগুলো বাস্তবায়ন না হলে তার জন্য সরকারের কাছে জবাবদিহিতা চাইতে পারব।'
- তথ্য অধিকার আইন হওয়ার ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কাজ সহজ হবে। যারা তথ্য দিচ্ছেন, তারা যেমন নিশ্চিত মনে তথ্য দিতে পারবেন, তেমনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তথ্য-প্রমাণভিত্তিক হবে।
- মতবিনিময় সভাসমূহে অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন মূলত সাংবাদিক ও গবেষকদের বেশি দরকার এবং তাদের জন্য এটি একটি অস্ত্রস্বরূপ।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কেউ কেউ জানান, তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার কারণে তাদের কাজ করতে সুবিধা হয়েছে।
- একজন মাঠ পর্যায়ের কর্মীর বক্তব্য : 'বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে ইউনিয়ন পর্যায়ের তথ্য উপজেলার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদে যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত।'

- একজন সরকারি কর্মকর্তার বক্তব্য : 'তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার আগেও আমরা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিতাম। এখনো দিচ্ছি। তবে এখন দেয়ার ক্ষেত্রটা অনেক বেশি সহজ, নিয়মতান্ত্রিক ও জবাবদিহিতামূলক। এই আইন পাস হওয়ার কারণে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনের কারণে তথ্যের অবাধ মালিকানাও জনগণের কাছে ন্যস্ত হবে।'
- তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সবার মন-মানসিকতার পরিবর্তনের সূচনা হবে।
- এই আইন বাস্তবায়নের ফলে সরকারের কাজের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
- এই আইন কার্যকর হলে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ হবে।

নেতিবাচক ধারণা

- তথ্য অধিকার আইনের দুটি দিক রয়েছে : একটি হলো তথ্য চাহিদার দিক এবং আরেকটি তথ্য সরবরাহের দিক। তথ্য চাহিদা সৃষ্টি করে যদি সরবরাহ নিশ্চিত করা না যায়, তা হলে আইন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।
- খুলনার একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তথ্য অধিকার সম্পর্কে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কারো কারো তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণার অভাব দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনা করেছি, তাদের যদি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এই জ্ঞান থাকে তাহলে সাধারণ জনগণের কি জ্ঞান থাকতে পারে?'
- মতবিনিময় সভাসমূহে অনেকে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, বাংলাদেশে এখন সবকিছুর নিয়মই অনিয়মে পরিণত হয়েছে। সবকিছুর আগে এ অনিয়ম রোধ করা প্রয়োজন। প্রশাসন এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে এবং ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নয়। তথ্য আনতে গেলে টাকা দিতে হয়। যেখানে যে কাজের জন্য যাই না কেন, সেখানেই ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে হয়। সেখানে এই তথ্য অধিকার আইন কতটুকু কার্যকর হবে তা বলা মুশকিল।
- এ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্য থেকে দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ না করতে পারলে দেশে কোনো আইনই সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেন, 'সাধারণ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সমাজের কজন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে? এই আইন পাস হওয়ার এক বছর পরেও শিক্ষিত সমাজ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানে না। এমনকি আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও যদি ধরি, এখানেও ২৭ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে কজন এই আইন সম্পর্কে জানে? শিক্ষকরাও বা কজন জানেন? না জানার কারণ এই আইনের প্রচার কম হয়েছে। যেভাবে প্রচার-প্রচারণার করা উচিত ছিল আমার মনে হয় তা সম্ভব হয়নি।'
- সাধারণ নাগরিকের আইন সম্পর্কে ধারণা দিতে একজন সাংবাদিক বলেন, 'তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণ বা জনগণের মধ্যে যে একটু সচেতন, সাংবাদিকদের জন্যই এই আইনটি করা হয়েছে। তথ্য সাংবাদিকদের প্রয়োজন। এটা যে সকলের জন্য, সবার তথ্য অধিকার পাওয়ার জন্য করা হয়েছে তা তারা জানে না। তারা ভাবে, আমাদের তথ্য প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া অধিকাংশ জনগণ এই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না। তাদের আমরা জানাতে পারিনি। আমার মনে হয়, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রচারণা করা দরকার ছিল, তা করতে পারিনি।'

হিতে বিপরীত

'আমি একজন মাঠ পর্যায়ের সংবাদকর্মী। সে অবস্থান থেকে আমার কথাগুলো বলা। আমি এই আইন পাস হওয়াতে ঝামেলায় আছি। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, কেমন বেকায়দায় আছেন। আমি বলতে পারি যে, এই আইন পাস হওয়ার আগে আমার তথ্য সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু পাস হওয়ার পর আমার জন্য ঝামেলা হয়েছে। আগে আমি এক দিনের মধ্যে একটা ভালো রিপোর্ট করার জন্য তথ্য পেতাম। এখন সেটা এই তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পরে পাই না। এখন দেখি সেটা হিতে বিপরীত আকার ধারণ করেছে।'

সাংবাদিক, চট্টগ্রাম বিভাগ

কোনটি সত্য?

আইনের ব্যাখ্যা : তথ্য কমিশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবান টাউন হলে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন-সম্পর্কিত মতবিনিময় এবং অবহিতকরণ সভায় দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিনিধি জনাব বুদ্ধ জ্যোতি চাকমা এবং এটিএন বাংলা'র প্রতিনিধি মিনারুল হকের প্রশ্নের জবাবে বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান বলেন, দেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হলেও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এখনো অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট চালু রয়েছে। এ আইনে সরকারি কোনো তথ্য ফাঁস হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, এমনকি চাকরিচ্যুতির বিধানও রয়েছে। তাই ইচ্ছা থাকলেও তারা সাংবাদিক বা তথ্য চেয়ে আবেদনকারীদের তথ্য দিতে সাহস পাচ্ছেন না। এ প্রসঙ্গে ঊর্ধ্বতন মহলের একজন প্রতিনিধি, অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টকে কীভাবে তথ্য অধিকার আইনবান্ধব করে তোলা যায়, তার উপায় খুঁজে দেখার কথা বলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, তথ্য অধিকার আইনের দ্বিতীয় উপধারায় আইনটিকে এ সংক্রান্ত সকল আইনের ঊর্ধ্বে (অবশ্যই সংবিধান ছাড়া) স্থান দেয়া হয়েছে। তাহলে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট কার্যকর থাকার প্রশ্ন কীভাবে আসছে?

সাংবাদিক, পার্বত্য চট্টগ্রাম

খ তথ্য কমিশন সম্পর্কে ধারণা

- তথ্য কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, খোলামেলা ও অংশগ্রহণভিত্তিক। কিন্তু তা হয়নি।
- তথ্য অধিকার আইনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে তথ্য কমিশনের ওপর। তাই এই কমিশনকে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ দেখতে চান সকলে।
- তথ্য কমিশন নিজেদের গোছাতে যথেষ্ট সময় নিচ্ছে, যার ফলে আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে।
- তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১২ অনুযায়ী, তথ্য কমিশন সর্বোচ্চ তিনজন কমিশনার নিয়ে গঠিত, যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।
- তথ্য কমিশন যথাসময়ে গঠিত না হওয়ায় আইনের একটি দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।
- তথ্য কমিশন আইনটির ২৯ ধারার এমন একটি মৌখিক ব্যাখ্যা দিয়েছে, যে তথ্য প্রদান বিষয়ে তাদের কোনো রায়ের বৈধতা নিয়ে আদালতে মামলা করা যাবে না। এটি আইনের বড় সীমাবদ্ধতা।
- তথ্য কমিশনে সরকারি আমলার প্রাধান্য একটি সমস্যা।
- কমিশনারবৃন্দের পদমর্যাদা আরো স্পষ্ট করা দরকার।
- তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা তথ্য কমিশনের কাছে জানাতে হবে। বর্তমানে শাখা কার্যালয় না থাকায় প্রধান কার্যালয়ে জানাতে হবে, যা বেশিরভাগ মানুষের জন্য অসম্ভব। এজন্য তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভিযোগের ব্যবস্থা করা দরকার।
- অনেকে কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
- তথ্য কমিশনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত নিজেদের ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানো।
- তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন ধারা ব্যাখ্যা করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজে তথ্য কমিশন এ বিষয়ে পুস্তিকা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি তৈরি করতে পারে এবং এ বিষয়ে এনজিওদের সহযোগিতা নিতে পারে।
- তথ্য কমিশনের কাজে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত প্রয়োজন।

গ তথ্য অধিকার আইনের সবলতা দুর্বলতা

বিভাগীয় সভাসমূহের আলোচনায় তথ্য অধিকার আইনের সবলতা ও দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা হয়। নিচে এ বিষয়ে আলোচনার উল্লেখযোগ্য অংশ উপস্থাপিত হলো।

সবলতা

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সবল দিক হলো স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ কেউ কোনো তথ্য না চাইলেও কর্তৃপক্ষসমূহকে আইনে চিহ্নিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করতে হবে।
- এই আইন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে—বাংলাদেশের খুব কম আইন বাস্তবায়নে পৃথক কমিশন রয়েছে।
- এই আইনে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে, যা একটি মাইলফলক।
- তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা সমস্যা সৃষ্টি করলে শাস্তি হিসেবে জরিমানার বিধান রয়েছে।
- এই আইনে প্রতিবন্ধীদের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। এটা একটা খুব ভালো দিক।

দুর্বলতা

- একটি তথ্য পেতে হলে বর্তমানে যে আইন করা হয়েছে তাতে বেশ সময় লেগে যাবে। তথ্য চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহের জন্য এই আইন সংশোধন করার প্রয়োজন রয়েছে।
- একজন সরকারি কর্মকর্তা আইনের সমালোচনা করে বলেন, 'আইনের ২৭(৪) ১ ও ৩ এ শাস্তির বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে জরিমানা (দৈনিক ৫০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা) ও বিভাগীয় শাস্তির কথা। এ ছাড়া আর্থিক ক্ষতিপূরণের কথাও বলা হয়েছে। এখন দুটি শাস্তির জন্য ১০,০০০ টাকা জরিমানা করলে আমার বেতন থাকবে না। তাতে করে আমাদেরকে দুর্নীতির দিকে ধাবিত করানো হবে। জরিমানা ও অসদাচরণ দুটো শাস্তির বিধান দরকার নেই। দুটো শাস্তিকে একটি করা যায়। এ ক্ষেত্রে অসদাচরণের শাস্তির বিধান করা উচিত। এটির সংশোধন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।'
- এই আইনে দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের কোনো ব্যাখ্যা নেই। তার ফলে প্রকৃত তথ্য প্রাপ্তির সময় আরো বেড়ে যাবে।
- এই আইন বাস্তবায়নে মূল সমস্যা হলো অর্থ। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দ থাকা দরকার এবং তা শুধু তথ্য কমিশনের জন্য নয়।
- প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই এমন পরিস্থিতির তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ।
- দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য চাইলে তার জবাব কত দিনের মধ্যে দিতে হবে সে ব্যাপারে আইনে কিছু বলা নেই।
- আইনে 'হুইসেল ব্লোয়ারস প্রোটেকশন' নিয়ে কিছু বলা নেই, যার ফলে দুর্নীতি ঘটে যাওয়ার আগে ঠেকানোর জন্য কর্তৃপক্ষের অভ্যন্তরে সৎ ব্যক্তি এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে আগ্রহী হবেন না। (ইতোমধ্যে সরকার 'হুইসেল ব্লোয়ারস প্রোটেকশন' আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করেছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ এটি বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়েছে)
- সংবিধানের সাথে এবং দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সাথে তথ্য অধিকার আইনের সাংঘর্ষিক কিনা আরো খতিয়ে দেখা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- অভিযোগ গ্রহণ ও শাস্তির বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে নমনীয় হওয়া প্রয়োজন।
- কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য দিতে না চাইলে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতির কথা বলা হয়েছে। ধরা যাক, কোনো নাগরিক যে তথ্য চাইল, কর্তৃপক্ষ তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতি নিয়ে তা দেবে না বলে নাগরিককে জানিয়ে দিল। আইন অনুসারে একপর্যায়ে নাগরিক তথ্য কমিশনে অভিযোগ করবে। এ ক্ষেত্রে যে কমিশন একবার তথ্য প্রদান না করার অনুমতি দিয়েছে, তার রায় নাগরিকের বিরুদ্ধে যাবে বলে ধরে নেয়া যায়। এটি একটি গোলক ধাঁধা।

তথ্য অধিকার আইনের আরো বেশ কিছু দুর্বলতা ও অসঙ্গতি থাকলেও আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার ফলে সেগুলো আলোচনায় আসেনি। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হলো, আইনের ছিদ্রানুসন্ধান না করে প্রয়োগে মনোযোগ দেয়া উচিত। প্রয়োজনে বাস্তবতার নিরিখে সংশোধনী করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

ঘ তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের ঘটনাসমূহ

বিগত এক বছরে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য চাওয়ার খুব একটা নজির নেই। বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ল'ইয়ারস অ্যাসোসিয়েশন বেলার বিজিএমইএ ভবন-সংক্রান্ত তথ্য এবং রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়ের তথ্য চাওয়ার ঘটনা ছাড়া তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের ঘটনা খুব বেশি আলোচনায় আসেনি। মতবিনিময় সভার বক্তাদের মতে, সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে এখনো পর্যন্ত তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি ১০ শতাংশের বেশি নয়। তবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বলে অনেক বক্তা দাবি করেন। কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা তাদের কাজের তালিকা, অর্থের উৎস ও অন্যান্য তথ্য সরাসরি বোর্ডে লিখে জনগণের জন্য উপস্থাপন করছে—বিশেষভাবে দুর্যোগবিষয়ক কার্যক্রমে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের স্বল্প কিছু উদাহরণ মতবিনিময় সভার মাধ্যমে উঠে এসেছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও কমিশনে জানানো

আইনের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও তথ্য কমিশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের তথ্য দেননি। মাত্র ২ শতাংশ এনজিও তথ্য কমিশনে তাদের তথ্য জমা দিয়েছেন বলে তথ্য কমিশনের অপ্রকাশিত সূত্রে জানা যায়। যদিও জাতীয় সেমিনারে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন, এটি ১ শতাংশেরও কম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোর তাগাদাপত্রের পর অনেক এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম তথ্য কমিশন ও ব্যুরোতে জানিয়েছেন।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

খুলনা জেলা মহিলা কর্মকর্তা নারগিস ফাতেমা জামিল সভাকে অবহিত করেন যে, আইন প্রণয়নের পর জেলার ৯টি উপজেলার মহিলা কর্মকর্তারা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করছেন। জনগণ কোথায় তথ্য পাবে, কিভাবে পাবে সে বিষয়েও তাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করেছে।

তথ্য চাওয়ার ঘটনা

কক্সবাজারের দৈনিক রূপসী গ্রামের সম্পাদক মোহাম্মদ আলী জিন্নাত বলেন 'আমি একবার এই জেলার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়) ওপর একটি সার্বিক রিপোর্ট করার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একজন সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার দীর্ঘ ১১ দিন ধরে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে ঘুরেও কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই কর্মকর্তাকে বলেছি যে, আমরা এই স্কুলগুলোর শিক্ষক সংখ্যা, কতজন শিক্ষক কর্মকর্তা রয়েছেন, কতটা পদ খালি রয়েছে, শিক্ষার্থী সংখ্যা কত, কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এবং কী কী নেই—এ সমস্ত তথ্য আমার দরকার এবং এগুলো গোপনীয় কোনো তথ্য নয়। কিন্তু তিনি দেননি। বরং তিনি আমাকে এই আইনের একটা কপি দেখিয়ে বলেছেন, এখন এটা আপনাকে নিতে হলে আইনি প্রক্রিয়ায় আবেদন করে নিতে হবে। তিনি বললেন, এরপর আমরা এই তথ্য আপনাকে ৩০ দিন পর দিব। এরকম পরিস্থিতি হলে এই আইন বাস্তবায়নের কাজ কী করে এগোবে?

বান্দরবান বেতার কেন্দ্র ভবন কত সালে নির্মিত হয়েছে, এমন একটি সাধারণ বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে বান্দরবান গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রথম আলো প্রতিনিধিকে বলেন, দেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হয়েছে। এখন তথ্য পেতে দরখাস্ত করে ২০ দিন অপেক্ষা করতে হয়। তিনি সাংবাদিককে পরামর্শ দেন, আপনি আজই দরখাস্ত করুন। ২০ দিনের মধ্যে অবশ্যই তথ্য পেয়ে যাবেন।

তথ্য চাইলে পাওয়া যায় না

'আমরা একটি প্রকাশনার জন্য জনসংখ্যাবিষয়ক কিছু তথ্যের জন্য ঝালকাঠির উপজেলা কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাইনি। উপজেলা পরিষদে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি-সংক্রান্ত তথ্য নেই। তাহলে কেমন করে আমরা তথ্য পাব, কী করে এই আইন বাস্তবায়িত হবে?'

আলোচক, সাংবাদিক, বরিশাল বিভাগ

তথ্য কেউ চাইতে আসে না

'তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে গত বছর ২০০৯ সালে। আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছি, এই আইন পাস হওয়ার পর এই আইনের অধীনে কেউ আমার দপ্তরে তথ্য নিতে আসেনি'।

আলোচক, সরকারি কর্মকর্তা,
বরিশাল বিভাগ

৬ তথ্য অধিকার প্রয়োগে/বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হতে পারে, তা জানতে লিখিত মতামত চাওয়া হয়। চ্যালেঞ্জ-সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো সবগুলো সভায় উপস্থাপিত হয়, সেগুলো নিচে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

- **জনগণের অসচেতনতা :** সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো, যাদের জন্য এই আইন, তারা জানেন না এর বিষয়বস্তু। আইন কীভাবে কাজে লাগাতে হবে সে সম্পর্কে ধারণা এখনো গড়ে ওঠেনি। এজন্য সবাই বেসরকারি সংগঠনসমূহ, যারা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন, তাদের দায়িত্বের কথা বলেছেন।

- **জনগণের উদাসীনতা :** জনগণ অনেক সময় তার ভাগ্য পরিবর্তনে নিরাশাবাদী। যেমন—সিলেট প্রতিনিধিবৃন্দের মতে, সিলেট বিভাগে আসা সরকারি কর্মকর্তাদের বেশির ভাগই নিজেদের জনগণের সেবক ভাবেন না। শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, লেগে থাকার মানসিকতার অভাব, তথ্য আনতে গিয়ে হয়রানির শিকার হন কি না, এই ভেবে অনেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তথ্য সংগ্রহ করতেই যাবেন না। এ ছাড়া তথ্য পেতে গিয়ে ঘুষ আদান-প্রদানের আশঙ্কাও আছে অনেকের মনে।

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে অবহেলা :** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে অবহেলা ও দীর্ঘসূত্রতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে সব বিভাগে চিহ্নিত হয়েছে। খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অনেক সরকারি কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা চলাকালীন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হয়নি। কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, ঊর্ধ্বতন কার্যালয় থেকে কিছু জানানো হয়নি। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হলেও শাখা কার্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া হলেও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে করণীয় সম্পর্কে তারা জানেন না।

- **দক্ষ জনবলের অভাব :** যথেষ্ট সংখ্যক জনবল না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে সমস্যা হচ্ছে। আর যে ক্ষেত্রে জনবল আছে, দক্ষতার ঘাটতি একটি বড় সমস্যা বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ চিহ্নিত করেছেন সব বিভাগীয় সভায়। জাতীয় সেমিনারে তথ্যসচিব বলেন, মাঠ পর্যায়ে এমনও অনেক অফিস আছে যেখানে একজন অফিসার সে ক্ষেত্রে সে যদি আপিল কর্তৃপক্ষ হয় তাহলে একজন সাধারণ কর্মচারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন যার পক্ষে তথ্য প্রদান করা সহজ হবে না।

- **অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা :** অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে তথ্য সংরক্ষণের অবকাঠামোর অভাব সবচেয়ে প্রকট বলে চিহ্নিত হয়েছে। সরকারি কার্যালয়ে ফাইলপত্র রাখার জায়গার অভাবে পুরোনো কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তা ছাড়া বিদ্যমান তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও তথৈবচ।

- **তথ্য সংরক্ষণে অব্যবস্থাপনা :** বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা অনুপস্থিত। আইন অনুসারে কোনো নাগরিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যেকোনো কার্যালয়ে তথ্য চাইতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানকে স্ব স্ব দপ্তরে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের অভাবে অন্য কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন পড়বে। ম্যানুয়াল পদ্ধতির ফাইল ব্যবস্থাপনাও অনেক কার্যালয়ে অনুপস্থিত। তবে তথ্য চাওয়া ব্যাপক আকারে শুরু হলে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা বোঝা যাবে।

- **তথ্য সংরক্ষণের সর্বজনীন পদ্ধতির অনুপস্থিতি :** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ব্যবস্থাপনার কোনো সাধারণ পদ্ধতি চালু নেই। এজন্য তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা দরকার।

- **প্রশিক্ষণের অভাব :** আইন সম্পর্কে ধারণার অভাব ও প্রশিক্ষণের অভাবে আইন সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যার প্রসারের আশঙ্কা করেছেন অনেকে। বিশেষ করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে যারা দায়িত্ব পেয়েছেন, প্রশিক্ষণের অভাবে তারা করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছেন।

- **সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মনোভাব :** সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রকাশে সাধারণভাবে অনীহা রয়েছে। তাদের অসহযোগিতার কারণে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। কেউ কেউ মনে করেন, আইন হওয়ার পরে টেন্ডার-সংক্রান্ত বিষয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় সাংবাদিকদের কাছে।

- **প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার সম্পর্কে ধারণার অভাব :** প্রাপ্ত তথ্য, বিশেষ করে দুর্নীতির তথ্য কোথায় পাঠাতে হবে এবং এর প্রক্রিয়া কী তা জানার ব্যবস্থা নাই।

- **কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা :** তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের মতে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সেজন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যখন দেখবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো তথ্য যাবে তখন তারা তথ্য দিতে টালবাহানা করবে।

- **অর্থাভাব :** সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে অর্থাভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে সভায় উপস্থিত অনেকে মনে করেন। জাতীয় সেমিনারেও একাধিক বক্তা অর্থাভাবের বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করেছেন। ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপ করার জন্য, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রদানের জন্য যে ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন, যা করলে তথ্যের চাহিদা কমে যাবে, এ রকম পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যে ধরনের সম্পদ দরকার, সেটার অভাব আছে।

- **ক্ষমতার বৈষম্য :** তথ্য চাওয়াকে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা হিসেবে সাধারণ নাগরিক মনে করেন। আবার যারা ক্ষমতার কাছাকাছি রয়েছেন, তাদের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের কারণে তথ্য অধিকার আদায় করে সাধারণ নাগরিকের পাশে দাঁড়ানোর সাহস কম। এর কারণে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তথ্য আদায়ের ঘটনা সীমিত। অনেকে যেমন মনে করেন, বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবকবৃন্দ ঐসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য চাইতে সাহসী হবেন না। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাজের সাথে যে সকল সুবিধাভোগী গোষ্ঠী জড়িত তাদের সম্মিলিত নেতিবাচক মনোভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে অনেকের ধারণা। যেমন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও খাসজমি বণ্টনের নীতিমালা বাস্তবায়নে বাটপাড়দের সঙ্গে ভূমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

- **প্রতিষ্ঠান প্রধানের ধারণার অভাব :** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধানদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে যথেষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সম্যক ধারণা নিতে আগ্রহের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেকের মতে, তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের কাছে বিষয়টি গুরুত্বহীন।

- **যথাযথ প্রস্তুতির অভাব :** এক বছরের বেশি সময় পার হলেও তথ্য সরবরাহ ও তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের প্রস্তুতির অভাব প্রকট হয়ে চোখে পড়েছে। তথ্য কমিশনের পস্তুতিও এখনো সম্পন্ন নয়।

- **প্রাপ্ত তথ্যের অপব্যবহার :** সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ প্রাপ্ত তথ্যের অপব্যবহারের আশঙ্কা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অপপ্রচার কাজে ব্যবহারের আশঙ্কাও রয়েছে। এ ছাড়া মিডিয়ার কিছু ব্যক্তি এই আইনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অপব্যবহার করবে। এতে প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ ।

- **সময়ক্ষেপণ :** তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সময়ক্ষেপণকে কেউ কেউ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন।

- **মূল্যবোধের সংকট :** সর্বগ্রাসী মূল্যবোধের সংকট অন্য অনেক অধিকারের মতো তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে অনেকে মনে করেন।

- **সরকারি ও বেসরকারি 'উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি' সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের স্বল্পতা :** তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত শক্তির দুর্বলতা ও সংখ্যা-স্বল্পতা তথ্য অধিকারের সচেতনতা সৃষ্টিতে অন্তরায় বলে অনেকে মনে করেন।

- **সরকারি দিক-নির্দেশনার অভাব :** এখনো পর্যন্ত সরকারি দিক-নির্দেশনা তৃণমূল পর্যায়ে না পৌছানোর প্রস্তুতি নেই। রাজশাহীর একজন উর্ধ্বতন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা বলেন, 'এই আইন পাস হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর কোনো কাগজ পাইনি। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে, তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এর কোনো দিক-নির্দেশনা আমরা পাইনি।'

প্রস্তুতি নেই

১. 'এই তথ্য অধিকার আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে সরকারের উদ্যোগ তেমনভাবে চোখে পড়েনি। সরকারের উদ্যোগে সারা দেশে এর প্রচার হয়নি। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপজেলা পর্যন্ত যদি মানবসম্পদ না থাকে, তাহলে কী করে এই আইন বাস্তবায়ন হবে? তথ্য কমিশনার নিজেই বলেছেন ওনার কাছে একটা ল্যাপটপ ও একজন সহকারী ছাড়া কিছু নেই।'

আলোচক, রাজশাহী বিভাগ

২. 'সবাই মনে করেন তথ্য অফিসার বা কর্মকর্তার কাছে অনেক তথ্য আছে। আসলে এই যে একটা এই আইনের গেজেট, এটা ছাড়া আমাদের কাছে কিছু নেই। তথ্য অফিসে কোনো কাজ নেই। কোনো দিক-নির্দেশনা নেই।'

আলোচক, সরকারি কর্মকর্তা, বরিশাল বিভাগ

— **গোপনীয়তার সংস্কৃতি :** সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে গোপনীয়তার সংস্কৃতি তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা। অনেকে মনে করেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যে দুর্নাম, তা দূর করার সুযোগ এনে দিয়েছে এই আইন। এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সে সুযোগ নেবে কি না সেটা দেখার বিষয়।

কেউ কেউ অত্যন্ত আশাবাদী এবং আইন বাস্তবায়নে কোনো চ্যালেঞ্জ নেই বলে মনে করেন। অন্যদিকে অনেকের মতে আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অধিকার-সচেতন নয়, ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার আইনের ১৯ ধারার ধারেকাছেও আমাদের দেশ নেই, আর কোনো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ নয়।

তথ্য চাওয়ার সংস্কৃতি চালু করতে আইনের সীমাবদ্ধতাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন না সংশ্লিষ্টরা। বরং প্রক্রিয়াগত ও ধারণাগত প্রতিবন্ধকতাকে বড় করে দেখছেন, যা অতিক্রমযোগ্য। সব বিভাগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ মনে করছেন, সরকারি-বেসরকারি সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে না ।

চ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে করণীয়সমূহ

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে করণীয়সমূহ নিয়ে মুক্ত আলোচনার পাশাপাশি দুটি প্রশ্নের জবাব লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হয় :

— তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার ?

— সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

উপস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ নিজের প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। করণীয় (কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার) সম্পর্কে যে মতামত পাওয়া গেছে, তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় : কর্তৃপক্ষ হিসেবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে।

কর্তৃপক্ষ হিসেবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে করণীয়

কর্তৃপক্ষের ভূমিকা জানানোর মাধ্যমে : সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত, এরকম প্রচার জনগণকে তথ্য চাইতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এজন্য মিডিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ, প্রতিষ্ঠানের সামনে নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ইত্যাদি উদ্যোগের প্রস্তাব করা হয়।

স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ : সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের তথ্য বোর্ডে তাদের প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য চাইতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। বরিশালে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নমুনা সম্পর্কে বলা হয়, একজন বয়স্কভাতা পাওয়ার যোগ্য সাধারণ মানুষ যদি জানে তার ওয়ার্ডে কতজন ভাতা পেয়েছেন এবং কে কে পেয়েছেন, কী পদ্ধতিতে তাদের নির্বাচন করা হয়েছে, তাহলে বিতরণ ব্যবস্থার অনিয়ম সম্পর্কে ভুল ধারণা ভাঙতে সহায়তা করবে। অথবা চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার কেন আসেননি তার তথ্য লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়ার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করবে। খাসজমি প্রাপ্ত মানুষের নাম-পরিচয় ভূমি অফিসে প্রকাশ্যে দেখা যাবে-এগুলো হচ্ছে স্বপ্রণোদিত তথ্যের নমুনা, যা মানুষের ভাগ্য বদলাতে সহায়তা করবে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ : আইনের চাহিদা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগকে প্রথম কাজ বলে সব বিভাগীয় সভায় চিহ্নিত করা হয়। তবে যে কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া দরকার বলে সবাই মনে করেন।

সাংবিধানিক স্বীকৃতি : জাতীয় সেমিনারে একজন আলোচক বলেন এটি একটি অপূর্ব সুযোগ। আমাদের সাংবিধানের যে সংশোধনী হচ্ছে সেখানে আইনটির সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া। তাতে এই আইনটার গ্রহণযোগ্যতা, বিশেষ করে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে বলে মনে করেন।

বাজেট বরাদ্দ : জাতীয় সেমিনারে আলোচনা হয় যে, তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আগামী বাজেট থেকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করার জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ রাখা উচিত।

তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ : অনেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে আইন বাস্তবায়ন শুরুকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কেননা তথ্যকে ঠিকমতো সাজিয়ে নিতে না পারলে তথ্য প্রদানে অনভিপ্রেত সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

তথ্য পাওয়ার উপায় সহজভাবে জানানো : কেউ কেউ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো জরুরি মনে করেন, আবার কেউ কেউ আইনের মারপ্যাঁচে জনগণকে বিভ্রান্ত না করে সহজভাবে তথ্য কীভাবে চাইতে হবে এবং তথ্য পেলে কী লাভ হবে তা জানানোর ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেন।

তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদানে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান : তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তথ্য কমিশন থেকে দেয়া দরকার বলে মতামত আসে বরিশাল বিভাগ থেকে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের এ আইন না মানলে তার ক্ষতি হবে—এ বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও প্রণোদনা সৃষ্টি : তথ্য অধিকার আইনে শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে উদ্যোগী ও বেশি বেশি তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তার জন্য অভ্যন্তরীণ ও জাতীয়ভাবে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব রাখা হয় রাজশাহীতে।

প্রশিক্ষণ : কর্তৃপক্ষের সবাইকে, বিশেষ করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা দরকার বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন : সবার আগে দরকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সে লক্ষ্যে কাজ শুরু করার ওপর জোর দেন অনেকে।

মানসিকতার পরিবর্তন : তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন মানসিকার পরিবর্তন, গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। জাতীয় সেমিনারে তথ্যসচিব বলেন—আমাদের ভিশন হচ্ছে দিগন্ত রেখা এবং সেটির পথে কোনো অচলায়তন বা বাধা থাকলে, সেটিকে সরিয়ে দেওয়াই আমাদের মিশন। দিগন্ত দেখতে হলে আমাদের মানসিকতার যে অচলায়তন, সমতার অভাব, সেগুলো সরিয়ে দিতে হবে, তাহলেই আমরা দিগন্ত দেখতে পাব।

সমন্বিত সেল গঠন : স্থানীয় তথ্য অফিসগুলোকে কার্যকর করতে হলে সমস্ত মিনিস্ট্রি যদি সমন্বিতভাবে একটি সেল গঠন করে সবার তথ্য একসাথে করতে হবে।

রেকর্ড ব্যবস্থাপনা আইন : জাতীয় সেমিনারের এজন বক্তার সুপারিশ হলো—পৃথিবীর প্রায় ৭০টি দেশে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট রয়েছে পাশাপাশি সেসব দেশে পাবলিক রেকর্ডস অ্যাক্ট বা রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এমন কোনো লেজিসলেশন নাই। বলা হয়ে থাকে, রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট যে দেশে যত উন্নত সে দেশে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট তত ভালোভাবে বাস্তবায়ন হয়। সরকার এ ব্যাপারে যেন পদক্ষেপ নেয়।

জেলা পর্যায়ে এনজিওদের সমন্বয় সভা : উপজেলা ও জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এনজিওদের সমন্বয় সভা হয়। সেখানে যদি তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, এই সভাগুলোতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তাহলে মাঠ পর্যায়ে এনজিওরা আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে।

তথ্য প্রকাশের অভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রণয়ন : তথ্য প্রকাশে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ সহজ করা ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা প্রস্তুত সবার আগে দরকার।

অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন : সরকারের সব প্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সমান তালে সম্ভব না হলে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকারভিত্তিক নির্বাচন করা যেতে পারে, যার মধ্যে পুলিশ প্রশাসন থাকবে সবার প্রথমে।

তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা রাখা : তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নাগরিকের তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করার চিন্তা শুরু থেকে করা দরকার বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণ : তথ্য অধিকার আদিবাসীদের অধিকার, বিশেষ করে ভূমির অধিকার রক্ষা করবে কি না এ ব্যাপারে সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। বিনা মূল্যে সরকার জনগণকে কী কী সেবা দিচ্ছে সে তথ্য যেন সবাই সহজে জানতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। চা-বাগানগুলোতে শ্রমিকদের অধিকার জানানোর ব্যবস্থা করার প্রয়োজন তুলে ধরা হয়েছে। হাওরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল বোর্ড দিয়ে কৃষিতথ্য দেয়ার প্রস্তাব করেছেন অনেকে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কারিগরি শিক্ষা কোথায় কীভাবে দেয়া হয় সে তথ্যের চাহিদা রয়েছে, যা তারা জানতে পারছে না। পার্বত্য অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সঠিক তথ্য জানানো দরকার।

সাংবাদিক প্রশিক্ষণ : তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার নিয়ে সাংবাদিক প্রশিক্ষণের ওপর অনেকে জোর দিয়েছেন। প্রশিক্ষণের অভাব এবং অজ্ঞতাবশত কোনো সাংবাদিক কোনো অফিসের তথ্য, ব্যক্তিগত তথ্য, দাপ্তরিক তথ্য সংগ্রহ করে অনবধানবশত অথবা শত্রুতামূলকভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এজন্য সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষের নজরদারিরও প্রয়োজন রয়েছে বলে সিলেট থেকে বিষয়টি উঠে এসেছে। সাংবাদিকবৃন্দও প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন।

জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন : সিলেট থেকে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব এসেছে। যেসব তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশে আইনগত সীমাবদ্ধতা নেই, সেগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তাদের মতে, বিভাগীয়-আঞ্চলিক বা এর নিম্ন পর্যায় থেকে তথ্য সরবরাহ করা হলে তথ্য বিভ্রাট বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সব তথ্যের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ সম্ভব। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত একসেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচির উদ্যোগে জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু করা হয়েছে।

তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে

সচেতনতা সৃষ্টি : সচেতনতা সৃষ্টিকে সব বিভাগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও মালিকানা সৃষ্টি : জাতীয় সেমিনারে একজন আলোচক বলেন—আমাদের সরকার বা পৃথিবীর সব দেশের সরকার কিন্তু পরিচালিত হয় একটি গোপনীয়তার সংস্কৃতির বেড়াজালে। যারা সরকারি কর্মকর্তা, তারা মনে করেন তাদের কাছে যে তথ্যগুলো আছে যে সিদ্ধান্ত নেন তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। যত বেশি তারা তথ্য ধরে রাখতে পারেন নিজেদের তত বেশি শক্তিশালী মনে করেন। এটাকে ভেঙে ফেলার জন্য আমাদের যেটা দরকার হবে তা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। আইনটির প্রতি মালিকানা সৃষ্টি করতে হবে আইনটি সম্পর্কে জেনে, বুঝে।

সংবাদমাধ্যমে প্রচার : তথ্য অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ প্রচারের মাধ্যম এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। খুলনা ও চট্টগ্রামের সাংবাদিকবৃন্দ তাদের পত্রিকায় প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়া টিভিতে তথ্য অধিকার আইনের ওপর নাটিক, গান প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তথ্যচিত্র নির্মাণ ও মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই তথ্যচিত্রসমূহ টেলিসেন্টারসমূহে দেখানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা : যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ আছে সেগুলোতে আইনটি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করলে আইনের ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে জানতে পারবে।

স্থানীয় সংবাদপত্রে আইন বাস্তবায়নের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন : জাতীয় সেমিনারে একজন স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক বলেন তথ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোকে অনুরোধ করতে পারে সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে প্রচার করার জন্য; যেহেতু এই পত্রিকাগুলোর পাঠক তৃণমূল জনগণ।

আইন সম্পর্কে প্রচারণা : বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের জানানোর ব্যবস্থা করতে পারে। উঠান বৈঠক, সমাবেশ, লোকসংগীত, পথনাটক প্রশিক্ষণকে অনেকে মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। তথ্য অধিকার আইনের ওপর বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে বলে অনেকে অভিমত দেন।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ১

'নির্বাচন কমিশন গত এক বছর ধরে সরকারি-বেসরকারি, রাজনৈতিক দলের, বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসেব দেয়ার জন্য বলেছেন। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত কেউ সম্পদের হিসেব দেননি। যদিও তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সম্পদের হিসেব দেয়ার কথা বলেছিলেন। যারা আইন প্রণয়ন করলেন তাদের যদি তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে এই অবস্থা হয়, তাহলে এই আইন কি করে বাস্তবায়ন হবে?'

আলোচক, বরিশাল বিভাগ

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ২

'ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসে দেখা যায়, প্রতিদিন মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। কোনো কাজ করতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। এটা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা এখনো সরকারি ফি জনগণকে জানায় না।'

আলোচক, বরিশাল বিভাগ

সচেতনতামূলক সভা আয়োজন : সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (যেমন, বার কাউন্সিলের সহযোগিতায় এমআরডিআই) প্রথমে জেলাভিত্তিক এবং পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন পর্যন্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। জেলা আইনজীবী সমিতি এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যে কাজগুলো আলাদা আলাদা করা হয় সেটা যৌথ ফোরামে একসাথে করলে বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা : সামাজিক এ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, যেমন—রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, গার্লস গাইড ও নাট্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে প্রচার-প্রচারণার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারও কার্যকর হতে পারে বলে অনেকের মত।

তথ্য কমিশনের সফর অব্যাহত রাখা : তথ্য কমিশনের সদস্যবৃন্দের সফর অব্যাহত রাখা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা রাখার ওপর জোর দিয়েছেন অনেকে।

অগ্রসর প্রতিষ্ঠানসমূহের জোট গঠন : তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে, এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের জোট গঠন করা ও জোট সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার কর্মসূচি চালু করলে ফলাফল পাওয়া যেতে পারে বলে মতামত এসেছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে এরকম দুটি জোট গঠিত হয়েছে।

কমিউনিটি রেডিওকে সম্পৃক্ত করা : দেশে যেসব প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি রেডিও চালু করতে যাচ্ছে তাদেরকে তথ্য অধিকার নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করতে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

সর্বোচ্চ মহলের সম্পৃক্ততা : অনেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা জাতীয় সংসদ থেকে প্রচারণার ও তথ্য প্রদানে উদাহরণ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন : কীভাবে তথ্য চাইতে হবে—এ ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে পরামর্শকেন্দ্র চালু করা যেতে পারে। সারা দেশে বিদ্যমান টেলিসেন্টারকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ভূমিকা : কমিউনিটি পর্যায়ের নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির একটা বড় ভূমিকা থাকতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি বিলবোর্ডে টাঙিয়ে দিতে পারেন এবং মাসিক সভায় আলোচনা করতে পারেন।

তথ্যমেলার আয়োজন : তৃণমূল পর্যায়ে তথ্যমেলার আয়োজন করে তথ্য দেয়া এবং তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

তথ্য অধিকার দিবস : যেদিনে আমাদের তথ্য অধিকার আইনটি পাস হয়েছে, সেদিনটিকে তথ্য অধিকার আইন দিবস হিসেবে পালন করতে পারি।

সঠিক পরিসংখ্যান : বেশ কয়েকটি বিভাগে দেশে সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবকে বড় বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়।

দ্বিমুখী তথ্যব্যবস্থা : একমুখী না হয়ে দ্বিমুখী তথ্য প্রদান ব্যবস্থা চালু করার ওপর জোর দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলে। অর্থাৎ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করতে পারলে জনগণ সঠিক তথ্য সহজে পাবে এবং একটি আস্থার সম্পর্ক তৈরি হবে।

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি : তথ্য অধিকার আইন খুব অল্পসংখ্যক আইনের একটি, যাতে প্রকৃতপক্ষে জনগণের ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রতিফলিত। তথ্য অধিকার চর্চার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে একটা পর্যায়ে পাঠ্যসূচিতে তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মতামত এসেছে। প্রধান তথ্য কমিশনার জাতীয় সেমিনারে জানান তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখেছেন আইনটি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

ছ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিমাপের মাপকাঠিসমূহ

সংশ্লিষ্টদের মতে, গত এক বছরে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন শতকরা ৫ ভাগও হয়নি। সাধারণভাবে তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট সবার মতে তথ্য অধিকার আইনটি জনমনে এখনো জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়নি। এজন্য এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি ঘটছে ধীরগতিতে। সুতরাং কোনো অগ্রগতির মাপকাঠি প্রয়োগের পরিবেশ এখনো অপরিপক্ব। সাধারণ নাগরিক জরিপের ভিত্তিতে এর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে।

আলোচিত/প্রস্তাবিত মাপকাঠিসমূহ

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপের মাপকাঠি কী হতে পারে, সে বিষয়ে অনেকগুলো মতামত রয়েছে, যা সবগুলো বিভাগীয় আলোচনায় উঠে এসেছে। যেসব বিষয়ে সব বিভাগে একই মতামত এসেছে, সেগুলো হলো :

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ পরিবীক্ষণ ও নিয়োগের হার পরিমাপ :** যেসব প্রতিষ্ঠানে (সরকারি ও বেসরকারি) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা, তার শতকরা কতগুলোতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তা পরিমাপ করা যেতে পারে। আইন অনুযায়ী, আইন কার্যকর হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা। যেসব প্রতিষ্ঠান এখনো দেয়নি, প্রকৃতপক্ষে তারা আইন অমান্য করেছে। এরকম পরিস্থিতি এড়ানো খুব জরুরি ছিল।

- **যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে তথ্য সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :** তথ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট মহলে সচেতনতা রয়েছে। তাঁরা সঠিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন।

- **আপিলের/ অভিযোগের সংখ্যা :** তথ্য প্রদানে সমস্যার কারণে আপিল বা অভিযোগ উত্থাপনের সংখ্যা আরেকটি মাপকাঠি হতে পারে, অনেকে মনে করেন।

- **তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি :** অধিকাংশ সাধারণ মানুষ জানে না, আইনটি কী এবং কীভাবে তা তাদের কাজে লাগবে। এজন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপস্থিতি নজরদারির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলে।

- **প্রদেয় তথ্যের ডিজিটাল ভাণ্ডার গঠনের প্রবণতা :** তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল কি না এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একটি ভালো মাপকাঠি হবে বলে সব বিভাগ থেকে মতামত এসেছে।

- **তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সংগ্রহের আবেদনপত্রের সংখ্যা :** সব বিভাগের আলোচনায় এই সংখ্যা নিরূপণের জন্য বলা হয়েছে, কেননা এই মাপকাঠি বুঝতে সাহায্য করবে যে, এ আইন নাগরিকদের মাঝে কতটুকু সাড়া জাগিয়েছে এবং আইন সম্পর্কে মানুষের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কি না।

- **তথ্য প্রদানকারী ইউনিট স্থাপনের হার :** চট্টগ্রাম ও বরিশাল থেকে এ রকম বিষয় চিহ্নিত হয়নি। তথ্য প্রদানকারী ইউনিট আইনের আওতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত অঙ্গ, যা সম্পর্কে খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগের মানুষের ধারণা তুলনামূলকভাবে বেশি স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়।

- **প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্যপ্রাপ্ত নাগরিকের সংখ্যা :** রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ছাড়া সব বিভাগে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

- **সিটিজেন চার্টার প্রকাশকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবামুখিনতার একটি মাপকাঠি হলো তার সিটিজেন চার্টার আছে কি না, তা জনসমক্ষে প্রকাশিত কি না এবং নিয়মিত হালনাগাদ হচ্ছে কি না। এরকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বছরওয়ারি বের করতে পারলে অগ্রগতির পরিমাপ পাওয়া যাবে।

- **ফেসবুক ব্যবহারের প্রবণতা :** বরিশালে আলোচিত হয়, তথ্য অধিকার নিয়ে ফেসবুকে গ্রুপ আছে কি না এবং আলোচনাসমূহের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে।

- **সাধারণ মানুষের স্ব-উদ্যোগে তথ্য জানতে চাওয়ার প্রবণতা :** ক্ষমতায়নের একটি মাপকাঠি হচ্ছে স্ব-উদ্যোগে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া। তাই অগ্রগতির সূচকে এটি অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয় বরিশাল থেকে।

- **পরোক্ষ পরিমাপ :** কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিমাপ ব্যবহার করে অগ্রগতি পরিমাপ করা যেতে পারে। যেমন, সিলেটে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আবেদন বৃদ্ধি, হাওর অঞ্চলে ফসলডুবি, মৎস্য খামারে ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি কমেছে কি না এবং সে ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার প্রয়োগ হয়েছে কি না, তা জানলে আইনের আসল উদ্দেশ্য সফল হলো কি না বোঝা যাবে।

- **মিডিয়া রিপোর্টের সংখ্যা :** অনেকে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তথ্য অধিকার-সম্পর্কিত খবরের সংখ্যাকে তথ্য অধিকার সচেতনতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করেছেন।

- **ওয়েবসাইট :** তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইট প্রকাশকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাকে আইন বাস্তবায়নের একটি ভালো মাপকাঠি মনে করেছেন অনেকে।

অগ্রগতি পরিমাপের লক্ষ্যে করণীয়

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিমাপের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে মতামতসমূহ নিম্নরূপ :

- **পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা :** সরকার ও নাগরিক সমাজের পক্ষে পৃথক পৃথক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার মধ্যে পরিবীক্ষণ দল গঠন অন্যতম।

- **নিয়মিত জরিপ :** নিয়মিত জরিপের মাধ্যমে অগ্রগতি পরিমাপের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন সকলে।

- **তথ্য প্রদানের রেকর্ড :** চাহিদামাফিক কত জনকে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তার রেকর্ড সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা; বরিশাল ও সিলেট ছাড়া সব এলাকায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

- **তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস :** আইন অনুসারে প্রকাশযোগ্য ও অপ্রকাশযোগ্য তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস করা অগ্রগতির পরিমাপে কাজে লাগবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

- **জেলাভিত্তিক তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ :** তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি জনগণকে অবহিত করতে জেলা/উপজেলাভিত্তিক তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া দরকার। ঐ কমকর্তা জেলা/উপজেলাভিত্তিক সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রতি ৩ (তিন) মাস তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ছকে সংগ্রহ করে ই মেইলে তথ্য কমিশনকে পাঠাবেন। তা ছাড়া এই সংকলিত তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টাঙানোর ব্যবস্থা করবেন।

- **সমন্বয় সভা :** জেলা পর্যায়ে পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা করে অগ্রগতির তথ্য জানা যেতে পারে।

- **Open source :** তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা Open source প্রযুক্তি-ভিত্তিক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন কেউ কেউ।

- **মতবিনিময় সভা :** এমআরডিআই যে ধরনের মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে, এরকম সভা প্রতি ৬ মাস পরপর করলে অগ্রগতির পরিমাপ করা যাবে।

- **আবেদনপত্র বিশ্লেষণ :** প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে জনগণের তথ্য চাহিদার জানা দরকার, তাহলে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

- **প্রণোদনা :** যেসব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ সংখ্যক তথ্য প্রদান করবেন, তাদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা দরকার।

- **বাজেট বরাদ্দ :** বছর শেষে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে পদক্ষেপ ও বাজেট বরাদ্দ রাখা দরকার।

উপসংহার

দেশব্যাপী মতবিনিময় সভার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়েছে, সার্বিকভাবে তথ্য অধিকার আইন সীমিতসংখ্যক নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানকে নাড়া দিয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবতা হলো, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রসর ভূমিকা থাকলেও আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে তাদের আগ্রহ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে কম। এজন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও কর্তৃপক্ষ করায়, অর্থাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো তথ্য আইনের আওতায় আনায় এমনটি ঘটেছে বলে সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন। আইনের খসড়া প্রণয়নের সময়ে সুকৌশলে কাজটি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। যেহেতু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরা প্রস্তুত হতে সময় নিচ্ছে, তার ফলে সরকারি তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিককে সহায়তার কাজে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না।

তথ্য প্রকাশে অনীহা ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। এজন্য যুক্তিসংগতভাবেই তথ্য কমিশনের দায়িত্ব শুধুমাত্র অভিযোগ নিষ্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সক্রিয় নির্দেশনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু কমিশনের কার্যপরিধি জনগণ ও নাগরিক সমাজের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারেনি। কমিশনকে আরো সক্রিয় করতে বেসরকারি সংগঠনসমূহের সঙ্গে কাজ করে অর্থবল ও জনবলের ঘাটতি মোকাবিলা কমিশন করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' (Conflict of Interest) দেখা দিতে পারে। এজন্য সরকারের সদিচ্ছার ওপরে অনেকটা নির্ভর করছে কমিশন কতটা সক্রিয় হতে পারবে। দেশে বিদ্যমান অন্যান্য কমিশনের হাল দেখে আশাবাদী হওয়া কঠিন।

আইন বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতার আরেকটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। সেটি হলো সর্বগ্রাসী 'প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট' সম্পর্ক। সমাজের একটি গোষ্ঠীর স্বার্থের নির্ভরতা আরেকটি গোষ্ঠীর ওপর এমন যে, কেউ কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না। একজন দরিদ্র নাগরিক তথ্য চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরাগভাজন হয়ে তার অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করতে চায় না। একজন এনজিও প্রতিনিধি তথ্য চেয়ে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চান না। একজন সরকারি কর্মকর্তা অন্য সরকারি কার্যালয় থেকে তথ্য চেয়ে তার পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত করতে চান না বা ওএসডি হতে চান না। এটি হচ্ছে আইনের শাসনের অভাব ও মানুষের আইনের শাসনের প্রতি আস্থার সংকটের একটি বহিঃপ্রকাশ। তাহলে এ বৃত্ত ভাঙবে কে?

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগ দিয়ে সম্ভব নয়। প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন জনসম্পৃক্ত উদ্যোগ। সে ক্ষেত্রে, দেশপ্রেমিক রাজনীতির চর্চা ও সৎ মানুষের সাহসী হয়ে ওঠার কোনো বিকল্প নেই।

দেশব্যাপী মতবিনিময় সভা থেকে উঠে আসা উল্লেখযোগ্য মতামত ও প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ—

ক. তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা

ইতিবাচক ধারণাসমূহ

— 'এই আইনের মাধ্যমে আমরা এখন আমাদের অধিকারগুলো বাস্তবায়ন না হলে তার জন্য সরকারের কাছে জবাবদিহিতা চাইতে পারব।'

— তথ্য অধিকার আইন হওয়ার ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কাজ সহজ হবে। যারা তথ্য দিচ্ছেন তারা যেমন নিশ্চিত মনে তথ্য দিতে পারবেন, তেমনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তথ্য-প্রমাণভিত্তিক হবে।

— এই আইন কার্যকর হলে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ হবে।

নেতিবাচক ধারণা

— তথ্য অধিকার আইনের দুটি দিক রয়েছে—একটি হলো তথ্য চাহিদার দিক এবং আরেকটি হলো তথ্য সরবরাহের দিক। তথ্য চাহিদা সৃষ্টি করে যদি সরবরাহ নিশ্চিত করা না যায়, তা হলে আইন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

— এ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্য থেকে দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ না করতে পারলে দেশে কোনো আইনই সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

খ. তথ্য কমিশন সম্পর্কে ধারণা

- তথ্য কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, খোলামেলা ও অংশগ্রহণভিত্তিক। কিন্তু তা হয়নি।
- তথ্য কমিশন নিজেদের গোছাতে যথেষ্ট সময় নিচ্ছে, যার ফলে আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে।
- তথ্য কমিশনে সরকারি আমলার প্রাধান্য একটি সমস্যা।
- তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা তথ্য কমিশনের কাছে জানাতে হবে। বর্তমানে শাখা কার্যালয় না থাকায় প্রধান কার্যালয়ে জানাতে হবে, যা বেশিরভাগ মানুষের জন্য অসম্ভব। এজন্য তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভিযোগের ব্যবস্থা করা দরকার।
- তথ্য কমিশনের প্রথম কাজ হওয়া উচিত নিজেদের ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ানো।
- তথ্য কমিশনের কাজে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত প্রয়োজন।

গ. তথ্য অধিকার আইনের সবলতা-দুর্বলতা

সবলতা

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সবল দিক হলো স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ কেউ কোনো তথ্য না চাইলেও কর্তৃপক্ষসমূহকে আইনে চিহ্নিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করতে হবে।

দুর্বলতা

- এই আইনে দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের কোনো ব্যাখ্যা নেই। তার ফলে প্রকৃত তথ্য প্রাপ্তির সময় আরো বেড়ে যাবে।
- সংবিধানের সাথে এবং দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সাথে তথ্য অধিকার আইনের সাংঘর্ষিক কি না আরো খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ঘ. তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের ঘটনাসমূহ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও কমিশনে জানানো

আইনের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও তথ্য কমিশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের তথ্য দেননি। মাত্র ২% এনজিও তথ্য কমিশনে তাদের তথ্য জমা দিয়েছে বলে তথ্য কমিশনের অপ্রকাশিত সূত্রে জানা যায়। যদিও জাতীয় সেমিনারে প্রধান তথ্য কমিশনার বলেন এটি ১ শতাংশের এরও কম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর তাগাদাপত্রের পর অনেক এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম তথ্য কমিশন ও ব্যুরোতে জানিয়েছেন।

তথ্য চাওয়ার ঘটনা

বান্দরবান বেতার কেন্দ্র ভবন কত সালে নির্মিত হয়েছে, এমন একটি সাধারণ বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে বান্দরবান গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী প্রথম আলো প্রতিনিধিকে বলেন, দেশে তথ্য অধিকার আইন চালু হয়েছে। এখন তথ্য পেতে দরখাস্ত করে ২০ দিন অপেক্ষা করতে হয়। তিনি সাংবাদিককে পরামর্শ দেন— 'আপনি আজই দরখাস্ত করুন। ২০ দিনের মধ্যে অবশ্যই তথ্য পেয়ে যাবেন'।

তথ্য চাইলে পাওয়া যায় না

'আমরা একটি প্রকাশনার জন্য জনসংখ্যা-বিষয়ক কিছু তথ্যের জন্য ঝালকাঠির উপজেলা কার্যালয়ের তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাইনি। উপজেলা পরিষদে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি-সংক্রান্ত তথ্য নেই। তাহলে কেমন করে আমরা তথ্য পাব, কী করে এই আইন বাস্তবায়ন হবে?'

তথ্য কেউ চাইতে আসে না

'তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে গত বছর ২০০৯ সালে। আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে বলছি, এই আইন পাস হওয়ার পর এই আইনের অধীনে কেউ আমার দপ্তরে তথ্য নিতে আসেনি'।

ঙ. তথ্য অধিকার প্রয়োগে/বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

জনগণের উদাসীনতা

জনগণ অনেক সময় তার ভাগ্য পরিবর্তনে নিরাশাবাদী। যেমন—সিলেট প্রতিনিধিদের মতে, সিলেট বিভাগে আসা সরকারি কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই নিজেদের জনগণের সেবক ভাবেন না। শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, লেগে থাকার মানসিকতার অভাব, তথ্য আনতে গিয়ে হয়রানির শিকার হন কি-না, এই ভেবে অনেকে সংশ্লিষ্ট দফতরে তথ্য সংগ্রহ করতেই যাবেন না। এছাড়া তথ্য পেতে গিয়ে ঘুষ আদান-প্রদানের আশঙ্কাও আছে অনেকের মনে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিয়োগে অবহেলা

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগে অবহেলা ও দীর্ঘসূত্রতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে সব বিভাগে চিহ্নিত হয়েছে। খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অনেক সরকারি কার্যালয়ে মতবিনিময় সভা চলাকালীন সময় পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ হয়নি। কারণ জানতে চাইলে বলা হয়, ঊর্ধ্বতন কার্যালয় থেকে কিছু জানানো হয়নি। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হলেও শাখা কার্যালয়ে নিয়োগ দেয়া হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া হলেও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়নি বলে করণীয় সম্পর্কে তারা জানেন না।

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে তথ্য সংরক্ষণের অবকাঠামোর অভাব সবচেয়ে প্রকট বলে চিহ্নিত হয়েছে। সরকারি কার্যালয়ে ফাইলপত্র রাখার জায়গার অভাবে পুরোনো কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাছাড়া বিদ্যমান তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও তথৈবচ।

ক্ষমতার বৈষম্য

তথ্য চাওয়াকে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা হিসেবে সাধারণ নাগরিক মনে করেন। আবার যারা ক্ষমতার কাছাকাছি রয়েছেন, তাদের সঙ্গে ক্ষমতাসীনদের প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের কারণে তথ্য অধিকার আদায় করে সাধারণ নাগরিকের পাশে দাঁড়ানোর সাহস কম। এর কারণে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে তথ্য আদায়ের ঘটনা সীমিত। অনেকে যেমন মনে করেন, বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবকবৃন্দ ঐসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য চাইতে সাহসী হবেন না। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যেসব সুবিধাভোগী গোষ্ঠী জড়িত তাদের সম্মিলিত নেতিবাচক মনোভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে অনেকের ধারণা। যেমন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও খাসজমি বণ্টনের নীতিমালা বাস্তবায়নে বাটপাড়দের সঙ্গে ভূমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

প্রতিষ্ঠান-প্রধানের ধারণার অভাব

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রধানদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে যথেষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সম্যক ধারণা নিতে আগ্রহের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেকের মতে, তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের কাছে বিষয়টি গুরুত্বহীন।

সরকারি দিক-নির্দেশনার অভাব

এখনো পর্যন্ত সরকারি দিক-নির্দেশনা তৃণমূল পর্যায়ে না পৌঁছানোর প্রস্তুতি নেই। রাজশাহীর একজন ঊর্ধ্বতন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা বলেন, 'এই আইন পাস হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর কোনো কাগজ পাইনি। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে, তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এর কোনো দিক-নির্দেশনা আমরা পাইনি।'

গোপনীয়তার সংস্কৃতি

সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানে গোপনীয়তার সংস্কৃতি তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা। অনেকে মনে করেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যে দুর্নাম, তা দূর করার সুযোগ এনে দিয়েছে এই আইন। এখন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সে সুযোগ নেবে কি না সেটা দেখার বিষয়।

চ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে করণীয়সমূহ

কর্তৃপক্ষ হিসেবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে করণীয়

কর্তৃপক্ষের ভূমিকা জানানোর মাধ্যমে

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানের জন্য প্রস্তুত, এরকম প্রচার জনগণকে তথ্য চাইতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এজন্য মিডিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ, প্রতিষ্ঠানের সামনে নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ইত্যাদি উদ্যোগের প্রস্তাব করা হয়।

স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ

সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের তথ্য বোর্ডে তাদের প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য চাইতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। বরিশালে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নমুনা সম্পর্কে বলা হয়, একজন বয়স্কভাতা পাওয়ার যোগ্য সাধারণ মানুষ যদি জানেন তার ওয়ার্ডে কতজন ভাতা পেয়েছেন এবং কে কে পেয়েছেন, কী পদ্ধতিতে তাদের নির্বাচন করা হয়েছে, তাহলে বিতরণ-ব্যবস্থার অনিয়ম সম্পর্কে ভুল ধারণা ভাঙতে সহায়তা করবে। অথবা চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার কেন আসেননি তার তথ্য লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়ার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীলতার পরিচয় বহন করবে। খাসজমি-প্রাপ্ত মানুষের নাম-পরিচয় ভূমি অফিসে প্রকাশ্যে দেখা যাবে—এগুলো হচ্ছে স্বপ্রণোদিত তথ্যের নমুনা, যা মানুষের ভাগ্য বদলাতে সহায়তা করবে।

তথ্য পাওয়ার উপায় সহজভাবে জানানো

কেউ কেউ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো জরুরি মনে করেন, আবার কেউ কেউ আইনের মারপ্যাঁচে জনগণকে বিভ্রান্ত না করে সহজভাবে তথ্য কীভাবে চাইতে হবে এবং তথ্য পেলে কী লাভ হবে তা জানানোর ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেন।

তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদানে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান

তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তথ্য কমিশন থেকে দেয়া দরকার বলে মতামত আসে বরিশাল বিভাগ থেকে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের এ আইন না মানলে তার ক্ষতি হবে—এ বিষয়টি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন

সিলেট থেকে জাতীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব এসেছে। যেসব তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশে আইনগত সীমাবদ্ধতা নেই সেগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। তাদের মতে, বিভাগীয়-আঞ্চলিক বা এর নিম্ন পর্যায় থেকে তথ্য সরবরাহ করা হলে তথ্য বিভ্রাট বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সব তথ্যের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ সম্ভব। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত একসেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচির উদ্যোগে জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু করা হয়েছে।

তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণকে সক্রিয় করার ক্ষেত্রে

সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা

সামাজিক এ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যেমন, রেড ক্রিসেন্ট, স্কাউট, গার্লস গাইড ও নাট্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে প্রচার প্রচারণার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারও কার্যকর হতে পারে বলে অনেকের মত।

সর্বোচ্চ মহলের সম্পৃক্ততা

অনেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা জাতীয় সংসদ থেকে প্রচারণার ও তথ্য প্রদানে উদাহরণ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সঠিক পরিসংখ্যান

বেশ কয়েকটি বিভাগে দেশে সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবকে বড় বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়।

দ্বিমুখী তথ্য ব্যবস্থা

একমুখী না হয়ে দ্বিমুখী তথ্য প্রদান ব্যবস্থা চালু করার ওপর জোর দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সকলে। অর্থাৎ তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করতে পারলে জনগণ সঠিক তথ্য সহজে পাবে এবং একটি আস্থার সম্পর্ক তৈরি হবে।

পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি

তথ্য অধিকার আইন খুব অল্পসংখ্যক আইনের একটি, যাতে প্রকৃতপক্ষে জনগণের ক্ষমতায়নের বিষয়টি প্রতিফলিত। তথ্য অধিকার চর্চার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে একটা পর্যায়ে পাঠ্যসূচিতে তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মতামত এসেছে। প্রধান তথ্য কমিশনার জাতীয় সেমিনারে জানান, তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখেছেন আইনটি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য।

ছ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিমাপের মাপকাঠিসমূহ

নিয়মিত জরিপ

নিয়মিত জরিপের মাধ্যমে অগ্রগতি পরিমাপের উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন সকলে।

তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস

আইন অনুসারে প্রকাশযোগ্য ও অপ্রকাশযোগ্য তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস করা অগ্রগতির পরিমাপে কাজে লাগবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

জেলাভিত্তিক তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রগতি জনগণকে অবহিত করতে জেলা/উপজেলাভিত্তিক তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া দরকার। ঐ কমকর্তা জেলা/উপজেলাভিত্তিক সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রতি ৩ (তিন) মাস তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট ছকে সংগ্রহ করে ই মেইলে তথ্য কমিশনকে পাঠাবেন। তাছাড়া এই সংকলিত তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টাঙানোর ব্যবস্থা করবেন।

প্রণোদনা

যেসব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ সংখ্যক তথ্য প্রদান করবেন, তাদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা দরকার।

বিভাগীয় আলোচনাসমূহ

খুলনা বিভাগ

খুলনা বিভাগীয় আলোচনা

৫ জুন ২০১০, হোটেল রয়্যাল, খুলনা

সঞ্চালক	:	ড. অনন্য রায়হান নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	:	তানজিব-উল আলম অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট
প্রধান অতিথি	:	মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকার জেলা প্রশাসক, খুলনা

এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক

হাসিবুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তব্য

এমআরডিআই মূলত কাজ করে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের মান উন্নয়নে। এর বাইরে আমরা দুটি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করি। তার একটি হলো তথ্য অধিকার আইন নিয়ে। কীভাবে এই আইনকে জনপ্রিয় করা যায়, কোথায় এর সীমাবদ্ধতা, এ আইন বাস্তবায়নে কোথায় কী ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, সেসব বিষয় নিয়ে কাজ করি। এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে কাজ করেছে আসছে এমআরডিআই।

আরেকটি জায়গায় এমআরডিআই অ্যাডভোকেসি করে, তা হলো : ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি যে, এ খাতে যে ব্যয় হয় তা যদি দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়, তাহলে দাতাগোষ্ঠীর ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা কমে আসবে। তা ছাড়া কীভাবে আমাদের স্থানীয় সমস্যাগুলো করপোরেট সেক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় এবং করপোরেট সেক্টরকে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মকাণ্ডে কীভাবে উৎসাহিত করা যায় এবং সিএসআর-এর ওপর কর প্রণোদনা বিষয়ে এনবিআর ও ব্যবসায়ীদের সাথে আমরা অ্যাডভোকেসি করছি।

আমরা তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করছি। এই কর্মসূচির আওতায় আমরা প্রতিটি বিভাগে মতবিনিময় সভা, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছি। বিভাগীয় মতবিনিময় সভাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হবে। সবশেষে সব মতামত সংকলন করে আমরা সরকার ও অন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে দেয়া হবে। এতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কোন বিভাগে কী সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়—এসব বিষয় উল্লেখ থাকবে।

সঞ্চালক

ড. অনন্য রায়হান

উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা। বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এ ক্ষেত্রে আমাদের কী ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে, আমরা কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এবং এ আইন প্রয়োগ বা ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে কী ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে, মানবাধিকারের ক্ষেত্রে, আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই আইনের গুরুত্ব কী—এসব বিষয় নিয়ে আমরা এই 'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এ মতবিনিময় সভা করছি। এসব বিষয় নিয়ে আজকের এ উদ্যোগ। তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকারসহ সব প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক

তানজিব-উল আলম

'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এ মতবিনিময় সভায় আমরা মূলত তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করছি। তথ্য কী, তথ্য অধিকার বা তথ্য অধিকার আইন কীভাবে আমাদের ব্যক্তিজীবনে, নাগরিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে—এই বিষয়গুলোই আজকের আলোচনার বিষয়।

১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ করা এবং যেকোনো উপায়ে রাষ্ট্রীয় সীমানা-নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।'

১৯৬৬ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৯(২) অনুসারে 'প্রত্যেকেরই অধিকার আছে মতামত প্রকাশ করার; রাষ্ট্রীয় সীমানা-নির্বিশেষে মৌখিক, লিখিত অথবা শিল্পমাধ্যম কিংবা পছন্দমতো অন্য যেকোনো মাধ্যম হতে সকল ধরনের তথ্য ও মতামত সন্ধান করা, গ্রহণ করা ও জানবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।'

বাংলাদেশে প্রায় ৮০০টির বেশি আইন রয়েছে। এই আইনের অধীনে প্রায় একই সংখ্যক বা তার চেয়ে বেশি রুলস এবং রেগুলেশন আছে। এসব আইনের উৎপত্তি সংসদ থেকে। সংসদের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। তবে সংসদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতার কথা আপনারা পাবেন সংবিধানে। সংবিধানকে বলা হয় 'মাদার অব অল লজ'। বাংলাদেশে যতগুলো আইন আছে সেগুলোর জন্য সংবিধানের বিভিন্ন দিক ও বিষয় রয়েছে। প্রতিটি আইন, একটির সাথে অন্যটি সংগতিপূর্ণ। সংবিধানের সাথেও সংগতিপূর্ণ। সংবিধানে যেসব প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে তার বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য কিছু আইন রয়েছে। সে আইনগুলো সংবিধানসম্মত হওয়ার জন্য বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

আমাদের সংবিধানের একটি মৌলিক কাঠামো (বেসিক স্ট্রাকচার) রয়েছে। এই মৌলিক কাঠামোকে সংবিধানের মূল ভিত্তি বলা হয়। সংবিধানের মূল ভিত্তি রয়েছে সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদে। ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতা জনগণের। সেই জনগণের ক্ষমতাই প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ব্যবহার করে। জনগণই রাষ্ট্রপরিচালকগণকে ক্ষমতা ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছে। জনগণই তাদের সংসদে পাঠিয়েছেন, তাদের যে ক্ষমতা সেটাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার জন্য; অপব্যবহার করার জন্য নয়।

বাংলাদেশের জনগণই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাহলে সেই ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে তথ্য। তথ্য ছাড়া মানুষ যেসব ক্ষমতার অধিকারী তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কেউ যদি একটা গাড়ি চালাতে চায়, তাহলে তাকে ওই গাড়ি সম্পর্কে জানতে হবে। গাড়ির কোথায় ব্রেক, গিয়ার, এক্সিলেটর, হর্নসহ গাড়ি চালানোর সব বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। এগুলো হলো একধরনের তথ্য। তথ্য ছাড়া কোনো কর্মই আমাদের সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

সংবিধানের ১১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ হইবে।' তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচনের কোনো অর্থ থাকে না। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হলে তাদের অবশ্যই তথ্য জানতে হবে। সে যে প্রার্থীকে বা যাকে নির্বাচিত করবে তার সম্পর্কে তথ্য জানতে হবে। কেননা রাষ্ট্রপরিচালনায় যারা যাবেন তাদের ওপর নির্ভর করেই জনগণের ক্ষমতা ব্যবহার হবে। কিন্তু জনগণ যদি প্রতিনিধি নির্বাচিত করার আগে তাদের সম্পর্কে তথ্য না জানে, তাহলে তারা সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে না। আর সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচিত না হলে দেশের ও দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের তথ্য প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইন পৃথিবীতে প্রায় ৪৫টি দেশে কার্যকর রয়েছে এবং ৭০টিরও বেশি দেশে কার্যকর করার প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। এই আইনটি করার জন্য বা পাস করানোর জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন হয়েছে। আমরাও ২০০৪ সাল থেকে কম-বেশি আন্দোলন করেছি। বিশেষ করে সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীসহ সুশীল সমাজ এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অবশেষে ২০০৯ সালে এ আইনটি পেলাম। যেটি কার্যকর করা ও বাস্তবায়নের জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছি। এই আইনটি মূলত প্রথমদিকে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু এটি আজ আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বা সময়ে তথ্য ছাড়া একদম চলতে পারছি না।

সংবিধানের ৩৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে জনগণ পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ২০০৯ সনের ২০নং আইন তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে, 'যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং যেহেতু জনগণ গণপ্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং যেহেতু সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়... ।' এ কথাগুলো দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে এই আইনটি জনগণের মৌলিক অধিকারকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বা নিশ্চিত করার জন্য করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা গেলে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে, চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হইবে।

আপনারা হিসেব করে দেখুন, এই আইনের উদ্দেশ্যটা কী? উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন। আর জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই তথ্য দরকার। তথ্য ছাড়া জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন সম্ভব না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে তথ্য প্রাপ্তি-প্রদানের। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ আইন করা হয়েছে।

এখন আপনি কার কাছ থেকে তথ্য চাইবেন? কে আপনাকে তথ্য দেবে? কেন দেবে? বা আপনার কাছে কেউ কোনো তথ্য চাইলে তা দিতে আপনি কেন বাধ্য থাকবেন? বা কোনো তথ্যের ক্ষেত্রে কেন বাধ্য থাকবেন না? কী কী ধরনের ইনফরমেশন আপনি পাবেন না এবং আপনিও দিতে বাধ্য নন? এই বিষয়গুলোই এ আইনে বলা হয়েছে।

আইনে বলা হয়েছে যে, যেকোনো কর্তৃপক্ষের কাছে আপনি তথ্য চাইতে পারবেন। অনুরূপ আপনার কাছেও কর্তৃপক্ষ ইনফরমেশন চাইতে পারবে। অনুরূপভাবে কী কী বা কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আপনাকে তথ্য দেবে না এবং আপনিও যে যে তথ্য দিতে বাধ্য নন, তা এই আইনে বলা আছে। এত দিন কোনো তথ্য চাইলে কত ঝামেলা সহ্য করতে হতো। এই আইনের কারণে এখন আর সে ঝামেলায় পড়তে হবে না। এখন থেকে আইনের মাধ্যমে তথ্য পাবেন।

নাগরিক কার কাছে বা কোথায় তথ্য পাবে, সে সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারি তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন– স্কুল-কলেজও তথ্য দিতে বাধ্য। আমরা প্রতিবছর দেখি স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। অভিভাবকেরা যদি ভর্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে চায়, তাহলে ঐ কর্তৃপক্ষ অভিভাবককে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। ভর্তি তথ্য যদি উন্মুক্ত থাকে বা স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি তথ্য দিতে বাধ্য থাকে, সে ক্ষেত্রে ভর্তি-বাণিজ্য, দুর্নীতি কমে আসবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইনফরমেশন কত জরুরি। একইভাবে আমরা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য চাইতে পারব।

অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে বা আমরা যে যে ক্ষেত্রে সরাসরি তথ্য পাব না, সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য পাওয়া যাবে। তাহলে তৃতীয় পক্ষ কে? ধরুন, আমরা যদি লিভার ব্রাদার্সের বা কোহিনুর ক্যামিকেল কোম্পানি লিমিটেডের কাছে কোনো তথ্য চাই, তাহলে কি আমরা তথ্য পাব? না। কার কাছে পাব? বিএসটিআই-এর কাছে পাব। এ রকমের যত প্রতিষ্ঠান আছে সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

ধারা ৪-নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। দেশের যেকোনো নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর দ্বিতীয় অধ্যায় তা বলা হয়েছে।

এই আইনে বলা হয়েছে, যদি কেউ তথ্য নাও চায়, তাহলে কিছু মৌলিক তথ্য জনগণের কল্যাণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠান কিছু তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে। তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সব প্রতিষ্ঠান তার কাজ-কর্ম ও হিসাবের স্বচ্ছতা প্রকাশ করবে। এতে করে জনগণ জানতে পারবে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এই তথ্য অধিকার আইনের মতো অন্য কোনো আইনের ক্ষেত্রে এত বাধ্যবাধকতা নেই। এই আইন যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে দেশের দুর্নীতি কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

এখন তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি, নাগরিক কার কাছে বা কোথায় তথ্য পাবে। এসব প্রতিষ্ঠানের কাছে আপনি তথ্য পাবেন। তথ্য নিতে হলে আপনাকে কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। কোন তথ্য চাইতে পারব, সেগুলো এই আইনে বলা আছে। কোন কোন তথ্য পাবেন না, তাও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ রয়েছে।

তথ্য প্রদান ইউনিট বা তথ্য সংগ্রহের কার্যালয়কে কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়ে ভাগ করা হয়েছে। এসব জায়গায় তথ্য পাওয়া যাবে। প্রতিটি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার তথ্য প্রদান করবে। তথ্য প্রদানের ইউনিটগুলোতে তথ্য না পাওয়া গেলে ঐ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তথ্য পাওয়া যাবে।

তথ্য সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে :

(১) ধারা ৫ - তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

(২) যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমগ্র দেশে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তা সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

তথ্য প্রকাশ প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে :

(১) ধারা ৬ - তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রকাশের সময় কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য নিয়ন্ত্রণ বা লুকাতে পারবে না। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। এই আইনে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সে সম্পর্কেও এই আইনে বলা আছে।

ধারা ৭-এ উল্লিখিত প্রেক্ষিতসমূহে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য না। অর্থাৎ যখন দেখা যাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয়, রাষ্ট্রের গোপন তথ্য যা প্রদান করলে রাষ্ট্র ও জনগণের ক্ষতি হয়, এমন তথ্য রাষ্ট্র দিতে বাধ্য নয়। যেমন : কোনো সাংবাদিক পুলিশের কাছে যদি জানতে চায় অমুক সন্ত্রাসীকে কবে গ্রেপ্তার করবেন– এ ধরনের তথ্য পুলিশ দিতে বাধ্য নয়।

(২) ধারা ৯-এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আংশিক তথ্য প্রকাশ করবে। না করলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

(৩) কিছু সংস্থা যারা এই আইনের আওতায় পড়ে না, যেমন এনএসআই, ডিজিএফআই, সিআইডি, এসএসএফ ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল, এসবি ও র‍্যাব।

তথ্য প্রাপ্তি প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে :

(১) ধারা ৮ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে প্রয়োজনীয় টাকা দিতে হবে।

তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে ধারা ৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের তারিখ হতে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। একাধিক তথ্য প্রদানের ইউনিট থেকে তথ্য গ্রহণের উল্লেখ থাকলে সে ক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করবেন। কর্তৃপক্ষ যদি আবেদন বাতিল করেন, তাহলে তা ১০ দিনের মধ্যে জানাবেন।

ধারা ১৩ অনুসারে তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা তথ্য কমিশনের কাছে জানাতে হবে। তথ্য কমিশনের স্থানীয় বা প্রধান কার্যালয়ে জানাতে হবে। প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত।

ধারা ২৪ অনুসারে কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পেলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আচরণে যদি ক্ষুব্ধ হন, তাহলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার আগে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সবল দিকগুলো হলো—স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা। কেউ যদি তথ্য নাও চায়, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তার কিছু তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন। এই আইনের প্রাধান্য অন্যান্য আইনের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর। অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩-ও বাধা হয়ে থাকবে না।

তথ্য অধিকার আইন পৃথিবীর অল্প কিছু দেশে রয়েছে। সেসব দেশের জনগণ এই আইনের ফলে অনেক সুফল পেয়েছে। এই আইন শুধু কাগজে-কলমে থাকলে কিছু হবে না। প্রয়োজন বাস্তবায়ন করা। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরাও সুফল পাব। আমাদের দেশের জনগণ যদি এই আইন কার্যকর করতে পারে, তাহলে দেশের এবং জনগণের অনেক লাভ হবে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কিছু দুর্বল দিকও আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ করেছি। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে জনগণের উৎসাহ নেই। বাস্তব অবস্থাজনিত কারণে তথ্য দেয়া এবং নেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে রেয়াতের তালিকা বড় থাকে। অনেক সময় আওতাবহির্ভূত তথ্যের তালিকাটি বেশ বড় হয়। রয়েছে তথ্যের প্রবাহজনিত সমস্যা।

আইনের আরও কিছু দুর্বল দিক হলো– তথ্য প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর অসুবিধা, তথ্য সংগ্রহের অব্যবস্থাপনা, সম্পূরক তথ্য প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা, তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি। কমিশনারদের পদমর্যাদা ও হুইসেল ব্লোয়ার'স প্রোটেকশন নিয়েও সমস্যা রয়েছে। তবে এগুলো কোনো মারাত্মক সমস্যা নয়।

ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনের কিছু দুর্বল দিক আমরা দেখেছি। কমিশনারদের পদমর্যাদা কী হবে, এখানে চাকরি করে কী লাভ, আরও কত কী। অর্থের অভাব, প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের অভাব ও সর্বোপরি উদ্যোগের অভাব।

যদি তথ্য কমিশন ও জনগণ এগুলো সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করে, তাহলে নিমেষেই এই দুর্বল দিকগুলোর সমাধান সম্ভব।

ড. অনন্য রায়হান

প্রবন্ধ উপস্থাপক ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলমের বক্তব্য থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে রাষ্ট্র চাচ্ছে, জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্র চাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্র চাচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। রাষ্ট্রের চাওয়া, রাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের দায়িত্ব হলো এসব তথ্য আইনে যেমন আছে ঠিক তেমনভাবে প্রকাশ করা। জনগণকে ভালো করে জানানো। যাতে করে তারা তথ্যগুলোকে বুঝতে পারে। রাষ্ট্রের যে ম্যান্ডেট আমরা তা বাস্তবায়নে কাজ করছি। বাংলাদেশের আইনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা হলো : শুধু সরকার নয়, জনগণের অর্থে বা বিদেশি সাহায্যে পরিচালিত সব প্রতিষ্ঠান, তাদেরও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে এবং হবে।

ব্যারিস্টার তানজিব বললেন, আইনের পক্ষগুলো হলো :

১। একটি পক্ষ হলো নাগরিক, যারা তথ্য নেবে।

২। আরেকটি পক্ষ হলো কর্তৃপক্ষ, যারা তথ্য দেবে।

৩। আরেকটি পক্ষ রয়েছে, যারা হলো তৃতীয় পক্ষ। যারা সরাসরি আইনের আওতায় পড়ে না।

৪। আরেকটি পক্ষ হলো আপিল কর্তৃপক্ষ।

কর্তৃপক্ষ যদি আইনানুযায়ী তথ্য দিতে না চায়, তাহলে আমরা আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করব বা আপিল করব। আপিল কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হলে তখন আমরা তথ্য কমিশনের কাছে যাব। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই পক্ষগুলোই হলো তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি। প্রতিটি পক্ষেরই একটা করে দায়িত্ব রয়েছে। সরকার, জনগণ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সবাইকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যার যা দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করা উচিত।

মতামত ও প্রশ্নোত্তর পর্ব

জাভেদ ইকবাল, সিনিয়র তথ্য অফিসার, খুলনা

এই আইনে প্রতিবন্ধীদের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। এটা একটা খুব ভালো দিক। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলো আগে প্রয়োজন তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন। তিনি প্রশ্ন করেন :

১। কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করব, কোথা থেকে করব এবং তা কীভাবে সংরক্ষিত হবে?

২। আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না কেন?

তানজিব-উল আলম

তথ্য কমিশন নির্দেশনা দেবে কীভাবে, কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তা কীভাবে সংরক্ষিত হবে। তথ্য অধিকার আইন তাদের এ দায়িত্ব দিয়েছে। আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা না গেলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিট পিটিশনের দরজা খোলা রাখার জন্য করা হয়েছে। এখানে আদালত বলতে হাইকোর্টকে বোঝানো হয়েছে। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করলে দীর্ঘসূত্রিতার কবলে পড়তে হতে পারে।

অ্যাডভোকেট সোহেল শামীম, যশোর

এই আইনে দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের কোনো ব্যাখ্যা নেই। ব্যাখ্যা থাকা উচিত ছিল। এই আইন বাস্তবায়নে মূল সমস্যা হলো অর্থ। অর্থ সরকারকে দিতে হবে। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য বাজেট থাকা দরকার। তথ্য কমিশনে সরকার থেকে মনোনীত প্রতিনিধিই বেশি, এটা একটা সমস্যা। তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করতে এই প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের নিরেপেক্ষ হওয়া দরকার। তিনি প্রশ্ন করেন :

১। রিট করা, হাইকোর্টে যাওয়া আর্থিকভাবে সম্ভব কি?

২। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল স্থানীয় পর্যায়ে করা উচিত নয় কি?

তানজিব-উল আলম

হাইকোর্টে যাওয়া হচ্ছে সর্বশেষ পদক্ষেপ। তার আগে তথ্য কমিশন আছে। তথ্য পাওয়া হলো মূল বিষয়। আর আপনার যদি একান্তভাবে প্রয়োজন হয়, তাহলে তথ্য পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে যাবেন।

গৌরাঙ্গ নন্দী, ব্যুরো প্রধান, দৈনিক কালের কণ্ঠ, খুলনা

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে ভালো করে জানানো ও তথ্যের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তোলা দরকার। এই আইন সাংবাদিকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকার তেমন উদ্যোগী নয়। যদি থাকত, তাহলে কেন গত ১ বছরের এ আইনের বাস্তবায়নে ৫% কাজও বাস্তবায়িত হলো না।

১। আদালতে যাওয়া সময় নষ্ট করা, কার পক্ষে যাওয়া সম্ভব?

২। তথ্য প্রদানকারী ইউনিট কি খুলনা বিভাগে থাকবে?

৩। এ বিভাগে এখনো পর্যন্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ হয়নি কেন?

তানজিব-উল আলম *(২ নং প্রশ্নের উত্তর)*

খুলনা বিভাগে যত কর্তৃপক্ষ রয়েছে, আইন অনুসারে সবাইকে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদান করবেন।

কাজী হাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, স্বাবলম্বী

জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তা এই আইন সম্পর্কে অবহিত নন। তাদের প্রশিক্ষণ দরকার। প্রতিটি অফিস-আদালতে একটি তথ্য ডেস্ক থাকা প্রয়োজন। জেলা তথ্য বাতায়নে আরো তথ্য থাকা দরকার। তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা রয়েছে। তাদের কোনো বিষয়ে অবহিত করার পরও সে কাজের ৬ পারসেন্ট অগ্রগতি হয়নি।

১। আগামী ৩ মাসের মধ্যে কর্মকর্তা নিয়োগ হবে কি?

২। কীভাবে তথ্য সংগ্রহ হবে?

তানজিব-উল আলম *(১ নং প্রশ্নের উত্তর)*

আমরা এ ব্যাপারে তথ্য কমিশনে যোগাযোগ করে অভিযোগ করতে পারি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ আইন পাসের ৬০ দিনের মধ্যে নিয়োগ করে তথ্য কমিশনে জানাতে হবে। নতুন প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিষ্ঠার ৬০ দিনের মধ্যে তা করতে হবে। নিয়োগ হবে কি না, তা নির্ভর করবে কর্তৃপক্ষসমূহের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ডের ওপর।

অ্যাডভোকেট শামিমা সুলতানা, প্রধান নির্বাহী, মাসেস, খুলনা

বাংলাদেশে এখন সবকিছুর নিয়মই অনিয়মে পরিণত হয়েছে। সবকিছুর আগে এ অনিয়ম রোধ করা প্রয়োজন। প্রশাসন এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে এবং ব্যবহার করতে জানে না। তথ্য আনতে গেলে টাকা দিতে হয়। যেখানে যে কাজের জন্য যাই না কেন, সেখানেই ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে হয়। সেখানে এই তথ্য অধিকার আইন কতটুকু কার্যকর হবে তা বলা মুশকিল।

সাধারণ মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না। তাদের জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তারা যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝাতে হবে। সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, যারা এই উদ্যোগের সাথে জড়িত, তাদেরও এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যদের জানাতে হবে।

১। সাধারণ মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না, তাহলে কীভাবে এই আইন বাস্তবায়ন করা হবে?

তানজিব-উল আলম

সাধারণ মানুষকে এ আইন জানানোর জন্য যে যে পদক্ষেপ নেয়া উচিত, তা নিতে হবে। সাধারণ মানুষকে জানানোর দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, এ দায়িত্ব আমাদের সকলের। বিশেষ করে, এনজিওগুলো সাধারণ মানুষকে জানানোর কাজটি নিতে পারে।

মুজিবুর রহমান, পরিচালক, গণগবেষণা ও উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য, তবে গোয়েন্দা সংস্থা বাধ্য নয়। এই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার। এই আইন বাস্তবায়নের যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, তা কতটা বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে তা আমরা জানি না। বিনা পরিকল্পনায় কোনো কিছু এগিয়ে নেয়া যায় না। সরকারের কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জনগণ আন্দোলন করে না। তাই দরকার সঠিক পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন।

সুন্দরবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে সুন্দরবনকে রক্ষার পদক্ষেপ নেয়া দরকার। চিংড়ি চাষ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। চিংড়ি চাষের ফলে ওই অঞ্চলে লবণ চলে এসেছে, এতে খাদ্যনিরাপত্তা থাকবে কি না সন্দেহ রয়েছে। চাষিদের জন্য ফসল উৎপাদন ও চাষের বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ে চাষিদের আগাম তথ্য দিয়ে তাদের লাভবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যেমন : ১। সুন্দরবন সম্পর্কে সরকার কী পদক্ষেপ নেবে? ২। চিংড়ি চাষে কী ক্ষতি হচ্ছে? ৩। এই আইন আদৌ কি বাস্তবায়ন করা হবে?

তানজিব-উল আলম

৩ নং প্রশ্নের উত্তর : তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, আমাদেরও। মূল দায়িত্ব আমাদের। আমরা চাইলে হবে, না চাইলে হবে না। সব সময়ই অধিকারের সাথে কর্তব্য জড়িত থাকে।

আহম্মেদ আলী খান, খুলনা প্রেসক্লাব সভাপতি ও দৈনিক পূর্বাঞ্চলের নির্বাহী সম্পাদক

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রথম যে কাজটি করা দরকার, তা হলো, যারা তথ্য দেবে বা যাদের কাছে আমরা তথ্য পাব, তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানানো। তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা প্রধান কর্তব্য। যারা তথ্য দেবে তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন করা দরকার। খুলনা বিভাগে যত এনজিও রয়েছে, তারা প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে। খুলনা বিভাগের সাংবাদিক ও সংবাদপত্র তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে।

তানজিব-উল আলম

আপনি যদি চাহিদা না করেন, তাহলে সরবরাহ আসবে কোত্থেকে। আপনি আগে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য চান। তারপর তারা যদি তথ্য না দিতে পারেন, তাহলে আপনি অভিযোগ করেন। দেখবেন তারা তাদের চাকরি বাঁচানোর জন্য হলেও আপনাকে তথ্য দেয়ার জন্য সচেতন হয়ে উঠবেন।

শামীম আরফীন, নির্বাহী পরিচালক, অ্যাওসেড

তথ্য কাদের প্রয়োজন? প্রথমত সাংবাদিক, আইনজীবী, গবেষক ও সাধারণ মানুষের তথ্য প্রয়োজন। নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের তথ্য প্রয়োজন বেশি। এই আইন হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষ কী কী সুযোগ-সুবিধা পেল, সেই দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এই আইন বাস্তবায়নে যে দক্ষ জনবল প্রয়োজন, যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা এখনো নিশ্চিত করা হয়নি। এটাকে দ্রুত নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তথ্য সংগ্রহকে আধুনিকায়ন করা দরকার। নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়। যারা তথ্য প্রদান করবে, তাদের তথ্য প্রদান করার মতো বাস্তব অবস্থা আছে কি? বিভাগীয় পর্যায় থেকে জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণকে সচেতন করতে এই আইন সম্পর্কে জানানো ও বোঝানোর জন্য আজকের মতো সেমিনার করা প্রয়োজন।

তানজিব-উল আলম

আপনার প্রতিষ্ঠান কী করবে?

শামীম আরফীন

এই আইন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাব। অ্যাওসেড-এর পক্ষ থেকে আমি বলছি, আপনারা অ্যাওসেড-এর যাবতীয় তথ্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন।

শিরিন আফরোজ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রজেক্ট কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার আইনের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ে বলছি। সমস্যার ক্ষেত্রে আমি মনে করি, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? তথ্য সংগ্রহকে আধুনিকায়ন ও গতিশীল করা, তথ্য আদান-প্রদানকারীকে সচেতন করা দরকার। জনসাধারণকে এ আইন সম্পর্কে ভালো করে জানাতে পারলে এ আইন দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। সরকারের পাশাপাশি সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা রাখতে হবে।

জিনাত আরা আহম্মেদ, উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, খুলনা

তথ্য যাদের প্রয়োজন তাদের সচেতন করতে হবে। তথ্য তাদের কী সুযোগ-সুবিধা দেবে তা জানানো দরকার। সাধারণ জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো দরকার। তথ্য কীভাবে তাদের জীবনধারণের জন্য সহায়তা করে, সে বিষয়ে তাদেরকে জানানো প্রয়োজন। সরকার সাধারণ জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের জন্যই তথ্য অধিকার আইনটি করেছে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে এ আইন সম্পর্কে জানাতে হবে।

তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য গ্রহণ-প্রদান ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে। সেখানে নোটিশ বোর্ডে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে জনগণ খুব সহজেই তার প্রয়োজনী তথ্য পেতে পারে। গ্রামের মানুষদের নিয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে। কমিউনিটি সভা করার মাধ্যমেও এই আইন সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে।

মিজানুর রহমান পান্না, প্রধান সমন্বয়ক, রূপান্তর

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার কারণে রূপান্তরের কাজ করতে সুবিধা হয়েছে। আমরা ১৯৯৫ সালে প্রথম যখন কাজ শুরু করি, তখন বলতে গেলে মানুষ এক প্রকার তথ্যশূন্য অবস্থার মধ্যে ছিল। মানুষের যে ঘাটতিগুলো আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো তথ্যের ঘাটতি। তথ্যসংকটে মানুষ ভুগছিল বলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত ছিল। সেই জনগণকে তথ্যের আওতায় নিয়ে আসার জন্য রূপান্তর কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে আমরা আমাদের সংগঠনে একজন তথ্য অফিসার নিয়োগ দিয়েছি। আমরা একটি তথ্য-নীতিমালা প্রণয়ন করেছি, যা জুলাইয়ের মধ্য তথ্য কমিশনে পাঠাতে পারব। আমরা তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে এ কাজ অব্যাহত রাখব।

মবিনুল ইসলাম, সম্পাদক, গ্রামের কাগজ, যশোর

তথ্য অধিকার আইন মূলত সাংবাদিক ও গবেষকদের বেশি দরকার। এটি আমাদের কাছে একটি অস্ত্রস্বরূপ। জনগণের তথ্য দরকার। কী তথ্য দরকার, তা বুঝে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এই আইনবলে আমি সরকারি কাজের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। যার ভিত্তিতে আমি ইতোমধ্যে গ্রামের কাগজ পত্রিকায় কাবিখা প্রকল্পের কয়েকটি নিউজ ছেপেছি, যা আমাদের অঞ্চলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতে করে এলাকার মানুষ বিষয়টি জানতে পারল। আর অন্যদিকে যারা কাবিখার টাকা নিয়ে দুর্নীতি করেছে তারাও হুঁশিয়ার হয়ে গেল।

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার প্রায় এক বছর পার হলেও সরকার তেমন অগ্রসর হতে পারেনি। কেন পারেনি, সে ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা করে দেখা প্রয়োজন। তারপর পরিকল্পিত পরিকল্পনা নিয়ে তা বাস্তবায়নের দিকে এগোনো দরকার। তাহলেই এই আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব।

আশেক ই-এলাহী, সম্পাদক, প্রগতি

তথ্য অধিকার আইনের যে সংক্ষিপ্তসার এই সেমিনার পেপারটিতে রয়েছে তা যদি ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে বিলি করা যায়, তাতেও জনগণ এই আইন সম্পর্কে বেশ জানতে পারবে। আর অন্যদিকে সাধারণ জনগণের যে তথ্য প্রয়োজন তা তথ্য ইউনিট বা সরকারি তথ্যকেন্দ্র থেকে পাবে।

প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ওয়ার্ল্ড ভিশন

ইতোমধ্যে আমরা আমাদের সংগঠনে একজন তথ্য অফিসার নিয়োগ দিয়েছি। আমরা একটি তথ্য-নীতিমালা প্রণয়ন করেছি, যা জুলাইয়ের মধ্য তথ্য কমিশনে পাঠাতে পারব। আমরা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে এ কাজ অব্যাহত রাখব।

সাধারণ মানুষের ৯৫ শতাংশ তথ্য দরকার। তাদের জীবনযাপনে শিক্ষা-কাজে যে তথ্য দরকার তা সংগ্রহ করা। কিন্তু কোথা থেকে সেই তথ্য সংগ্রহ হবে? এসব ব্যাপারে ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে। এই ডাটাবেইজের মাধ্যমে যে তথ্য দরকার তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি, এনজিও কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে দল গঠন করা যেতে পারে, যাতে করে এই টিম ঐ বিভাগের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে।

নারগিস ফাতেমা জামিল, জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, খুলনা

আমার অধীনে ৯টি উপজেলা রয়েছে। এ সমস্ত উপজেলার মহিলা কর্মকর্তারা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। তথ্য কী? কেন প্রয়োজন? মানুষের জীবনে এর প্রভাব কী ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে ধারণা দেয়া হয়। জনগণ কোথায় তথ্য পাবে, কীভাবে পাবে সে বিষয়েও তাদের অবহিত করা হয়। আমরা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

সিরাজুল ইসলাম, খুলনা জেলা সহকারী পুলিশ কমিশনার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ)

আমরা এই সেমিনারে এখানে প্রায় ৪০/৪৫ জন লোক রয়েছি। আজকের আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায় আলোচনা করছি। এই আলোচনার মধ্যমে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়েছে যে, আমরা যারা এখানে উপস্থিত এবং আলোচনা করেছি, তাদের যদি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এই জ্ঞান থাকে, তাহলে সাধারণ জনগণের কী জ্ঞান থাকতে পারে? সাধারণ জনগণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কতটা অবহিত এবং কতটুকু জানে? তাদের কী অধিকার তা কীভাবে পাবে?

সাধারণ জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। এই তথ্য অধিকার আইনে কী কী তথ্য আছে এবং তা তাদের কী কাজে লাগবে তা জনগণকে জানাতে হবে। আমি সিটি এসবির দায়িত্বে আছি। আমাদের কাজ হলো তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা দেয়া। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আমাদের যে তথ্য দেয়া প্রয়োজন তা দিই।

জহির ঠাকুর, নড়াইল প্রতিনিধি, এটিএন বাংলা

একজন সাংবাদিকের নানা তথ্য দিতে ও নিতে হয়। তথ্য অধিকার আইন হওয়ার ফলে তথ্য দেয়া ও নেয়ার কাজটি ক্ষেত্রে আর কোনো জটিলতা থাকল না। এই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কী কী তথ্য আছে এবং তা কী কাজে লাগবে এ সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য সাংবাদিকদের একটা বড় ভূমিকা পালন করা উচিত। স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে এ আইন কী, তা জনগণকে বোঝানোর জন্য কাজ করা যেতে পারে।

স্বপন গুহ, নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর

সাপ্লাই ও ডিমান্ড, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কী তথ্য সরবরাহ দেব, কী চাইব তা আগে বুঝতে হবে। তথ্য দেয়ার জন্য সক্ষমতা তৈরি করা জরুরি। অন্যথায় ডিমান্ড তৈরি করলাম কিন্তু তথ্য দিতে পারলাম না, তখন এই আইন ও সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তাই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবশ্য অবলম্বন করতে হবে। তথ্য সংগ্রহের এবং প্রদানের জন্য তথ্য কর্মকর্তাকে দক্ষ হতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে, ভুল তথ্য দেয়ার জন্য বা ভুল তথ্য উপস্থাপনের জন্য মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হয়। তাই ভুল তথ্য উপস্থাপনের জন্য শাস্তির বিধান রাখা উচিত।

সাধন ঘোষ, প্রাক্তন অধ্যাপক ও সাংবাদিক

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ গণতন্ত্রকে আরো সুসংহত করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এ আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এতদিন জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন না হলেও করার কিছু ছিল না। আমার মনে হয়, এই আইনের মাধ্যমে এখন জনগণ তার মৌলিক অধিকার কেন নিশ্চিত হচ্ছে না, এই প্রশ্ন করতে পারবে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য এর প্রচার বাড়াতে হবে। নানা পদক্ষেপ নিয়ে এগোতে হবে। তথ্য অধিকার কী, এর প্রয়োজনীয়তা কী– এসব বিষয় নিয়ে কর্মশালা করা, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রচার করা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, রেডিও-টেলিভিশনসহ সব গণমাধ্যমে প্রচার করা, বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা ইত্যাদি করা যেতে পারে।

তানজিব-উল আলম

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এ আইন সম্পর্কে যা জেনেছি তা খুবই সামান্য। সরকার গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকারকে সুসংহত করার জন্য এ আইনটি করেছে। সাধারণ জনগণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না। এই তথ্য অধিকার আইনে কী কী তথ্য আছে এবং তা তাদের কী কাজে লাগবে তা জনগণকে জানাতে হবে। সাধারণ মানুষকে এ আইন জানানোর জন্য যে যে পদক্ষেপ নেয়া উচিত তা নিতে হবে।

সাধারণ মানুষকে জানানোর দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, এ দায়িত্ব আমাদের সবার। সরকার, এনজিও, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সকলকে এ আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং জানাতে হবে।

এই আইন পৃথিবীর ৪০/৪৫টা দেশে রয়েছে। সেসব দেশের জনগণ এই আইন প্রয়োগ করে অনেক সুফল পাচ্ছে। এই আইন শুধু কাগজে-কলমে থাকলে কিছু হবে না। প্রয়োজন বাস্তবায়ন করা। এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরাও সুফল পাব। আমাদের দেশের জনগণ যদি এই আইন কার্যকর করতে পারে, তাহলে দেশের ও জনগণের অনেক লাভ হবে।

ড. অনন্য রায়হান

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো যে, রাষ্ট্র চাচ্ছে, জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্র চাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্র চাচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। রাষ্ট্রের চাওয়া ও আমাদের চাওয়া পূরণের জন্য যে কাজটি প্রয়োজন পড়ে তা হলো এর যথাযথ বাস্তবায়ন। আর এই আইন বাস্তবায়নের জন্য যা যা করণীয় তা এই মতবিনিময় সভায় চলে এসেছে। সেগুলো সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি।

১। তথ্য অধিকার আইন কী, কেন, এর প্রয়োজনীতা ও গুরুত্ব জনগণের কাছে প্রচার করা। তাদের এই আইন সম্পর্কে সচেতন করা।

২। বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সবাইকে এ আইন যাতে কার্যকর করা যায় তার জন্য দায়িত্ব পালন করা।

৩। তথ্য কী, এর প্রয়োজনীয়তা কী এসব বিষয় নিয়ে কর্মশালা করা, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রচার করা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, রেডিও, টেলিভিশনসহ সব গণমাধ্যমে প্রচার করা, বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা।

৪। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবশ্য অবলম্বন করতে হবে। তথ্য সংগ্রহের ও প্রদানের জন্য তথ্য কর্মকর্তাকে দক্ষ হতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

৫। তথ্য সংগ্রহের ফরমেট তৈরি করে তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান করা প্রয়োজন। এতে করে সাধারণ জনগণের তথ্য সরকারের কাছে থাকবে। আর অন্য দিকে সাধারণ জনগণের যে তথ্য প্রয়োজন তা তথ্য ইউনিট বা সরকারি তথ্যকেন্দ্র থেকে পাবে।

৬। তথ্য সংগ্রহের জন্য ডাটাবেইজ তৈরি করা যেতে পারে। এই ডাটাবেইজের মাধ্যমে যে তথ্য দরকার তা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৭। ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য গ্রহণ-প্রদান ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে। সেখানে নোটিশ বোর্ডে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য টাঙিয়ে রাখা প্রয়োজন, যাতে গ্রামের মানুষ খুব সহজেই তথ্য পেতে পারে। গ্রামের মানুষদের নিয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে। কমিউনিটি সভা করার মাধ্যমেও এই আইন সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে।

৯। তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন।

১০। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য বাজেট থাকা দরকার।

১১। প্রতিটি অফিস আদালতে একটি তথ্য ডেস্ক থাকা প্রয়োজন। জেলা তথ্য বাতায়নে আরো তথ্য দরকার।

১২। সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, যারা এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত তাদেরকেও এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যদের জানাতে হবে।

১৪। তথ্য সংগ্রহকে আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৬। সরকারি কর্মকর্তা, যারা তথ্য দেবেন তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন করা দরকার।

১৮। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সংগঠনের সহযোগিতা দরকার। সাংস্কৃতিক প্রচারণার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা।

২০। স্থানীয় পত্রিকা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

হাসিবুর রহমান, এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক

আইনটি সার্থকতা পাবে তখনই, যখন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর সুফল পাবে। এজন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধা আদায়ে কাজ করছে, তাদের এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোরও স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করতে হবে, যাতে জনগণ তাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারে।

সমাপনী বক্তব্য : প্রধান অতিথি

মো. জমসের আহাম্মদ খন্দকার

খুলনা জেলা প্রশাসক

Knowledge is power। এখন তার সাথে যুক্ত হয়েছে তথ্য। সকল ক্ষেত্র, সকল কাজে তথ্য প্রয়োজন। তথ্য ব্যতীত কোনো কাজ করা যায় না। সঠিক তথ্য না পেলে সঠিক কাজ করা যায় না। ভুল তথ্য দিয়ে সঠিক কাজ করা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বটা একটা গ্লোবাল ভিলেজ। এখানে যে যত বেশি তথ্যে সমৃদ্ধ, সে তত বেশি অগ্রসর। এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তথ্য ছাড়া আমাদের কোনো কাজ করার উপায় নেই।

তথ্য কী, এর প্রয়োজনীয়তা কী এসব বিষয়ে আমাদের দেশের মানুষ খুব কম জানে। এ সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। দেশ স্বাধীনের পর যেসব আইন প্রণয়ন হয়েছে, তার মধ্যে তথ্য অধিকার আইন অন্যতম।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা খুবই আন্তরিকভাবে সরকারের এ কাজে সহায়তা করছি। আমি জেলা পর্যায়ে যেসব তথ্য প্রয়োজন তা সংগ্রহ করেছি। এসব তথ্য জেলা ওয়েবে রয়েছে। এ জেলাতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলছে। কোনো ব্যক্তি জেলা কার্যালয়ে কোনো তথ্যের জন্য এলে আমরা যতটুকু সম্ভব, তা দিই। এ ক্ষেত্রে এই জেলার বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা সবাই পজিটিভ মন-মানসিকতা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিত সবার কাছ থেকে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়

ক. আগামী এক বছর পর তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা পরিমাপের জন্য কী মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে?

- তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে কি না, মনিটরিং করা।
- তথ্যভান্ডার প্রস্তুত আছে কি না, তা জানা।
- তথ্য উন্মুক্ত করা হয়েছে কি না (Open source)।
- কত জনকে চাহিদামাফিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে, তার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে কি না।
- জেলা/উপজেলাভিত্তিক তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কর্মকর্তা জেলা/উপজেলাভিত্তিক সকল প্রতিষ্ঠানের তথ্যপ্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর ঐসব প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং বর্তমান সরকারের প্রতিটি জেলা/উপজেলায় যে কম্পিউটার প্রদান করেছে তাতে সংরক্ষণসহ জেলা/উপজেলায় তথ্য কমিশন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংক্ষেপে বোর্ডে টাঙিয়ে দিতে হবে।
- পত্রিকা ও মিডিয়াকে আমরা মাপকাঠি হিসেবে ধরতে পারি।
- কতটি প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্যসমৃদ্ধ Website খুলেছে।
- কতটি প্রতিষ্ঠান যথানিয়মে তথ্য সংরক্ষণ করেছে।
- স্ব স্ব দপ্তরগুলিতে Follow up করা যেতে পারে। কীভাবে চলছে তা দেখা।
- কী কী ধরনের তথ্য জনগণের বিশেষ চাহিদা তার Follow up তার করা গেলে।

- স্ব স্ব দপ্তরগুলিতে follow-up করা যেতে পারে। কিভাবে চলছে তা দেখা।
- Related অফিসগুলোর নির্দিষ্টভাবে format এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারা যাবে।
- কি কি ধরনের তথ্য জনগণের জন্য বিশেষ চাহিদা তার follow-up করা গেলে।
- তথ্য কর্মকর্তাদের মূল্যায়ন করে।
- দপ্তরপ্রধানদের নিয়ে মূল্যায়ন team গঠন করা যেতে পারে নিয়মিত তদারকির জন্য।
- সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরগুলির তালিকা তৈরী ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দেখার মাধ্যমে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না দেখা।

- তথ্য প্রদানকারীদের মূল্যায়ন করে।
- দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে মুল্যায়ন Team করা যেতে পারে নিয়মিত কাজ করার জন্য।
- সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরগুলোর তালিকা তৈরি ও বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া দেখার মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে তা দেখা।
- সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর Survey-এর মাধ্যমে।
- Sampling করে Demand Side-এর Survey-র মাধ্যমে।
- এই ধরনের অনুষ্ঠান আগামী ৬ মাস/এক বছর পর Review করা।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পজিটিভ পরিবর্তন এসেছে। আলাপ করলে বোঝা যাবে।
- কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থা তাদের কাজের তালিকা, অর্থের উৎস ও অন্যান্য তথ্য সরাসরি বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করছে জনগণের জন্য– বিশেষভাবে দুর্যোগবিষয়ক কার্যক্রম।
- তথ্য অধিকার অগ্রগতির মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে
- জনগণের নিকট ফলোআপ করা।
- বছর শেষে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে পদক্ষেপ ও বাজেট বরাদ্দ রাখা।
- সাধারণ জনগণ কতটুকু তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন তার ওপর Sample Survey করা।
- তথ্য প্রদানকারীদের জন্য তথ্য প্রদানের পরিসংখ্যান থেকে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে এবং এটাকেই মাপকাঠি হিসেবে ধরা যেতে পারে।
- প্রতিটি জেলায় সরকারি-বেসরকারি রেকর্ডপত্র অবজারভ করা।
- প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল ক্ষেত্রে তথ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে।
- পাক্ষিক, মাসিক ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা
- যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে তার সর্বশেষ অবস্থা যাচাইয়ের জন্য একটি নির্ধারিত মনিটরিং ব্যবস্থা ও রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে।
- জেলা প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন বিভাগের প্রতিবেদন প্রেরণ, এ মর্মে যে কতজন তথ্য চেয়েছেন এবং প্রদান করা হয়েছে বা কী কারণে দেয়া যায়নি, তার প্রতিবেদন।
- প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য সেল গঠন ও পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে কি না।

খ. খুলনা বিভাগের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

- প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের অভাব।
- সরকারি কর্মকর্তাদের মানসিকতা।
- অবকাঠামোগত সমস্যা।
- স্ব স্ব দপ্তরে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের অভাব আছে।
- দপ্তরগুলোয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সীমাবদ্ধতা আছে।

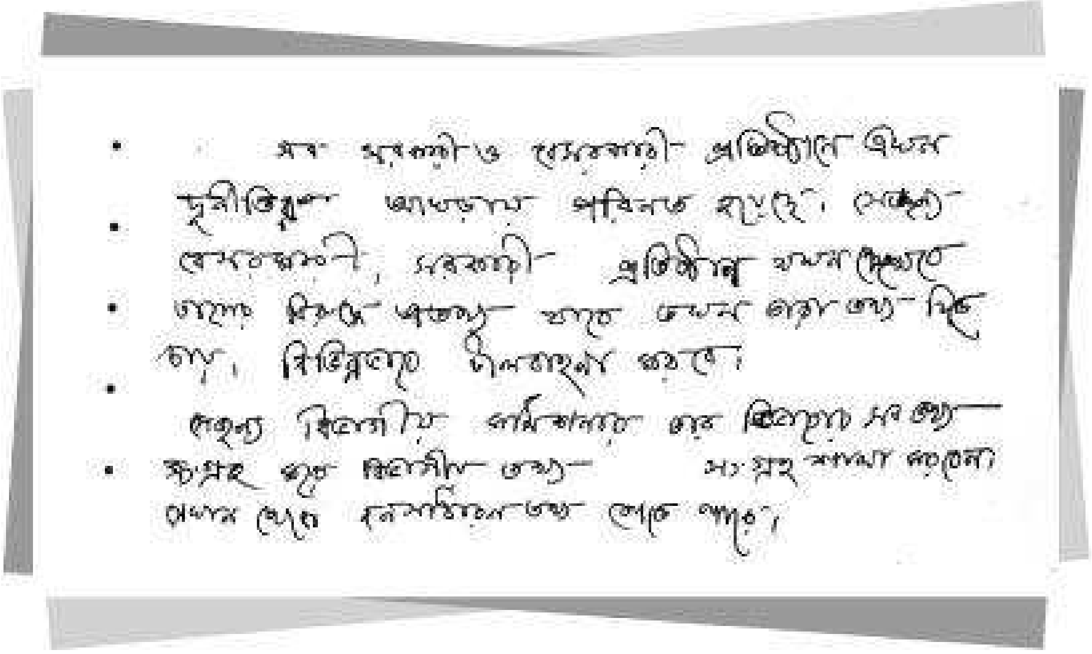

- জনগণের অসচেতনতা/সচেতনতার অভাব আছে।
- প্রাপ্ত তথ্য, বিশেষ করে দুর্নীতির তথ্য কোথায় পাঠাতে হবে এবং এর প্রক্রিয়া জানার ব্যবস্থা নাই/আছে, যা আমাদের জানা নাই।
- তথ্য নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। জানতে ও জানানোর ব্যবস্থা নেই।
- দপ্তরে তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা।
- জনগণ তথ্য অধিকার সম্পর্কে একেবারে অবহিত নয়। ব্যাপক হারে অবহিত করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। এ খাতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বরাদ্দ রাখা একটি Challenge।
- স্বার্থান্বেষী দলকে এবং পরিবেশ ধ্বংসকারীদের (চিংড়িচাষি, সুন্দরবন ধ্বংসকারী) সচেতন করা একটি বড় Challenge।
- সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাব পরিবর্তন।
- তথ্যের সঠিক সংরক্ষণ ও প্রাপ্যতা।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদের জীবন-জীবিকার তথ্য Access করার জন্য।
- তথ্যের অপব্যবহার।
- কর্মকর্তারা সঠিক তথ্য দিতে চাইবেন না।
- সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতার সঙ্গে সাধারণ জনগণের ক্ষমতা অনেক কম হওয়ায় সাধারণ জনগণ Information পেতে সচেষ্ট হবে না।
- অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রধানদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ প্রস্তুত নয়।
- দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অবস্থা-অবস্থানবিষয়ক তথ্যভাণ্ডার নেই।
- তথ্য সংরক্ষণের অবকাঠামোর অভাব
- সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এখন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সেজন্য বেসরকারি, সরকারি প্রতিষ্ঠান যখন দেখবে তাদের বিরুদ্ধে এ তথ্য যাবে তখন তারা তথ্য দিতে চায় না। বিভিন্নভাবে টালবাহানা করবে।

- অবকাঠামোগত সমস্যার নিরসন করতে হবে, কারণ এটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- সীমান্ত এলাকা, তথ্য পাচার তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত।
- রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অপপ্রচার এবং অপসংস্কৃতি।
- প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ (সরকারি/বেসরকারি ব্যক্তিবিশেষ)
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জঙ্গি এজেন্ট।
- আগেই উল্লেখ করেছি, কোনো বিশেষ বিভাগ বা অঞ্চল নয়, দেশের সব এলাকার চ্যালেঞ্জ একই রূপ। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি, খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরগুলো থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত (প্রশাসন/সংস্থা/বিভাগ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট মহলকে সচেতন করতে হবে।
- তথ্য প্রদানের কোনো কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করা না থাকার জন্য সময়ক্ষেপণ করা হবে, যা চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি।
- প্রশাসন দূরে থাকার জন্য সাধারণত জনমনে ভয়, তথ্য অধিকার আইন থাকলেও বাস্তবায়ন কঠিন বলে মনে করেন।

গ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার ? সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজটি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। কারণ একদিকে এ আইনের দ্বারা মানুষ কতটুকু অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং কী প্রক্রিয়ায় এ আইনের সুবিধাপ্রাপ্তি সম্ভব সে সম্পর্কে বেশিরভাগ নাগরিকই অবগত নন।
- প্রত্যেক সরকারি অফিস থেকে শুরু করা দরকার
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করা দরকার
- এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে তথ্য-বোর্ডে তাদের তথ্য উপস্থাপন করতে পারে।
- তথ্য সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ ও সহজ ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ।
- আমার প্রতিষ্ঠান 'প্রচারণা', 'দক্ষতা বৃদ্ধি' ও তথ্য প্রচারে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রদানে উৎসাহিত করা।
- জনগণকে আইন সম্পর্কে জানানো।
- দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, যারা তথ্য দেবেন তাদের।
- তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ।
- সমাজের তৃণমূল পর্যায় থেকে এ সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা ও সচেতন করা।
- স্ব স্ব দপ্তরে তাদের কার্যক্রম-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচারের সংরক্ষণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। (তথ্য মেলা তৈরি)
- নাগরিকদের মতামত নিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় (গুরুত্বপূর্ণ) তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে ।
- তৃণমূল পর্যায় থেকে এবং নিজস্ব সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের থেকে।
- সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে, যেমন—উঠান বৈঠক, সমাবেশ, প্রশিক্ষণ।
- স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গা থেকে শুরু করা দরকার।

প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা :

- ✓ তথ্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ
- ✓ প্রয়োজনীয় তথ্যের Database সংরক্ষণ
- ✓ সকল কর্মীকে আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ
- ✓ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ/প্রকাশনা করা।

- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের প্রথম কাজ শুরু করতে হবে নিজেদের প্রতিষ্ঠান থেকে।
- আমার প্রতিষ্ঠান তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে সঠিকভাবে বোঝাবে।
- অর্থের বিষয় চিন্তা করে সরকারি উদ্যোগে বার কাউন্সিলের সহযোগিতায় এমআরডিআই-এর মতো স্বীকৃত এনজিওর জেলাভিত্তিক সংবাদপত্রসমূহ স্থানীয় সুশীল সমাজ সমন্বয়ে প্রথমত, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সেমিনার করতে হবে। জেলাভিত্তিক এই ধরনের সেমিনার করে পর্যায়ক্রমে উপজেলা/থানা এবং পরবর্তী সময়ে ইউনিয়নভিত্তিক করতে হবে। জেলা, উপজেলা, থানা বা ইউনিয়নের এরূপ কার্যাবলি সমন্বয় করবে বিভাগীয় কমিটি। বিভাগীয় কার্য পরবর্তী সময়ে বছর শেষে রাজধানীতে এসে এর অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালি কী হবে তা তথ্য কমিশনের কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনাক্রমে নির্ধারিত হবে। এ ক্ষেত্রে আমার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বার কাউন্সিলের মাধ্যমে জেলা আইনজীবীর সঙ্গে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করা দরকার। কারণ সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে এখনো অজ্ঞ।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ গ্রাম-গঞ্জ থেকে শুরু করতে হবে।
- আমার সংস্থা 'তথ্য প্রদান সেল'-এর মাধ্যমে জনস্বার্থে সকল সেবার তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।
- মন্ত্রণালয় থেকে শুরু তার অধীনস্থ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্কুলারসহ অনুমোদন দিতে হবে।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত তথ্য অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে হবে জনগণকে।
- এ ক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠান সহযোগী প্রতিষ্ঠান হয়ে ধারণা প্রদানের কাজে অংশগ্রহণ করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। লোকসংগীত, পথনাটক, উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে জানাতে পারি।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কাজ প্রথমে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে শুরু করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তথ্য অধিকার বিষয়টি জনগণকে বোঝাতে হবে। কোথায় গেলে কী তথ্য পাওয়া যাবে, এ বিষয়ে সাধারণ জনগণকে বোঝাতে হবে।

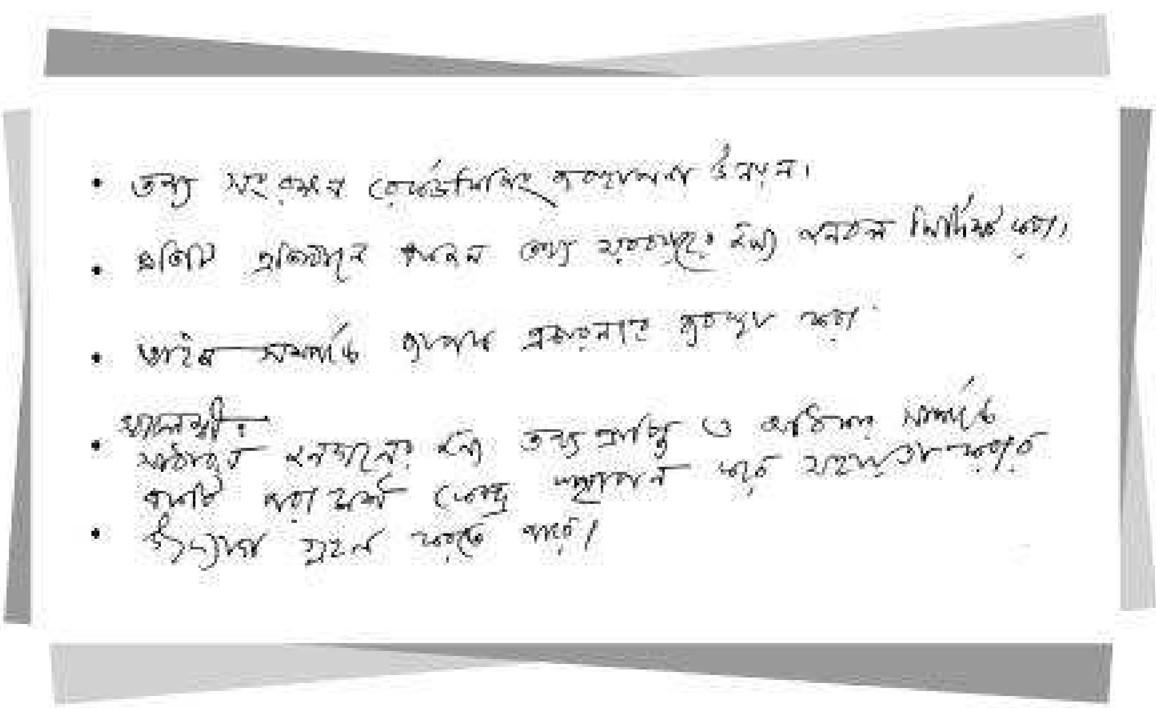

- তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির কাজ তৃণমূল পর্যায়ে হওয়া দরকার।
- তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তথ্য কমিশন থেকে দেওয়া দরকার।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মীদের সচেতন করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ রেকর্ডিং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একজন তথ্য সরবরাহের জন্য জনবল নির্দিষ্ট করা।
- সাধারণ জনগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি ও অধিকার সম্পর্কে একটি পরামর্শকেন্দ্র স্থাপন করে সহায়তা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
- কমিউনিটি পর্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেখানে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির একটা বড় ভূমিকা থাকতে হবে। সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জনগণের ভূমিকা থাকবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব থাকতে পারে উপরোক্ত বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে সঠিক নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচিত করে কাজটির সঠিক বাস্তবায়নে সহায়তা।
- স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ।
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি বিলবোর্ডে টাঙিয়ে দিতে পারেন।
- জনগণ যেসব সুবিধা পেতে চায় তার ওপর ভিত্তি করে সেসব সরকারি-বেসরকারি সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সম্পর্কে তাদের প্রথমে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- তথ্য অফিস এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে পারে।
- যেসব দপ্তর/বিভাগ/সংস্থার কাছে তথ্য চাওয়া হবে বা তথ্য প্রদানের আওতায় আসবে সেসব যেসব দপ্তর/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তথ্য কী, তথ্য অধিকারই বা কী সে সম্পর্কে আগে ভালোভাবে অবহিত থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তাহলে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণ ভোগান্তির শিকার হবে না।
- সাংবাদিক হিসেবে বলতে পারি, আমার প্রতিষ্ঠান দৈনিক পূর্বাঞ্চল/খুলনা প্রেসক্লাব তথ্য অধিকার সম্পর্কে মোটিভেশনের কাজ করতে পারে।
- সংবাদপত্র এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে রিপোর্ট করতে পারে।

ঘ. এই বিভাগে কী ধরনের কার্যক্রম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে?

- আইনটির প্রচারণা
- সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের কর্মীদের প্রশিক্ষণ
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শাখা অফিস হওয়ায় তথ্য প্রদানের জন্য কর্মী/কর্মকর্তা নিয়োগ করা।
- জনগণের নিকট এই আইন উপস্থাপন।
- বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে সভা/সেমিনার করা।
- প্রশিক্ষণ, নাটক, বিলবোর্ড, পট গান, পোস্টারিং, টিভি স্পট ইত্যাদি মাধ্যমে।
- মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক সমাবেশ, সেমিনার প্রচারণা করতে হবে।

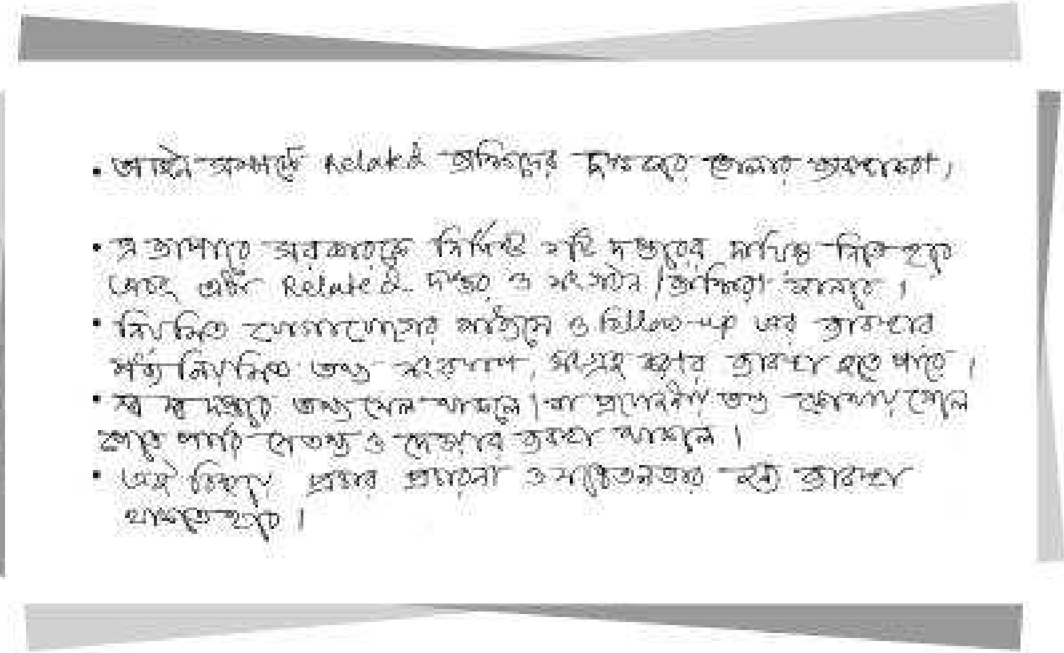
• আইন সম্পর্কে Related অফিসারদের দ্বারা জানার ব্যবস্থা করা।
• এ ব্যাপারে সরকারকে নির্দিষ্ট কিছু দপ্তরের দায়িত্ব দিতে হবে যেন প্রতিটি Related দপ্তর ও সংস্থার [illegible] আসে।
• নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে ও follow-up এর মাধ্যমে সঠিক নিয়মিত তথ্য সরবরাহ, সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হতে পারে।
• স্ব স্ব দপ্তরে তথ্য সেল থাকলে। যা প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে গেলে সাথে সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য পাওয়া যাবে।
• এই বিষয়ে প্রচার প্রচারণা ও সচেতনতার [illegible] ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- বিভাগীয় তথ্য অফিসের মাধ্যমে প্রথমে খুলনা বিভাগের অধীনে সমস্ত জেলা পর্যায়ের সরকারি তথ্য অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এবং সরকারি আইনে পরিচালিত বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, সুশীল সমাজ (চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী/সাংবাদিক, বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ)-এর প্রতিনিধি নিয়ে এই আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।
- যেসব প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রদানে বাধ্য, সেসব প্রতিষ্ঠানকে তাদের দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন করতে হবে।
- গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা নিরূপণ করার কাজে যৌথভাবে পর্যালোচনা করা।
- নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- যতদূর সম্ভব আইনের ফাঁক না রাখা।
- আইনটি আরো শক্তিশালী করা।
- ব্যাপক আলোচনার ব্যবস্থা এই আইনের গুরুত্ব তুলে ধরে।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্যোগী হয়ে কাজ করতে হবে।
- এই আইন সম্পর্কে তৃণমূল মানুষকে সচেতন করতে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা দরকার।
- জেলায় একটি কার্যকরী তথ্য সংগ্রহ সেল থাকবে।
- প্রতি মাসে এই সেলে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কোনো বিশেষ বিভাগ বা এলাকা নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের প্রতিটি এলাকায়ই একই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত হবে।
- প্রতিটি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সরকারি-বেসরকারি ই-গভার্ন্যান্স ডাটা আপলোড করে তথ্য প্রদানে সহায়ক হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ।
- ভাষাগত সমস্যা। সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা।
- প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের অপর্যাপ্ততা। কাঠামোর উদ্যোগ।

- তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, তথ্যের সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, নির্ভুল ও মানসম্মত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সরকারি ও বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয়ভাবে সচল রেখে এবং একটি নেটওয়ার্কের আওতায় এনে (কমিউনিটি/মনিটরিং টিম তৈরি) করতে পারলে তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন এই বিভাগে সম্ভব।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন—জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসনকে তার জেলার সকল প্রতিষ্ঠান সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা জনসাধারণ চাহিবামাত্র দেবে। সে ক্ষেত্রে জনগণ এক জায়গা থেকে তথ্য পেতে পারবে।
- সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য সেল গঠন ও তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে।
- বেশি করে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া।
- সরকারি বা বেসরকারি সংগঠনগুলো বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিতে পারে।
- কোনো বিভাগ তার কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রথমেই যারা Stake holder তাদের কাছে তার কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা।
- সরকারি বিভাগগুলো জনস্বার্থে সংরক্ষণ ও এলাকার উন্নয়নে কী কী কাজ করছে এবং জনগণের সম্পৃক্ততা কীভাবে করা সম্ভব তা নিয়ে বেসরকারি সংস্থা ও Civil Society-র সঙ্গে বছরে ৩ বার সমন্বয় সভা করা যেতে পারে।
- খুলনা বিভাগে লবণাক্ততা, সুন্দরবন সংরক্ষণ ও পেশাজীবীদের উন্নয়নে সরকারের কী কী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে তা জনগণকে জানানো।
- সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক সংগঠনের সমন্বয়ে একটি বিভাগীয় তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন এবং সক্রিয় করা।
- গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আইনটি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সভা/মিটিং করা।
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট তথ্য বিষয়ে সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- গণমাধ্যম কর্মীদের এগিয়ে আসা।
- আইন সম্পর্কে Related ব্যক্তিদের দক্ষ করে তোলার ব্যবস্থা করা।
- এ ব্যাপারে সরকারকে নির্দিষ্ট একটি দপ্তরের দায়িত্ব নিতে হবে এবং এটা Related দপ্তর ও সংগঠন/ব্যক্তিরা জানবে।
- নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে ও Follow up-এর মাধ্যমে এর ব্যবস্থার নিয়মিত তথ্য সংরক্ষণ, সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হতে পারে।
- স্ব স্ব দপ্তরে তথ্য সেল থাকলে বা প্রয়োজনীয় তথ্য কোথায় গেলে পেতে পারি, সে তথ্যও দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী বিভাগীয় আলোচনা

১৯ জুন ২০১০, অ্যারিস্টোক্রেট, রাজশাহী

সঞ্চালক	: ফরিদ হোসেন ব্যুরো প্রধান, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	: ড. অনন্য রায়হান নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট
প্রধান অতিথি	: মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্ত জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক

হাসিবুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তব্য

এমআরডিআই মূলত কাজ করে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের মান উন্নয়নে। এর বাইরে আমরা দুটি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করি। তার একটি হলো তথ্য অধিকার আইন নিয়ে। কীভাবে এই আইন জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, কীভাবে এ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা যায়, কীভাবে এই আইন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করা যায়, কোথায় এর সীমাবদ্ধতা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কোথায় কী ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, সেসব বিষয় নিয়ে কাজ করি।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হলো, তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের অনেকেই আইনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। সেজন্য তাঁদের সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে কাজ করেছে আসছে। আর এই আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সঞ্চালক

সাংবাদিক ফরিদ হোসেন

তথ্য অধিকার আইন আমাদের অনেক দিনের চাওয়া। এটি পাস হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন তেমনভাবে অগ্রসর হয়নি। এটিকে চর্চার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। যেকোনো আবিষ্কার, তা কাজে না লাগলে কোনো ফল আসে না। এ আইনকে কাজে লাগাতে হবে।

এই আইনটি ভালো। কেন ভালো? কেননা এটি জনগণের আইন, জনস্বার্থের আইন। কিন্তু এই আইনটির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। কারণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণ জানে না। এ 'আইনের সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ে জনগণকে জানাতে হবে।

এই আইনের মাধ্যমে আমরা ঘুষ দেওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ করতে পারি। আমাদেরকে ঘুষ দেওয়ার সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে। আমরা যে কাজ করি তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সব ক্ষেত্রে রাখতে হবে।

এই আইন বাস্তবায়নে, এই আইন সাধারণ জনগণের কাছে নিয়ে যেতে গণমাধ্যমগুলো অনেক বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে। এই আইনটি ব্যবহার করে আমরা দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করতে পারি। এজন্য তথ্য সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কর্মশালা, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, লিফলেট, পত্রিকা, বই-পুস্তক প্রকাশ, বিলবোর্ড ও তথ্য মেলা করে প্রচারণার মাধ্যমে এই আইনকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সব ধরনের প্রচারের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে হবে। তথ্য জানা ও চাওয়া একটা স্রোত। এই স্রোতকে চলমান রাখার ব্যাপারে সকলকে আন্তরিক হতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক

ড. অনন্য রায়হান

বাংলাদেশে ৮০০টিরও বেশি আইন রয়েছে। এর মধ্যে গুটি কয়েক আইন রয়েছে জনগণের জন্য। তার মধ্যে এই তথ্য অধিকার আইন অন্যতম। এই আইনের বিষয় হলো অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা। তথ্য অধিকার না থাকলে দেশে গণতন্ত্র বিকাশ কখনো সম্ভব নয়। গণতন্ত্র বিকাশের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, সব নাগরিকের জন্য তথ্য অধিকার। এ ছাড়া মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অধিকার অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে, যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

এই আইনের উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন। আর জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন করতে হলে তথ্য দরকার। তথ্য ছাড়া জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ আইন করা হয়েছে।

একনজরে তথ্য অধিকার আইন : তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রণীত 'বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' সংসদে পাস হয় ২৯ মার্চ, ২০০৯-এ। এটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ৫ এপ্রিল ২০০৯। গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ৬ এপ্রিল ২০০৯। এই আইনটি কার্যকর হয় ১ জুলাই ২০০৯ থেকে এবং ওই দিনই তথ্য কমিশন গঠিত হয়। ৪ জুলাই প্রধান তথ্য কমিশনার এম আজিজুর রহমান এবং কমিশনার এম এ তাহের ও ড. সাদেকা হালিম নিয়োগ পান।

'বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত ২০তম আইন। এই আইনের গেজেটটিতে ২০টি পৃষ্ঠা ও ৮টি অধ্যায় রয়েছে। এই আইনে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য তিনটি পক্ষকে চিহ্নিত করা হয়েছে : ১. প্রথম পক্ষ হলো নাগরিক যার কাছে তথ্য নেবে, অর্থাৎ চাহিদাকারী; ২. দ্বিতীয় পক্ষ হলো যারা তথ্য দেবে, অর্থাৎ তথ্য প্রদানকারী; ৩. তৃতীয় পক্ষ হলো তথ্য ধারণকারী, অর্থাৎ যার কাছ থেকে দ্বিতীয় পক্ষ তথ্য সংগ্রহ করে প্রথম পক্ষকে দেবে।

এই আইনে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইনে আটটি প্রতিষ্ঠানের গোয়েন্দা ইউনিটকে বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এই আইনে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে। ২০টি পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা সমস্যা সৃষ্টি করলে শাস্তি হিসেবে জরিমানার বিধান রয়েছে। সংবিধানের ১০২ ধারা অনুসারে যেকোনো সংক্ষুব্ধ নাগরিক উচ্চ আদালতে রিট করতে পারবে, তবে তথ্য কমিশনের বিরুদ্ধে কোনো রিট করার সুযোগ নেই।

কর্তৃপক্ষ যদি আইনানুযায়ী তথ্য দিতে না চায়, তাহলে আমরা আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করব বা আপিল করব। আপিল কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হলে তখন আমরা তথ্য কমিশনের কাছে যাব। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই পক্ষগুলোই হলো তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি। প্রতিটি পক্ষেরই দায়িত্ব রয়েছে। সরকার, জনগণ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকলকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যার যা দায়িত্ব রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করা উচিত।

আইনে তথ্য, তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যম এবং তথ্যের ধরন একসাথে বলা হয়েছে। তবে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করা দরকার। তথ্য হলো কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত যেকোনো স্মারক, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য ও উপাত্ত, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনাপত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র ও অঙ্কিত চিত্র ইত্যাদি। তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যম হলো কাগজ, ফাইল, বই, লগ বই, আলোকচিত্র, অঙ্কিত চিত্র, মাইক্রোফিল্ম সফটওয়ার, ডাটাবেইজ ওয়েবসাইট ইত্যাদি। তথ্য সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে, ধারা ৫-(১) তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করবে। ধারা ৫-(২) যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায় তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য পাওয়ার সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমগ্র দেশে তার সংযোগ স্থাপন করবে। ধারা ৫-(৩) তথ্য কমিশন তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে এবং তা সকল কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করবে। তথ্যের ধরন হলো লিখিত, অডিও, ভিডিও, ফিল্ম, আলোকচিত্র ও অঙ্কিত চিত্র ইত্যাদি।

আইনে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। স্বপ্রণোদিতভাবে প্রদেয় তথ্যগুলো হলো :

১। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম, সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ড-সম্পর্কিত তথ্য।

২। প্রকাশিত প্রতিবেদন।

৩। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ।

৪। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দায়িত্ব-সম্পর্কিত তথ্য।

৫। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন, আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি।

৬। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে লাইসেন্স, পারমিট, অনুদান, বরাদ্দ, সম্মতি পাওয়ার শর্তসমূহ ও প্রয়োজন হলে তার বিবরণ।

৭। অনুমোদন বা অন্য কোনো সুবিধা প্রাপ্তির বিবরণ।

৮। নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ।

৯। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও ঠিকানা, ফোন-ফ্যাক্স ও ই-মেইল ঠিকানা।

১০। কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি প্রণয়ন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ওই সব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থনের যুক্তি ও কারণের ব্যাখ্যা।

১১। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা।

১২। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রকাশ, প্রচার ও প্রাপ্তির জন্য তথ্য কমিশন প্রদত্ত নির্দেশনা।

১৩। মন্ত্রিপরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সেই সিদ্ধান্তের কারণ এবং ভিত্তি-সম্পর্কিত কোনো তথ্য।

যেসব তথ্য চাওয়া যাবে না, তা আইনের ৭ ধারায় বলা হয়েছে। এই তথ্যগুলো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা, ব্যবসায়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের গোপনীয়তা, বিচারাধীন ও তদন্তাধীন বিষয়ের গোপনীয়তাসংক্রান্ত। এ ছাড়া তথ্যের সংজ্ঞায় দাপ্তরিক নোটশিটকে রাখা হয়নি।

কিছু সংস্থা, যারা এই আইনের আওতায় পড়ে না: ১। এনএসআই, ২। ডিজিএফআই, ৩। সিআইডি, ৪। এসএসএফ, ৫। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, ৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল, ৭। এসবি এবং ৮। গোয়েন্দা সেল।

একটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি রয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ বা তথ্য প্রদানকারী ইউনিট কি না। অনেকে মনে করেন, তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় ইউনিয়ন পরিষদকে বাদ রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইউনিয়ন পরিষদ ২(খ, ই) অনুসারে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সুতরাং এটি একটি কর্তৃপক্ষ। তবে তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের সংজ্ঞায় ২(ঘ, আ)-এ কার্যালয় হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের উল্লেখ নেই বলে অনেকে মনে করেন, কর্তৃপক্ষ হলেও তথ্য প্রদানকারী ইউনিট না থাকলে তথ্য প্রদান করবে কী করে। প্রকৃতপক্ষে, ইউনিয়ন পরিষদের কোনো শাখা না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদ একই সঙ্গে তা কর্তৃপক্ষ এ তথ্য প্রদানকারী ইউনিট। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদকে তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে।

তথ্য অধিকারের অংশীদারসমূহ : ১। নাগরিক, ২। তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ), ৩। তথ্য কমিশন, ৪. নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ ৫। মিডিয়া, ৬. আদালত।

তথ্য কমিশনের কাঠামো : ১। প্রধান তথ্য কমিশনার, ২। তথ্য কমিশনার (মহিলা), ৩। তথ্য কমিশনার, ৪। সচিব, ৫। অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা, ৬। অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী কর্মচারী।

তথ্য কমিশন যাদের সাথে কাজ করে : ১। সরকার, ২। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, ৩। নাগরিক সমাজ, শিক্ষা ও পেশাগত প্রতিষ্ঠান, ৪। নাগরিক।

আপিল করার প্রক্রিয়া : ধারা ২৪(১) কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পেলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আচরণে যদি ক্ষুব্ধ হন, তাহলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার আগে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে হবে।

কীভাবে আপিল করবেন তা নির্ধারণ করুন। কর্তৃপক্ষের মতামতের ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। আপিল আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে জমা দিন এবং জমার রসিদ বুঝে নিন। আপিল আবেদন জমা দিতে দেরি হলে তার কারণ উল্লেখ করুন। আপিল ফলাফলের লিখিত কপি সংগ্রহে রাখুন। প্রাপ্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি না থাকলে সমস্যা সমাধানে তা ব্যবহার করুন। ধারা ১৩(১) তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা তথ্য কমিশনের কাছে জানাতে হবে। তথ্য কমিশনের স্থানীয় বা প্রধান কার্যালয়ে জানাতে হবে। প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

তথ্য কমিশনে অভিযোগের প্রতিক্রিয়া : কীভাবে অভিযোগ করবেন তা নির্ধারণ করুন। কর্তৃপক্ষের মতামতের ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। অভিযোগ আবেদনপত্র সঠিকভাবে পূরণ করে জমা দিন এবং জমার রসিদ বুঝে নিন। আপিল আবেদন জমা দিতে দেরি হলে তার কারণ উল্লেখ করুন। তথ্য কমিশনের কাছ থেকে ৪৫ অথবা ৭৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। আপিল ফলাফলের লিখিত কপি সংগ্রহে রাখুন। প্রাপ্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি না থাকলে সমস্যা সমাধানে তা ব্যবহার করুন।

তথ্য প্রাপ্তিসংক্রান্ত সময়সীমা : তথ্য প্রাপ্তি প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে, ধারা ৮-(১) তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে প্রয়োজনীয় মূল্য দিতে হবে। তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে ধারা ৯-(১) অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের তারিখ হতে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করবেন। একাধিক তথ্য প্রদানের ইউনিট থেকে তথ্য গ্রহণের প্রয়োজন হলে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সর্বোচ্চ ৩০ দিনের। কর্তৃপক্ষ যদি আবেদন বাতিল করেন তাহলে তা ১০ দিনের মধ্যে জানাবেন। অনুরোধকৃত কোনো তথ্য ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত তথ্য হলে অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ জানাবেন। ধারা ৩২ (৩) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য চাইলে এবং তথ্যটি দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তথ্য কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা সকলের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এ দায়িত্ব নিজ থেকে নিতে হবে। সরকার এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে।

তথ্য অধিকার আদায়ে নিয়োজিত বা নিয়োজিত হতে ইচ্ছুক সংগঠন, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ জনসচেতনতা সৃষ্টি করার কাজ করতে পারেন। সাধারণ নাগরিক এ কাজ করতে পারেন। আমরা বিভিন্ন উপায়ে বা মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি।

এই আইন প্রচারের মাধ্যম : কর্মশালা, বক্তৃতা, নাটক ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, বিতর্ক বা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কেস স্টাডি প্রতিযোগিতা, লিফলেট, পত্রিকা, বই-পুস্তক প্রকাশ, বিলবোর্ড, টেলিভিশন ও বেতারে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রচার, টেলিভিশন ও বেতারে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার, প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত কর্নার, অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র, নির্দেশিকা প্রকাশ এবং তথ্য ও জ্ঞান মেলা করে প্রচারণার মাধ্যমে এই আইনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

একটা বিষয় পরিষ্কার যে রাষ্ট্র চাচ্ছে, জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্র চাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্র চাচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। রাষ্ট্রের চাওয়া, রাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের দায়িত্ব হলো এসব তথ্য আইনে যেমন আছে ঠিক তেমনভাবে প্রকাশ করা। জনগণকে ভালো করে জানানো। যাতে করে তারা তথ্যগুলোকে বুঝতে পারে। এবং তার নিশ্চয়তা প্রদান আমাদের দায়িত্ব।

আজকের আলোচনার মতামত ও প্রশ্ন আপনারা চারটি প্রশ্ন বা বিষয়কে সামনে রেখে করবেন। যাতে আমরা এই আইন বাস্তবায়নের সব বিষয় নিয়ে আসতে পারি।

১। রাজশাহী বিভাগে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করলে আমরা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে পারব?

২। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের কোন জায়গা থেকে শুরু করা উচিত?

৩। রাজশাহী বিভাগে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে?

৪। রাজশাহী বিভাগে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আগামী এক বছরে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে এবং তা পরিমাপ করার মাপকাঠি কী হতে পারে?

সঞ্চালক

ফরিদ হোসেন

ধন্যবাদ ড. অনন্য। বিস্তারিতভাবে তথ্য অধিকার আইনের নানা বিষয় ড. অনন্যের উপস্থাপনায় চলে এসেছে। এ আইনের গুরুত্ব, সম্ভাবনা, সীমাবদ্ধতা–সকলগুলো বিষয় চলে এসেছে। তার আলোচনায় উঠে এসেছে এ আইন বাস্তবায়নে সরকার, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ জনগণ কীভাবে কাজ করতে পারে সেই বিষয়গুলো।

এ আইনের কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে। তা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইন সবার জন্য খুবই প্রয়োজন। এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করে এই আইনের সুফল। বাস্তবায়ন ছাড়া কোনো কিছুরই ফল পাওয়া যায় না। আসল কথা হলো কর্তব্য ছাড়া অধিকার যেমন পাওয়া যায় না, তেমনই এই আইন বাস্তবায়নে কাজ না করে এর সুফল আমরা অর্জন করতে পারব না। তাই আমাদের সবাইকে এই আইন বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে।

মতামত ও প্রশ্নোত্তর পর্ব

ড. হাসিবুল আলম প্রধান
সহযোগী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। এই আইনটি পাস হওয়া এবং তার বাস্তবায়নের কারণে আমাদের অনেক অধিকার রক্ষিত হবে। মানুষের অধিকার অর্জনের সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার নিশ্চিত হওয়ার ওপর। যেমন, নাগরিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয়।

তথ্য অধিকার আইন পাসের এক বছরের বেশি সময় পার হলো। কিন্তু এই আইনটি বাস্তবায়নে তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, এখনো শিক্ষিত মানুষের মধ্যে কজন জানে? কেন জানে না? এ ক্ষেত্রে প্রথমত দায়ী সরকার। তারপর যারা এই আইন নিয়ে অ্যাডভোকেসি করছে তারা। সর্বশেষে আমরা, যারা এই সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তি।

তথ্য অধিকার আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা প্রয়োজন। যেমন : আপিলের ক্ষেত্রে, তথ্য প্রদানের সময়ের ক্ষেত্র, দিন-তারিখ ও কার্যদিবসের ক্ষেত্রে। যেহেতু মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য এই আইনটি করা হয়েছে, তাই এটাকে আরো সহজ ও বোধগম্য করা প্রয়োজন।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্য গ্রহণকারীকে যাতে হয়রানির শিকার না হতে হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার। আবার তথ্য প্রদানের নামে কাউকে যেন হয়রানি না করা হয়, সে দিকটিও বিবেচনায় রাখা দরকার। এজন্য তথ্য প্রদানকারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে।

জেলা বাতায়নকে আরো সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন, যাতে মানুষ অনেক তথ্য জেলা বাতায়ন থেকে সংগ্রহ করতে পারে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জেলা বাতায়নকে মডেল ধরা যেতে পারে বা করা যেতে পারে। জেলা কর্মকর্তা কী কী তথ্য মানুষকে দিয়েছেন এবং কী কী তথ্য তিনি মানুষের কাছে নিয়েছেন তা জেলা বাতায়ন অথবা আলাদা ওয়েবসাইট করে আপডেট করে রাখা যেতে পারে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার মূল্য বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়া দরকার।

বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন হতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। তবে আইনটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে আরো উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

ড. এম আনিসুর রহমান
ডিন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এই আইনটি আমাদের সকলের জন্য প্রয়োজন। এই আইনের মাধ্যমে আমরা এখন আমাদের অধিকারগুলো বাস্তবায়ন না হলে তার জন্য সরকারের কাছে জবাবদিহিতা চাইতে পারব। কিন্তু এই আইন বাস্তবায়নে ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। যার কারণে গত এক বছরে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেনি। তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য থাকা প্রয়োজন। তথ্য অধিকার আইনে চিন্তা, স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু জনগণ তা পায়নি। তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে; কিন্তু আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেরি হচ্ছে। সে কারণে তথ্য অধিকার আইনের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়নি।

এখনো তথ্য কমিশনের তথ্য প্রাপ্তিবিষয়ক অভিযোগ জমা পড়েনি। কেন পড়েনি? এগুলো আমার প্রশ্ন। অধিকাংশ মানুষ তথ্য কী, তথ্য অধিকার আইন কী, এই আইন কেন প্রয়োজন? এসব বিষয়ে জানে না। জনগণ যদি না-ই জানে যে সংবিধানে কোন কোন নাগরিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যদি তাদের জানানো না হয়, তাদের যদি জানার সুযোগ না থাকে, তাহলে নাগরিক কী করে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানবে? অধিকার কোথায় কখন কাদের দ্বারা কেমন করে লঙ্ঘিত হচ্ছে, মানুষ তা বুঝবে কীভাবে? এর প্রতিকারই বা চাইবে কীভাবে? তাই এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে সর্বপ্রথম জনগণকে সচেতন করতে হবে।

সাধারণ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সমাজের কজন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে? এই আইন পাস হওয়ার এক বছর পরও শিক্ষিত সমাজ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। এমনকি সরকারি কর্মকর্তারাও এই আইন সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না। এমনকি আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও যদি ধরি, এখানেও ২৭ হাজার শিক্ষার্থীদের মধ্যে কজন এই আইন সম্পর্কে জানে? শিক্ষকেরাও বা কজন জানেন? না জানার কারণ, এই আইনের প্রচার কম হয়েছে। যেভাবে প্রচার-প্রচারণার করা উচিত ছিল, আমার মনে হয়, তা সম্ভব হয়নি। লোয়ার লেভেল থেকে আপার লেভেল পর্যন্ত এই আইন সম্পর্কে জানাতে হবে, সচেতন করতে হবে। এজন্য নানা ধরনের প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানও কাজ করা যেতে পারে। আর তথ্য প্রদানকারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো বেশি দক্ষ করে তুলতে হবে। অন্যদিকে সচেতন শিক্ষিত সমাজকে স্বেচ্ছায় এই আইন বাস্তবায়নের জন্য নিজস্ব দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

তার পরও ভাবনা চলে আসে যে এই আইন কতটুকু বাস্তবায়িত হবে? যে দেশে রাষ্ট্র ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ঢুকে পড়েছে সেই দেশে তথ্য অধিকার আইন কেমন করে বাস্তবায়িত হবে? প্রায়ই দেখা যায়, যারা আইন করে তারাই দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে। তারা যে আইন পাস করে তা তারাই মানে না। তারাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করে। তাহলে জনগণ কীভাবে আইন মানবে? যখন রক্ষকই ভক্ষক হয়ে যায়, তখন জনগণ খেই হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রীয় কোনো আইন, নিয়মকানুনের ওপর জনগণ গুরুত্ব দেয় না। আর এ কারণেই জনগণ তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিরুৎসাহিত হয়।

তথ্যের প্রবাহ স্বচ্ছ না হলেই তো দুর্নীতি বেড়ে যায়, শক্তির অপপ্রয়োগ ঘটে। জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতার জায়গাটি দুর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ। সেই জনগণের মাঝে এ বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয়। তাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে সত্যিই কি তারা প্রজাতন্ত্রের মালিক!

নানা দিক থেকে তথ্য অধিকার আইনটি আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে আমরা নানা দিক থেকে উপকৃত হব। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য আমি কাজ করে যাব।

চিত্ত ঘোষ

দিনাজপুর জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সংবাদ

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণের বা জনগণের মধ্যে যারা একটু সচেতন, তাদের ধারণা, এটা সাংবাদিকদের আইন। এটা যে সবার জন্য, সবার তথ্য অধিকার পাওয়ার জন্য করা হয়েছে তা তারা জানে না। তারা ভাবে, আমাদের তথ্য প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া অধিকাংশ জনগণ এই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না। তাদের আমরা জানাতে পারিনি। আমার মনে হয়, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যে ধরনের প্রচারণা করা দরকার ছিল, তা করতে পারি নাই।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, যা সাধারণ মানুষের কাজে লাগে। এবং এই তথ্য যাতে সাধারণ মানুষ কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কারণ এই আইনে বলা হয়েছে যে সবার মৌলিক অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার এই আইনের মাধ্যমে জনগণ অর্জন করতে পারবে। অতএব জনগণের যে তথ্য প্রয়োজন তাকে সেই তথ্য দিতে হবে। এ তথ্য সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন শাখা থেকেও দেয়া যেতে পারে।

আমরা ভালো কোনো কিছু পেলে বা যা সহজে পেয়ে যাই, পাওয়ার পর আর তা যত্নে রাখি না। সংরক্ষণ করা হয় না। এটা আমাদের চিরাচরিত স্বভাব। এই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আমার ধারণা হলো, এটা আমাদের জীবনের একটা বড় প্রয়োজনীয় আইন। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের অধিকারের কথা, অধিকারহীনতার কথা বলতে পারব। এই আইনের মাধ্যমে আমাদের অধিকার আদায় করে নিতে পারব। এই আইনের মাধ্যমে আমি রাষ্ট্রের কাছে তার কাজের জবাবদিহিতা চাইতে পারব। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জানতে পারব। অথচ এই আইন বাস্তবায়নের জন্য আমরা কাজ করছি না। সরকার এই আইন বাস্তবায়নে খুবই আন্তরিক কিন্তু আমরা তাকে সহযোগিতা করছি না।

সকল ক্ষেত্র, সকল কাজে তথ্য প্রয়োজন। তথ্য ছাড়া কোনো কাজ করা যায় না। সঠিক তথ্য না পেলে সঠিক কাজ করা যায় না। ভুল তথ্য দিয়ে সঠিক কাজ করা সম্ভব না। তাই তথ্য সকলের প্রয়োজন। তথ্য যত অবাধ হবে, সমাজ থেকে তত বেশি দুর্নীতি দূর হবে। যেহেতু সকলের তথ্য প্রয়োজন সেহেতু সকলকে তথ্য জানতে হবে এবং তথ্য দিতে হবে। তথ্য না থাকলে তথ্য কর্মকর্তা আমাদেরকে তথ্য দেবেন কী করে? সেই বোধ প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে।

সরকার সাধারণ জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের জন্যই তথ্য অধিকার আইনটি করেছে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে এ আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এই আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হবে।

মো. আব্দুস সালাম

আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটি, রাজশাহী মহানগর

প্রত্যেকটা আইনের একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয় ওই আইন বাস্তবায়ন হলে। আমি জানি না যে বাংলাদেশে কতগুলো আইন আছে। এ সম্পর্কে আমার জ্ঞান একেবারেই কম। আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নেই। তাহলে ওই আইনগুলোর মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়নি। তথ্য অধিকার আইন আমাদের সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন।

সরকারের প্রণীত এই আইনটি নিঃসন্দেহে ভালো। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছি। এবং এই আইন বাস্তবায়নে আমরা শুরু থেকে কাজ করছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না। তাদেরকে জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তারা যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝাতে হবে। সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা যারা এই উদ্যোগের সাথে জড়িত তাদেরও এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যদের জানাতে হবে। জনসম্মুখে এই আইন নিয়ে আসতে হবে। এই আইনের গেজেট সকল প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনের ১০-এর ৯ অনুচ্ছেদ স্ববিরোধী। এটাকে সংশোধন করা উচিত। যদিও এই আইনে প্রতিবন্ধকতা কম, কিন্তু অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য যা যা প্রয়োজন তা নেই। এই আইনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা নেই। অথচ সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা স্থানীয় সরকারের সাথেই বেশি। এই আইন বাস্তবায়নে সবাইকে নামতে হবে। তাহলে আমরা এই আইন দ্বারা সুফল পেতে পারি। এই আইন মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারকে সুরক্ষা করার জন্য করা হয়েছে।

ফেরদৌসী বেগম

নির্বাহী পরিচালক, গ্রামীণ আলো

অধিকাংশ মানুষ তথ্য কী, তথ্য অধিকার আইন কী, এই আইন কেন প্রয়োজন– এসব বিষয়ে জানে না। না জানার নানা কারণ রয়েছে। তার মধ্যে শিক্ষা অন্যতম কারণ। যার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তথ্য পেতে বা সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়। আর অন্যদিকে আমরা জানি, উন্নত দেশগুলোতে তথ্য পেতে বা সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয় না। তথ্যের অবাধ প্রবাহের কারণে সেসব দেশে তথ্য আদান-প্রদান সহজ ও সহায়ক। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে জনগণের উৎসাহ নেই। এর মূল কারণ শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব।

তথ্য অধিকার আইনটি জনগণের মৌলিক অধিকারকে আরো বেশি কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য বা নিশ্চিত করার জন্য করা হয়েছে। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। কিন্তু এ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বলা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্য থেকে দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ না করতে পারলে দেশে কোনো আইনই সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে ভালো করে জানানো এবং তথ্যের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এই আইন বাস্তবায়নে গণমাধ্যম ও তার সাংবাদিকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারকে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোই তথ্য সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। যদি এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্য থেকে দুর্নীতি-লুটপাট অনেকটা বন্ধ করা যাবে।

এ এফ এম আমির উদ্দীন

আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, ইন্টার কো-অপারেশনের লোকাল গভর্ন্যান্স

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার ফলে তথ্য দেয়া ও নেয়ার কাজটি ক্ষেত্রে আর কোনো জটিলতা থাকল না। এই তথ্য অধিকার আইনে কী কী তথ্য আছে এবং তা কী কাজে লাগবে—এ সম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রচার করে সাধারণ জনগণকে জানাতে হবে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য সাংবাদিকদের একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে। স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে এ আইন কী তা জনগণকে বোঝানোর জন্য কাজ করা যেতে পারে। তাহলে তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য গ্রহণকারীর মধ্যে যে ভীতি কাজ করছে তা কেটে যাবে। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকারীকে তথ্য প্রদানে আরো আন্তরিক হতে হবে।

জনগণ কোথায়, কার কাছে এবং কী কী তথ্য পাবে? সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। এবং তাদের জানাতে হবে যে আপনারা এখানে এই তথ্য এবং ওইখানে ওই বিষয়গুলো জানতে পারবেন। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে জনগণের উৎসাহ নেই। বাস্তব অবস্থাজনিত কারণে তথ্য দেয়া এবং নেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য সকলকে মাঠে নেমে কাজ করতে হবে। করণীয় হিসেবে আমি বলব, আমাদের কাজ হলো কাজ শুরু করা।

ফরিদা ইয়াসমিন

সিনিয়র সহকারী কমিশনার, রাজশাহী জেলা

সরকারি কর্মকর্তাদের ভালো করে জানা নেই যে সে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং কী তথ্য দেবেন। প্রথমত, দরকার সরকারি কর্মকর্তাদের এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন। তারপর তাদেরকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের জন্য দিক-নির্দেশিকা তৈরি করে প্রত্যেক তথ্য কর্মকর্তাকে দেয়া দরকার। এই আইন সম্পর্কে শিক্ষিত লোকজনকে আগে সচেতন করা দরকার, তারপর জনগণকে এই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো, জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

এই আইনে প্রতিবন্ধীদের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে। এটা একটা খুব ভালো দিক। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

অনেক তথ্য আছে যা দু-তিন দিনে দেয়া সম্ভব নয়। তথ্য গ্রহণকারী এসব বিষয় বুঝতে চায় না। এমন দেখা গেছে, তথ্য গ্রহণকারী যে তথ্য চাচ্ছেন তা আমাদের কাছে নেই। সংগ্রহ করে দিতে সাত-আট দিন সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু তথ্য গ্রহণকারী সে বিষয়টি বুঝছেন না। বরং তিনি মনে করছেন, আমাদের কাছে ওই তথ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে দিচ্ছি না। আবার অনেক তথ্য আছে সাত দিনেও দেয়া সম্ভব নয়। অথচ আইনে বলা আছে তথ্য প্রদানকারীকে সাত দিনের মধ্যে তথ্য দিতে হবে। এসব বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

ফজলুল হক
সভাপতি, সুপ্র

আমরা লক্ষ করেছি, তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি তথ্য কর্মকর্তা ও সরকারি কর্মকর্তারা গড়িমসি করেন। কেন করেন তা আমার বোধগম্য নয়। কী কারণে করেন তাও জানি না। তাদের কাছে তথ্য থাকলেও প্রায়ই এমনটি করেন। তথ্য না থাকলে আলাদা বিষয়। সে বিষয়ে সরাসরি বলে দিতে পারেন।

তথ্য প্রদান করতে হলে আগে তা সংগ্রহ করতে হবে। গত এক বছরে তথ্য প্রদান ইউনিটে তেমনভাবে তথ্য সংগ্রহ হয়নি। তাহলে তারা কীভাবে জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য দেবেন?

অন্যদিকে জনগণের মধ্য থেকে দু-চারজন তথ্য প্রদান ইউনিটে তথ্য গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছেন। তাহলে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট কী করে জানবে, জনগণের কী তথ্য প্রয়োজন এবং তারা কী কী তথ্য জনগণের জন্য সংগ্রহ করবেন?

আমরা জানি; জ্ঞানই শক্তি। কিন্তু এ জ্ঞান অর্জন করার জন্য প্রতিনিয়ত চর্চা করতে হয়। চর্চা না করে জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। তাই এ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আয়ত্তে না নিতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত সবার চর্চা করা প্রয়োজন। আর তখনই সম্ভব হবে এই আইনের বাস্তবায়ন। অন্যথায় এই আইন কাগজে রয়ে যাবে।

মুহাম্মদ লুৎফুল হক
নির্বাহী পরিচালক (রাজশাহী), ক্যাম্পেন ফর রাইট টু ইনফরমেশন

আমরা এই আইন বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কমবেশি আন্দোলন করেছি। বিশেষ করে, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীসহ সুশীল সমাজ এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অবশেষে ২০০৯ সালে এ আইনটি পেলাম, যেটি কার্যকর করা ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই আইনটি মূলত প্রথম দিকে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু এটি আজ আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন।

কিন্তু এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার গত এক বছরে তেমন গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হননি। আইন পাস হওয়ার অনেক দিন পরে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। তথ্য কমিশন গঠন করার পর কয়েক দফা এর পরিবর্তন করেছেন। সব জেলায় তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে বেশ দেরি হয়েছে। জেলা তথ্য কর্মকর্তাদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য নেই। এই আইনটি বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের প্রচারণা প্রয়োজন ছিল তা সরকার ও তথ্য কমিশন করতে পারেনি। এনজিওরা তথ্য কমিশনে তাদের তথ্য জমা দেয়নি। মাত্র দুই শতাংশ এনজিও তথ্য কমিশনে তাদের তথ্য জমা দিয়েছে। আইনটি সহজ ছিল। এটিকে এখন জটিল করে তোলা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ কিছু দুর্বল দিকও আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ করেছি। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে জনগণের উৎসাহ নেই। বাস্তব অবস্থাজনিত কারণে তথ্য দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য নেয়ার ক্ষেত্রে রেয়াতের তালিকা বড় থাকে। রয়েছে তথ্যের প্রবাহজনিত সমস্যা।

কমিশনারদের পদমর্যাদা কী হবে, এখানে চাকরি করে কী লাভ, আরো কত কী প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। সম্পদের পর্যাপ্ততার অভাব, প্রয়োজনীয় মানবসম্পদের অভাব ও সর্বোপরি উদ্যোগের অভাব রয়েছে। তথ্য প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর অসুবিধা, তথ্য সংগ্রহের অব্যবস্থাপনা, সম্পূরক তথ্য প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা, তৃতীয় পক্ষের কর্তৃক তথ্যের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি।

কমিশনারদের পদমর্যাদা ও হুইসেল ব্লোয়ারস প্রোটেকশন নিয়েও সমস্যা রয়েছে। তবে এগুলো কোনো মারাত্মক সমস্যা নয়। যদি তথ্য কমিশন ও জনগণ এগুলো সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করে তাহলে নিমেষেই এই দুর্বল দিকগুলোর সমাধান সম্ভব।

করণীয় প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি :

১। তথ্যচাহিদা সৃষ্টির জন্য কাজ করা;

২। যে অঞ্চলে যে ভাষা-সংস্কৃতি, সেই অঞ্চলে সে ভাষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে জনগণকে বোঝানো।

৩। প্রচারপত্র (হ্যান্ডবিল) বিলি করা।

৪। পত্রিকা প্রকাশ করা।

৫। প্রশিক্ষণ– সরকারি তথ্য কর্মকর্তাদের ও জনগণকে।

৬। এই আইনের বিধিমালা প্রচার করা।

৭। সংশোধনী প্রচার করা।

৮। এটিকে আরো সহজ করে প্রচার করা।

৯। দলিল সংরক্ষণ করা।

এ কে আজাদ
নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার আগেও আমরা বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য দিতাম। এখনো দিচ্ছি। তবে এখন দেয়ার ক্ষেত্রটা অনেক বেশি সহজ, নিয়মতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক। এই আইন পাস হওয়ার কারণে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আইনের কারণে তথ্যের অবাধ মালিকানাও জনগণের কাছে ন্যস্ত হবে। তথ্য যাবে কৃষক-শ্রমিক-জনতার হাতে, তবেই রাষ্ট্রের মালিক যে জনগণ, সত্যিকার অর্থে সমাজে তখন এ বোধ তৈরি হবে। একজন কৃষকের উন্নত বীজ বা সারের তথ্য, গ্রেপ্তার করতে এলে তার কারণ ও আইনি ধারা জানার কিংবা নির্যাতিত নারীর আইনি সহায়তা পাওয়ার তথ্য– সবই কিন্তু এই তথ্য অধিকার আইনে রয়েছে।

গত এক বছরে এই আইনের তেমন অগ্রগতি হয়নি। এ দেশে আইন তৈরির পর আইনজীবী ছাড়া তা আর ব্যবহার হয় না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আইনপ্রণেতারাও আইন মেনে চলেন না এবং ওই প্রণীত আইনের চর্চা করেন না। এটা আমাদের দেশের একটা বড় সমস্যা।

জনগণ এই আইন সম্পর্কে কোনো কিছুই জানে না। এমনকি শিক্ষিতদের মধ্যে শতকরা দু-একজন এই আইন সম্পর্কে জানেন। এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে সরকার জনগণকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করা, সরকারি তথ্য কর্মকর্তাদের ও জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া, তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের জন্য দিক-নির্দেশিকা তৈরি করে তা প্রত্যেক তথ্য কর্মকর্তাকে দেয়া।

হাসান মিল্লাত

বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সোনালী সংবাদ, রাজশাহী

বাংলাদেশের জনগণই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাহলে সেই ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে : মানুষের কাছে তথ্য সরবরাহ করা, তথ্যের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা, তথ্যের অবাধ মালিকানা জনগণের কাছে ন্যস্ত করা, তথ্যের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতার ক্ষমতায়ন করা এবং তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করে দেয়া।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী

সবার আগে আমরা যারা এই আইনটি নিয়ে কাজ করছি, তাদের এই আইনটি সম্পর্কে ভালো করে জানা দরকার। তারপর দরকার জনগণকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করা। বিশেষ করে, যারা তথ্য কর্মকর্তা বা তথ্য আদান-প্রদানের সাথে যুক্ত, সরকারি কর্মকর্তাকে সক্রিয় করা। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আমাদের এই অবস্থা হলে সাধারণ জনগণের কী জ্ঞান থাকতে পারে? সাধারণ জনগণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কতটা অবহিত এবং কতটুকু জানে?

এই আইন পাস হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর কোনো কাগজ পাইনি। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে, তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এর কোনো দিক-নির্দেশনা আমরা পাইনি। এই আইনের নানা সুফল রয়েছে। ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বক্ষেত্রে এই আইনের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই আইনকে কাজে লাগাতে হলে প্রথম প্রয়োজন তথ্য সংগ্রহ করা। তারপর তা সংরক্ষণ করা। তথ্য সংরক্ষণ করে তা নেটওয়ার্কিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা দরকার।

সময় ও দিন-তারিখ নিয়ে এই আইনে যা বলা হয়েছে তা উপযুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা প্রয়োজন। তথ্য প্রদান করতে হলে আগে তা সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু কারা তথ্য সংগ্রহ করবেন, কীভাবে করবেন, সে বিষয়ে তেমন কিছু বলা হয়নি। এটিরও সংশোধন প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত তথ্য প্রদানের জন্য সরকারি প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

তথ্য যাদের প্রয়োজন তাদের সচেতন করতে হবে। তথ্য তাদের কী সুযোগ-সুবিধা দেবে তা জানাতে হবে। তথ্য কীভাবে তাদের জীবনধারণের জন্য সহায়তা করে, সে বিষয়ে তাদের জানানো দরকার। সরকার সাধারণ জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের জন্যই তথ্য অধিকার আইনটি করেছে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে এ আইনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ বিষয়ে গ্রামের মানুষদের নিয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে। কমিউনিটি সভা করার মাধ্যমেও এই আইন সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে।

হাসিবুর রহমান বিলু

সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার, বগুড়া

তথ্য অধিকার আইন মূলত সাংবাদিক ও গবেষকদের বেশি দরকার। এটি আমাদের কাছে গুরুত্বপুর্ণ। সকল জনগণের তথ্য দরকার। কী তথ্য দরকার তা বুঝে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে এতে কী পরিবর্তন আসবে? সাধারণ মানুষের যে-তথ্য দরকার, তা তারা কীভাবে পাবে? সাধারণ জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। এই তথ্য অধিকার আইনে কী কী তথ্য আছে এবং তা তাদের কী কাজে লাগবে তা জনগণকে জানাতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার প্রায় এক বছর পার হলেও সরকার তেমন অগ্রসর হতে পারেনি। কেন পারেনি, সে ব্যাপারে আমরা কম-বেশি সবাই জানি। সরকার দেশের সব জেলায় এখনো পর্যন্ত তথ্য অফিসার নিয়োগ দিতে পারেনি। তাহলে কীভাবে মানুষ তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে সরকারকে জনগণের পক্ষ থেকে জোরালো চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

ড. অনন্য রায়হান

সবাইকে ধন্যবাদ। খুব সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে। অনেকগুলো প্রশ্ন উঠে এসেছে। অনেক নতুন নতুন তথ্য চলে এসেছে। আজকের এই আলোচনা শুধু আলোচনার জন্য নয়, এটা কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য করা। এই আলোচনার পরে আমরা সবাই ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনার করব।

আজকের আলোচনায় নানা বিষয় উঠে এসেছে। যেমন :

১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ বেড়েছে।

২। দেশের ৮০% মানুষ তথ্যের বাইরে।

৩। ১,৮৭ লাখ মানুষ ফোনের আওতায়।

৪। ৪ হাজার এনজিওর মধ্যে মাত্র ২% এনজিও তথ্য জমা দিয়েছে।

৫। এনজিওগুলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আরো বেশি কাজ করতে হবে।

৬। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের কাজে যুক্ত করতে হবে।

৭। তথ্য অফিসার নিয়োগের ব্যাপারে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

৮। তথ্য আদান-প্রদানের সাথে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তাকে অ্যাকটিভ করা দরকার।

৯। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন।

১০। তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।

১১। সময় ও দিন-তারিখের ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

১৩। তথ্য সংরক্ষণ নেটওয়ার্কিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা।

১৪। যে অঞ্চলে যে ভাষা-সংস্কৃতি, সেই অঞ্চলে সে ভাষা-সংস্কৃতির মাধ্যমে জনগণকে বোঝানো।

১৫। প্রচারপত্র (হ্যান্ডবিল) বিলি করা।

১৬। পত্রিকা প্রকাশ করা।

১৭। প্রশিক্ষণ, সরকারি তথ্য কর্মকর্তাদের ও জনগণকে।

১৮। এই আইনের বিধিমালা প্রচার করা।

১৯। সংশোধনী প্রচার করা।

২০। এটিকে আরো সহজ করে প্রচার করা।

২১। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে জনগণের উৎসাহ নেই।

আজকের আলোচনায় অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে। যেমন :

১। তথ্য কী, তথ্য অধিকার? তথ্য অধিকার আইন কী? কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করব?

২। কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করব?

৩। তথ্য প্রদানকারী ইউনিট কি রাজশাহী বিভাগে থাকবে?

৪। এ বিভাগে এখনো পর্যন্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ হয়নি কেন?

৫। রিট করা, হাইকোর্টে যাওয়া আর্থিকভাবে সম্ভব কি?

৬। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল স্থানীয় পর্যায়ে করা উচিত নয় কি?

৭। কীভাবে তথ্য সংগ্রহ হবে?

৮। এই আইন আদৌ বাস্তবায়ন হবে কি?

৯। প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য পাওয়া যাবে কি?

১০। তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা হচ্ছে না কেন?

১১। তথ্য সংগ্রহের সময় সম্পর্কে এই আইনে সুস্পষ্ট ধারণা নেই কেন?

১২। কেন গত ১ বছরের এ আইনের ৫% কাজও বাস্তবায়িত হলো না?

১৩। জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তা এই আইন সম্পর্কে অবহিত নন কেন?

১৪। নেটওয়ার্কিংয়ের আওতায় তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে না কেন?

১৫। সাধারণ মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না, তাহলে কীভাবে এই আইন বাস্তবায়িত হবে?

কর্তৃপক্ষ কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তা কীভাবে সংরক্ষিত হবে, এ বিষয়ে তথ্য কমিশন কাজ করবে। তথ্য কমিশন লিখিতভাবে ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করবে। তথ্য অধিকার আইন তাদের এ দায়িত্ব দিয়েছে। রিট পিটিশনের দরজা খোলা রাখার জন্য করা হয়েছে। এখানে আদালত বলতে হাইকোর্টকে বোঝানো হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন।

এই আইনের দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রয়োজনে সরকার এ বিষয়ে সংশোধন আনবে। হাইকোর্টে যাওয়া হচ্ছে শেষ পদক্ষেপ, তার আগে তথ্য কমিশন আছে। তথ্য পাওয়া হলো মূল বিষয়। আর আপনার যদি একান্তভাবে প্রয়োজন হয়, তাহলে তথ্য পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে যাবেন। এতটুকু কষ্ট তো আপনাকে করতে হবে। তথ্য প্রদানকারী ইউনিট রাজশাহী বিভাগে রয়েছে; উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে রয়েছে। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করবেন। সরকারের প্রতিটি বিভাগে নিয়োগ দেবে।

সাধারণ মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না। তাদেরকে জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তারা যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝাতে হবে। সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, যারা এই উদ্যোগের সাথে জড়িত তাদেরও এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যদের জানাতে হবে। সাধারণ মানুষকে এ আইন জানানোর জন্য যে যে পদক্ষেপ নেয়া উচিত তা নিতে হবে। সাধারণ মানুষকে জানানোর দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, এ দায়িত্ব আমাদের সবার। বিশেষ করে, এনজিওগুলো সাধারণ মানুষকে জানানোর কাজটি নিতে পারে। মূল দায়িত্ব আমাদের। আমরা চাইলে হবে, না চাইলে হবে না। সব সময়ই অধিকারের সাথে কর্তব্য জড়িত থাকে।

সাধারণ মানুষের জীবনযাপনে, শিক্ষায়, কাজে যে তথ্য দরকার তা সংগ্রহ করা। কিন্তু কোথা থেকে সেই তথ্য সংগ্রহ করা হবে? এসব ব্যাপারে ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে। এই ডাটাবেইজের মাধ্যমে যে তথ্য দরকার তা সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবশ্য অবলম্বন করতে হবে। তথ্য সংগ্রহের এবং প্রদানের জন্য তথ্য কর্মকর্তাকে দক্ষ হতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে, ভুল তথ্য দেয়ার জন্য বা ভুল তথ্য উপস্থাপনের জন্য মারাত্মক সমস্যা পড়তে হয়। এ জন্য ভুল তথ্য উপস্থাপনের জন্য শাস্তির বিধান রাখা উচিত।

এই আইন বাস্তবায়নের জন্য যা যা করণীয়

'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো যে রাষ্ট্র চাচ্ছে, জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্র চাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্র চাচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। রাষ্ট্রের চাওয়া ও আমাদের চাওয়া পূরণের জন্য যে কাজটি প্রয়োজন পড়ে, তা হলো এর যথাযথ বাস্তবায়ন। আর এই আইন বাস্তবায়নের জন্য যা যা করণীয় তা এই মতবিনিময় সভায় চলে এসেছে। সেগুলোর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি।

তথ্য অধিকার আইন কী, কেন, এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব জনগণের কাছে প্রচার করা দরকার। তাদের এই আইন সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সকলকে এ আইন যাতে কার্যকর করা যায় তার জন্য দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। তথ্য কী, এর প্রয়োজনীয়তা কী—এসব বিষয় নিয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, রেডিও-টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা পারে।

ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য গ্রহণ-প্রদান ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে। সেখানে নোটিশ বোর্ডে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে, যাতে গ্রামের মানুষ খুব সহজেই তথ্য পেতে পারে। গ্রামের মানুষদের নিয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে। কমিউনিটি সভা করার মাধ্যমেও এই আইন সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহকে আধুনিকায়ন ও গতিশীল করা। তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করা। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। এই আইন বাস্তবায়নের জন্য বাজেট থাকা দরকার। প্রতিটি অফিস-আদালতে একটি তথ্য ডেস্ক থাকা প্রয়োজন। জেলা বাতায়নে আরো তথ্য দরকার। সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, যারা এই উদ্যোগের সাথে জড়িত, তাদেরও এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যদের জানাতে হবে।

যারা তথ্য দেবেন বা যাদের কাছে আমরা তথ্য পাব, তাদের তথ্য কী, তথ্য অধিকার আইন কী, এ আইনে কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানানো; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা প্রধান কর্তব্য। জনগণের তথ্য দরকার। কী তথ্য দরকার, তা বুঝে তথ্য সংগ্রহ করা উচিত—তথ্য সংগ্রহকে আধুনিকায়ন করা, নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা।

সরকারি কর্মকর্তা, যারা তথ্য দেবেন তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন করা দরকার। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় সংগঠনের সহযোগিতা দরকার। সাংস্কৃতিক প্রচারণার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা, নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান, স্থানীয় পত্রিকা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রধান অতিথি

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখত্, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

আমরা জানি, knowledge is power। কিন্তু এখন information is power। অর্থাৎ তথ্য ছাড়া আমরা অচল। তথ্য ছাড়া এ যুগে আর চলা যায় না। সকল ক্ষেত্র, সকল কাজে তথ্য প্রয়োজন। তথ্য ব্যতীত কোনো কাজ করা যায় না। বর্তমান বিশ্বটা একটা তথ্যপ্রবাহের বিশ্ব। এখানে তথ্যে যে যত বেশি সমৃদ্ধ, সে তত বেশি অগ্রসর।

তথ্য কী, এর প্রয়োজনীয়তা কী—এসব বিষয়ে আমাদের দেশের মানুষ খুব কম জানে। এ সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। দেশ স্বাধীনের পর যেসব আইন প্রণিত হয়েছে, তার মধ্যে তথ্য অধিকার আইন অন্যতম।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমরা খুবই আন্তরিকভাবে সরকারের এ কাজে সহায়তা করছি। আমি জেলা পর্যায়ে যেসব তথ্য প্রয়োজন তা সংগ্রহ করেছি। এসব তথ্য জেলা ওয়েবে রয়েছে। এ জেলাতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলছে। কোনো ব্যক্তি জেলা কার্যালয়ে কোনো তথ্যের জন্য এলে আমরা যতটুকু সম্ভব, তা দিই।

দুর্নীতি রোধে এই আইন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু দুর্নীতি-সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় না। এজন্য তথ্য যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু সরকারি-বেসরকারি নয়, রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে এই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে তথ্য ইউনিট গড়ে তুলতে হবে। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে এই আইন বাস্তবায়নে প্রতিটি জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে নিয়ে কাজ করার।

তথ্য অধিকার আইন পাস করার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি। তারপর এ আইন পাস হয়েছে। সাধারণ জনগণ কিন্তু এই আইন পাসের জন্য আন্দোলন করেনি। কিন্তু তারা এই আইনের সুবিধা নিচ্ছে। কীভাবে নিচ্ছে? সাধারণ জনগণ সরকারের থানা কর্মকর্তাদের কাছে তার

প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ, বুদ্ধি নিচ্ছে। এভাবে তারা তথ্য নিচ্ছে। এ বিষয়টিকে আমরা এই তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারি। এবং তারা যে আরো অনেক তথ্য আমাদের কাছ থেকে পেতে পারে তা তাদেরকে জানাতে হবে। তাদের আমরা বলে দিতে পারি, তোমরা অমুক অমুকের কাছ থেকে এই তথ্যগুলো পাবে এবং এজন্য তোমাকে এই এই বিষয়গুলো করতে হবে। তাহলে দেখা গেল, আমরা তথ্য কর্মকর্তারা, তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য পেলাম এবং তাদেরকেও তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য দিলাম। তথ্য কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক ও যত্নবান হতে হবে।

আমরা যারা সচেতন, তারা কি কোনো তথ্য কর্মকর্তার কাছে তথ্যের জন্য গিয়েছি, কোনো তথ্য চেয়েছি? বা গেলে কজন গিয়েছি? না গিয়ে শুধু সরকার এবং তথ্য কর্মকর্তাকে দোষ দেয়া সমীচীন নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, জনগণ তথ্য দিতে চায় না। সে ক্ষেত্রে তাদের অনেক বোঝাতে হয়। আবার অনেক সময় অনেক তথ্য কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে গড়িমসি করে। তাদের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানানো প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা অভিযোগ জানাই না।

শুধু সরকার নয়, সকল মানুষেরই উচিত এই আইন বাস্তবায়নে কাজ করা। কারণ তথ্য সকলের প্রয়োজন। সরকার জনগণের জন্য এবং তাদের অধিকারের জন্য আইন করেছে। আর এ আইন বাস্তবায়ন জন্য কাজ করবে রাষ্ট্রের জনগণ। কিন্তু আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব পালন করে শুধু সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দিই, তাতে কি কোনো লাভ হবে? সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। এই আইন বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য এই জেলার বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। আমরা সবাই ইতিবাচক মন-মানসিকতা নিয়ে কাজ করে যেতে চাই। কাজের সুফল অবশ্য আমরা অর্জন করতে সক্ষম হব।

হাসিবুর রহমান

তথ্য কী, এর প্রয়োজনীয়তা কী এসব বিষয়ে আমাদের দেশের মানুষ খুব কম জানে। এ সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের জনগণের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হলো তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের অনেকেই আইনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। সে জন্য তাদের সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে সম্পৃক্ত ছিল। আর এই আইন বাস্তবায়নে বহুমাত্রিকভাবে কাজ করছে। সাংবাদিক ও সংবাদপত্র তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে জোরালো ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই আইন কার্যকর করতে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সকলকে এ আইন যাতে কার্যকর করা যায়, তার জন্য নিজ দায়িত্বে এগিয়ে আসতে হবে।

এমআরডিআই এরই মধ্যে খুলনা বিভাগে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। দেশের অন্যান্য বিভাগীয় শহরেও এ ধরনের সভার আয়োজন করা হবে এবং সবশেষে একটি জাতীয় সেমিনারের মাধ্যমে বিভাগীয় সভায় প্রাপ্ত তথ্য ও পরামর্শগুলো সরকারের কাছে তুলে ধরা হবে।

সাংবাদিক ফরিদ হোসেন

তথ্য অধিকার না থাকলে দেশে গণতন্ত্র বিকাশ কখনো সম্ভব নয়। গণতন্ত্র বিকাশের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সব নাগরিকের তথ্য অধিকার। এ ছাড়া মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অধিকার অপরিহার্য। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাস হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এ আইন সম্পর্কে যা জেনেছি তা খুবই সামান্য। সরকার গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকারকে সুসংহত করার জন্য এ আইনটি করেছে। সাধারণ জনগণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না। এই তথ্য অধিকার আইনে কী কী তথ্য আছে এবং তা তাদের কী কাজে লাগবে তা জনগণকে জানাতে হবে। সাধারণ মানুষকে এ আইন জানানোর জন্য যে যে পদক্ষেপ নেয়া উচিত তা নিতে হবে।

সাধারণ মানুষকে জানানোর দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, এ দায়িত্ব আমাদের সকলের। সরকার, এনজিও, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সকলকে এ আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং জানাতে হবে। সকল ক্ষেত্র, সকল কাজে তথ্য প্রয়োজন। সঠিক তথ্য না পেলে সঠিক কাজ করা যায় না। ভুল তথ্য দিয়ে সঠিক কাজ করা সম্ভব নয়।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিত সবার কাছ থেকে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়

ক. আগামী এক বছর পর তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা পরিমাপের জন্য কী মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে?

- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এক বছরে কতজন আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং কতটি আবেদন গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছে, সেটাই হবে অগ্রগতির মাপকাঠি।
- তথ্য প্রদানকারী ও তথ্য গ্রহণকারীদের মধ্যে কতটুকু আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তা পরখ করে দিতে হবে।
- এর মাপকাঠি এভাবে নির্ণয় করা যাবে, তথ্য প্রদানকারীর কাছে কতগুলো তথ্য গ্রহণকারীর আবেদন জমা পড়েছে। তা ছাড়াও নির্ণয় করা যাবে, তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে বা পত্রিকায় সংবাদ হচ্ছে।
- তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গেলে কী পরিমাণ ফর্মাল আবেদন জমা পড়েছে, তা দিয়ে বর্ণিত আইনের বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানা যেতে পারে।
- প্রতিটি বছর শেষে নির্ধারিত সময়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের খতিয়ান নিরূপণ করে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- প্রয়োজনে প্রতি মাসে ফলোআপ করে কার্যপ্রণালি নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- জনগণের জীবনের মান কতটা উন্নত হলো।
- দুর্নীতি কতটা কমল।
- মৌলিক অধিকার কতটুকু নিশ্চিত হলো এবং গণতন্ত্র কতটুকু নিশ্চিত হলো।
- তথ্য কমিশনে কতগুলো অভিযোগ জমা পড়েছে তা দেখা।

- জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কি কি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাজের মাঝে তথ্য অধিকারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ক্ষমতা বিচার করা যায়।
- তথ্য সংরক্ষণ, প্রদান, সরবরাহ আবেদন বিবেচনা করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ণয় করা যায়।

- কতগুলো দপ্তরে ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, যেটা থেকে জানা যাবে।
- তথ্য নিতে গিয়ে তথ্য গ্রহণকারী বেশি হয়রানি হচ্ছেন কি না, তা দেখা।
- তথ্য গ্রহণ বিষয়ে সংবাদপত্রের খবর থেকে।
- তথ্য সংগ্রহ করে কতজন উপকৃত হয়েছে এমন চিত্র থেকে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সাক্ষাৎকার/এফজিডি/মতামত জরিপ।
- বেসরকারি সংস্থার মতামত।
- জেলাভিত্তিক ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার অগ্রগতি মাপা যাবে।
- জরিপকার্য পরিচালনা : সাংবাদিক-গবেষক-শিক্ষার্থী-এনজিও প্রতিনিধি-সরকারি দপ্তর।
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতিতে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় দুর্নীতির পরিবেশ বিরাজ করছে। জনগণকে সচেতন করা গেলে আমার মনে হয় আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে, তা নির্ণয়ে পৃথক কোনো মাপকাঠির প্রয়োজন পড়বে না।
- বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের ওপর জরিপ চালানো। এ ক্ষেত্রে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শ্রেণীবিন্যাসে নিয়ে আসা যেতে পারে।
- তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে জরিপ চালানো যেতে পারে।
- তথ্য ভোগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রশ্নের মধ্যে বোঝা যাবে কতটা অগ্রগতি হয়েছে।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের মানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দক্ষতা বিচার করা যায়।
- তথ্য সংরক্ষণ, প্রদান, সরবরাহ আবেদন বিবেচনা করে বাস্তবায়ন-অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়।
- সরকারিভাবে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। এখনো অনেক জড়তা রয়েছে। তথ্য আইনের বিষয়ে চর্চা থাকতে হবে।
- আপডেট ওয়েবসাইট
- দপ্তর/অধিদপ্তরে কতসংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে।
- একটি জনগোষ্ঠীকে বেছে নিয়ে তাদের ওপর জরিপ চালিয়ে প্রাথমিক তথ্য নেয়া এবং এক বছর পর তুলনা করা। এ ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বিদ্যালয় বা মহল্লা বেছে নেয়া যেতে পারে।
- যদি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত ৭০% ভাগ ব্যক্তি এ আইন সম্পর্কে অবহিত আছেন।
- যদি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত ৩০% ব্যক্তি এ আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখবেন।
- যদি স্থানীয় ৬০% সাংবাদিক এ আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখবেন।
- সরকারি বা বেসরকারি অফিসে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে কি না।
- কতসংখ্যক তথ্য কতজনকে অফিস থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- আইন সম্পর্কে কতজন অবহিত হয়েছেন, তার সংখ্যা দ্বারা (অগ্রগতি), একটি দপ্তরে কতজন তথ্য চাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন বা তথ্য সরবরাহ করেছেন তার সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত প্রতিবেদন দ্বারা।
- সরকারি অ্যাসেসমেন্ট থাকতে হবে।
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে থেকে কাজের অগ্রগতির ডাটা নেয়া যায়।
- প্রতিবছরে জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক রিপোর্ট প্রদান করা।
- ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নসংক্রান্ত পরিসংখ্যান জনগণের নিকট হাজির করতে হবে। এক বছরে কোন কোন প্রতিষ্ঠান কতজন নাগরিককে তথ্য প্রদান করেছে তার পরিসংখ্যান তথ্য কমিশনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

- বছরে তথ্য প্রদান না করার জন্য কতজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি হয়েছে, তার পরিসংখ্যান জাতির সামনে তুলে ধরা।
- সেরা তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতির সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে সম্মানিত করা।
- তথ্য জানার জন্য এক বছরে কতগুলো আবেদনপত্র জমা পড়েছে তার ভিত্তিতে পরিমাপ করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমেও পরিমাপ করা যেতে পারে।

খ. রাজশাহী বিভাগের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

- তথ্য চাইবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে ভীতি কাজ করে।
- তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রস্তুত নেই।
- তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এখনো সব জায়গায় নির্বাচিত হননি।
- নাগরিকগণ এখনো আইনটি জানে না।
- দায়িত্বশীলদের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা।
- GO, NGO-এর তথ্য সংরক্ষণ করা এবং চাহিদামতো তথ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা গড়ে তোলা।
- এই আইনের সাথে দ্বান্দ্বিক আইনগুলোকে বাতিল করা বা সমন্বয় করা।
- আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এখনো কোনো প্রতিবন্ধকতা আসেনি। সে কারণে আমার মনে হয় 'চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা' শব্দ দুটি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
- তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ না করায় তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি না থাকায় আবেদনকারী হয়রানির শিকার হবেন।
- আইন সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন।
- নিজ প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে ভেবে তথ্য প্রদান
- তথ্য প্রদানে অর্থের ব্যাপার জড়িত থাকলে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা দুর্নীতিপরায়ণ হতে পারেন।
- তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্মকর্তা নিয়োগ না হওয়া (প্রায় দপ্তর)।
- আইনের দুর্বল দিক (যেমন, গ্রাম পর্যায়ে কর্মরত GO, NGO প্রতিষ্ঠানের কাজ অন্তর্ভুক্ত না করা। (ইউনিয়ন পরিষদ, কৃষি, স্বাস্থ্য বিভাগ, ভূমি তহসিল অফিস)
- তথ্য অধিকার আইন এ সম্পর্কে জনগণ না জানার কারণে সঠিক তথ্য দেবে না।

- তথ্য সংরক্ষণ, আইনের প্রচার-বিজ্ঞাপন, তথ্য প্রদান।
- তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের জনবলের অপ্রতুলতা।
- বাজেট বরাদ্দ না থাকা।
- তথ্য সম্পর্কে আবেদনকারীদের অজ্ঞতা।
- প্রযুক্তির অপ্রতুলতা।

- সঠিক তথ্য দিলে যদি আইনি ঝামেলা হয় সেজন্য তথ্য দেবে না।
- জনগণ সহজে তথ্য দেবে না, বিরক্ত হবে।
- তথ্য প্রদান ও গ্রহণে অনাগ্রহ।
- তথ্য সংরক্ষণে প্রযুক্তির অভাব।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আইন ও দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা।
- আমলাতান্ত্রিকতা।
- তথ্য প্রদানকারীদের তথ্য প্রদানে অনাগ্রহ/অনিচ্ছা।
- তথ্য চাহিদাকারী ও তথ্য প্রদানকারীদের তথ্য অধিকার।
- আইন সম্পর্কে জানার/জ্ঞানের স্বল্পতা।
- সরকারের এই আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের ঔপনিবেশিক ও অনুদার মনোভাব 'তথ্য অধিকার আইন' বাস্তবায়নের পথে বাধা বলে মনে হয়। এটা শুধু রাজশাহী বিভাগের জন্যই নয়, সারা দেশের জন্যই একটা চ্যালেঞ্জ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি এ কথা বলছি। কয়েক মাস আগে আর্টিক্যাল-১৯-এর উদ্যোগে সুপ্র রাজশাহী জেলা কমিটি একটি উপজেলায় সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সে সভায় সরকারি কর্মকর্তাদের মনোভাব খুব একটা ইতিবাচক মনে হয়নি। একজন কর্মকর্তা তো বলেই বসলেন, 'তথ্য দিয়ে আমার কী লাভ? সরকারি কর্মকর্তাদের এই মনোভাব পরিবর্তন করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
- আমজনতার মাঝে শিক্ষার অভাব এবং অসচেতনতা 'তথ্য অধিকার আইন' বাস্তবায়নের অন্যতম একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- সরাসরি আদালতের আশ্রয় গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।
- জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- কর্তাব্যক্তিদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন।
- তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে, বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তাদের পুরোনো ধ্যানধারণা পোষণকারী মনোভাব পরিহার করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিছুই জানে না।
- 'অবাধ তথ্য'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পরিষ্কার বা অস্পষ্টতা রয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে।
- স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন হতে পারে।
- সকল সেবামূলক অফিস, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ইত্যাদিকে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতে হবে। এ ছাড়া সাধারণ জনগণের মাঝে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
- বাজেট বরাদ্দ না থাকা।
- তথ্য সম্পর্কে আবেদনকারীদের অজ্ঞতা।
- প্রযুক্তির অপ্রতুলতা।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য প্রদান ইউনিট প্রতিষ্ঠা।
- প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ।
- তথ্য আদান-প্রদানের জন্য আধুনিক সরঞ্জামাদির ব্যবহার।
- তথ্য অধিকার আইন যথাযথ প্রয়োগ করা।
- সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতাকে এ আইনের বিষয়ে সচেতন করা।
- প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত সরবরাহের ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

- জনগণকে আরো সচেতন করতে হবে।
- প্রতিটি দপ্তরে তথ্য Update ও সংরক্ষণ।
- সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আরো সচেতন এবং দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা
- সাধারণ জনসাধারণের তথ্য তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনমূলক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত নয়।
- দপ্তর/প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা।
- তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান।
- সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতোই তাদেরকে সচেতন করতে হবে।
- আইন সম্পর্কে সবার স্বচ্ছ ধারণা না থাকা।
- পূর্বের ধ্যানধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস।
- সরকারি বা বেসরকারি অফিসসমূহে আমলাতান্ত্রিক সংরক্ষণশীল মানসিকতা।

গ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার? সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

- সরকারের প্রতিটি বিভাগকে তথ্য প্রদানে ভূমিকা রাখা দরকার।
- আমার প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতায় ভূমিকা রাখতে পারে।
- আইন কার্যকর করার জন্য তথ্য কমিশনের সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ।
- তৃণমূল মানুষকে সচেতন করা, সংগঠিত করা এবং স্থানীয় সরকারের সাথে সম্পৃক্ত করা।
- এনজিও, মানবাধিকার সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা।
- সচেতনতা সৃষ্টিতে সংবাদপত্র তার সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে কাজ করেছে।
- আইনটি সম্পর্কে প্রথমত অবহিত করতে হবে সকল পর্যায়ের জনগণকে/কর্মকর্তাকে/প্রতিষ্ঠানকে।
- আমার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : ইউনিয়ন পরিষদবর্গ ও গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহায়তায় দুটি প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে, যার বাস্তবায়ন অচিরেই শুরু হবে।
- তৃনমূল পর্যায় থেকে তথ্য সংরক্ষণে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করা, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের এই প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সচেতনতা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পরিচালনা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে শুরু করা দরকার।
- আমার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা হচ্ছে একজন তথ্য প্রদানকারী থাকতে হবে।
- মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে।
- সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে কাজ শুরু করা দরকার।
- আমার প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ/সরবরাহ করে অন্যদের উৎসাহিত করে তুলতে পারি।
- তথ্য অধিকার আইনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার।
- প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকারী এ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

- কৃষি বিভাগ (সরকারি অনুদান, ভর্তুকি (সার-বীজ) যাতে সঠিকভাবে প্রকৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়।
- স্বাস্থ্য বিভাগ ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত সরকারি, বেসরকারি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ।
- টিআর, গ্রাম-অবকাঠামো নির্মাণ (এলজিইডি), পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্মাণকাজ।
- এনজিও, যারা ঋণের কারবার করে, তাদের ভোক্তা অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে।
- পাঠ্যপুস্তকে তথ্য অধিকার আইন সম্পৃক্ত করা।
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে এ সম্পর্কে অবহিত করা।
- সকল দপ্তরের chart of duties সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা।
- প্রতিটা অফিস বা প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ সম্পন্নকরণ।
- সিটিজেন চার্টার বা অফিস-সংশ্লিষ্ট তথ্যপত্র প্রণয়ন করা।
- টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাকের পরামর্শ ও তথ্য ডেস্ক আছে। সনাকের যুবগঠন (YES)-এর মাধ্যমে তথ্যপত্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়। ইতিমধ্যে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী সিটি করপোরেশন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বোয়ালিয়া ভূমি অফিসের তথ্যপত্র তৈরি করে কয়েক হাজার জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- জনগণকে সচেতন করতে হবে।
- সরকারকে সচেতন করতে হবে। বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।
- তথ্যপ্রবাহের যন্ত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করতে, জনসম্পদ বাড়াতে হবে। নির্ভয়ে তথ্য চাওয়া অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, বিশুদ্ধ খাদ্য ও সংক্রামক রোগ ও ইপিআই সম্পর্কে জনগণকে জ্ঞানদান করতে পারি।
- কী ধরনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা জনগণকে পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরা।
- নিজ নিজ সংস্থার তথ্য সঠিকভাবে প্রণয়ন করে তা প্রচারে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত বা সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত।
- প্রতিষ্ঠান এটি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণসহ সহযোগিতায় ভূমিকা রাখা।
- গণমাধ্যম থেকে হওয়া উচিত এবং তা আঞ্চলিক দৈনিকের পাশাপাশি রেডিও টেলিভিশনকে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

- আমরা সাধারণত মনে করে থাকি যে-কোন কাজ তৃণমূল থেকেই শুরু হওয়া ভাল, কিন্তু যেহেতু শিক্ষা এবং সচেতনতার সম্পৃক্ততা এক্ষেত্রে জরুরী তাই একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে এ কাজ শুরু করা যৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না।
- অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং সচেতন সমাজকে একত্রিত করে সেখান থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক [illegible] সক্ষম হলে পরবর্তীতে
- তৃণমূল পর্যায়ে এ কাজের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।
- রাজশাহীতে আমরা (সুপ্র, রাজশাহী জেলা কমিটি) উপর্যুক্ত লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে থাকি।

- রাজশাহী অঞ্চলের প্রিয় গম্ভীরা গানের মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা (জনগণকে)।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট আপডেট করা।
- দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার দপ্তরে টাঙানো।
- আমার নিজের প্রতিষ্ঠান এখন থেকে সংস্থার গঠন, কাঠামো, দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড, চুক্তি, নকশা, মানচিত্র, বিভিন্ন দলিল, হিসাব বিবরণী, প্রতিবেদন, নীতিমালাসহ সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য গ্রহণকারীকে প্রদান করার ভূমিকা পালন করবে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা যেন এমন হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- প্রতিটি সংস্থার তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইট খোলা।
- তথ্য অফিসারের দক্ষতা বাড়ানো।
- জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা, মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে বেশি বেশি কর্মশালায় আয়োজন করা প্রয়োজন।
- আমরা যারা মিডিয়া কর্মী তারা এসব বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করে ভূমিকা রাখতে পারি।
- তৃণমূল পর্যায়, সরকারিভাবে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করা দরকার।
- তথ্য যে জায়গাতে বা অফিসে আছে সেই জায়গা হতে কাজ শুরু করা দরকার।
- তথ্যের ভান্ডার যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বসে আছে, তাকে সচেতন ও সৎ মনের করে গড়ে তুলতে হবে।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত ও এনজিও থেকে শুরু করা দরকার। আমি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। সেই প্রতিষ্ঠানে জনসংযোগ দপ্তরের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ করে তা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করা উচিত। এর মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।
- আমরা সাধারণত মনে করে থাকি, যেকোনো কাজ তৃণমূল থেকেই শুরু হওয়া ভালো, কিন্তু যেহেতু শিক্ষা এবং সচেতনতায় সম্পৃক্ততা এ ক্ষেত্রে জরুরি, তাই একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে এ কাজ শুরু করা যৌক্তিক হবে বলে মনে হয় না। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং সচেতন সমাজকে একত্রিত করে সেখান থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আশাপ্রদ ফল লাভে সক্ষম হলে পরবর্তী সময়ে তৃনমূল পর্যায়ে এ কাজের ক্রমবিস্তার ঘটাতে হবে।

ঘ. এই বিভাগে কী ধরনের কার্যক্রম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে?

- নাগরিক উদ্যোগ তৈরি করা।
- তথ্য কমিশনের নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা রাখা।
- সামাজিক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও তৃণমূল মানুষকে সচেতন করা।
- সরকারি-বেসরকারি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন করা– জেলা পর্যায়ে।
- প্রকৃতপক্ষে তথ্য না পাওয়ার বা না চাওয়ার ব্যাপারটি দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আমাদের গা-সহা হয়ে গেছে। এ কারণে কেউ তথ্য না দিতে চাইলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ অবাক হয় না। সর্বাগ্রে জনগণকে জানাতে হবে তথ্য পাওয়ার বা চাওয়া তার নাগরিক অধিকার।
- সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ আবশ্যক।

- এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করে কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক এর অগ্রগতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে হবে।
- যেসব কর্মকর্তার মনে এখনো গোপনীয়তা রক্ষার অনুদার মনোভাব কাজ করছে, তাদের এ বিষয়টি বোঝাতে হবে যে, যেকোনো আইন পাস করা হয় দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য, তথ্য অধিকার আইনও সে উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছে। সুতরাং, দেশ ও জাতি কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থেই গোপনীয়তার অনুদার মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে।
- গ্রাম-গঞ্জের জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করতে সরকারিভাবে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে প্রচার চালাতে হবে।
- গম্ভীরাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিষয়টি আমজনতার মর্মমূলে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য অধিকার সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার।
- সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করা।
- তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সবার জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় সহজে প্রবেশের অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা।
- তথ্য অধিকার আইন যাতে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ বাস্তবায়ন করতে পারেন, তার জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সাধারণ জনগণ যদি জানে, কোন তথ্য তার পাওয়ার অধিকার এবং কোথায় গেলে পাওয়া যাবে; সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি সংগঠনে তথ্য প্রদানের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।
- তথ্য প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে জনবল ও প্রযুক্তি দিয়ে সহায়তা করা।
- এ বিষয়ে বাজেট বরাদ্দের জন্য সরকারকে লেখা।
- জেলার প্রান্তিক স্তরে সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।
- আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উভয় সংগঠনকে সহায়কের ভূমিকা রাখতে হবে।
- সকল অফিসে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়ার বিষয়ে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রিতা কালক্ষেপণ কমিয়ে আনতে হবে।
- প্রতিটি কর্মসূচির তথ্য বিলবোর্ডের মাধ্যমে লোকালয়ে স্থাপন করতে হবে।
- আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- প্রতিটি সংস্থার (সরকারি-বেসরকারি) উপকারভোগীদের ধারণা দেওয়া।
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়।
- সুশীল সমাজ, সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়।
- তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- বিভাগ/জেলা পর্যায়ে সমন্বয় করে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে সম্যক ধারণা দেয়া।

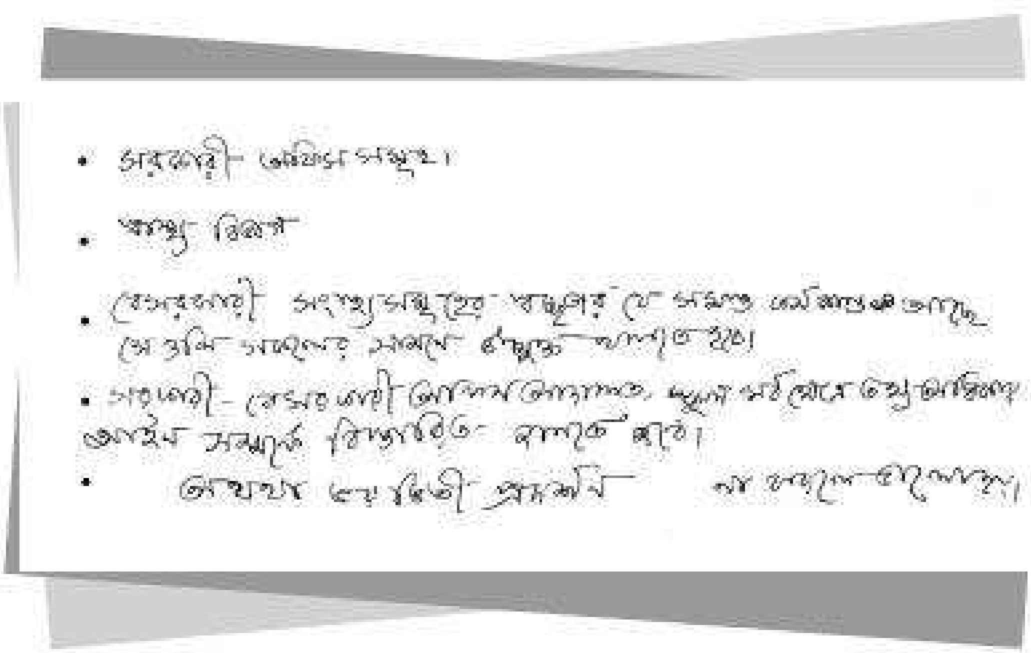

- হাট-বাজারগুলোতে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রচার কমিউনিটি রেডিও ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা।
- সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ সম্পর্কে আলোচনা সভা করা।
- লগবহি, অঙ্কিত চিত্র, আলোকচিত্র মাইক্রোফিল বই আকারে তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- সীমিত মূল্যে তথ্যের প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে এই আইনের আওতায় আনতে হবে এবং ইন্টারনেটের আওতায় আনতে হবে।
- সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে এই তথ্য প্রদানে আরো সক্রিয় করতে হবে।
- আইন সম্পর্কে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রচারণা।
- স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের প্রকৃত actor সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে।
- সরকারি তথ্য অফিস থেকে সরকারি তথ্যপত্র প্রস্তুত করা।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য যেসব এনজিও কাজ করছে (যেমন এমআরডিআই) সেসব প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন তথ্য জনগণকে অবহিত করতে হবে।
- প্রতিবছর প্রতি জেলায় তথ্য মেলার আয়োজন করা।
- তৃণমূল পর্যায় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ে তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করতে হবে।
- একই শ্রেণীর দপ্তরের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।
- গণমাধ্যমে বেশি করে এই আইন সম্পর্কে জানাতে হবে।
- মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।
- তথ্য নিয়ে তা যাতে কোনো খারাপ কাজে ব্যবহার করা না হয়, তার নিশ্চয়তা প্রদান।
- আইন সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীকে আইন সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য কর্মসূচি প্রচার, প্রচারণা উদ্বুদ্ধকরণ।
- সরকারি অফিস ও এনজিও-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রতিবেদন (ওয়েব) তৈরি করে রাখা।
- তথ্য প্রদানকারী ও তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আন্ত-সম্পর্ক গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা। পারস্পারিক সম্মানবোধ সৃষ্টি (হেয় করার মানসিকতা পরিহার করা)।
- বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতার যেসব কর্মকাণ্ড আছে সেগুলি সবার সামনে উন্মুক্ত থাকতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত-স্কুল সর্বক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।
- তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সিভিল সোসাইটির মধ্যে আইন সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা।
- বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও অ্যাডভোকেসি সভা করে জনগণের মাধ্যমে জনগণের তথ্যদাবি-সংক্রান্ত অধিকার-সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য প্রদানের জন্য ও তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।
- সরকারি কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্কিং গড়ে তুলতে হবে।
- বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা/মতবিনিময় সভার মাধ্যমে তথ্য প্রদানসংক্রান্ত মানসিক ভয়ভীতি দূরীকরণের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ আদান-প্রদান তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
- তথ্য অধিকার আইন কী জন্য, কেন, এর প্রয়োজন কী– তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে।
- এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে যৌথ বা একক উদ্বুদ্ধকরণ সভা-কর্মশালা করা যেতে পারে।

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগীয় আলোচনা

৩১ জুলাই ২০১০, হোটেল আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

সঞ্চালক	:	ড. অনন্য রায়হান নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	:	তানজিব-উল আলম অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট
প্রধান অতিথি	:	এ বি এম আজাদ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম*

*জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহম্মদের অনুপস্থিতিতে (তার শ্বশুর মারা যান) উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম আজাদ

এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক

হাসিবুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তব্য

এমআরডিআই মূলত কাজ করে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের মান উন্নয়নে। এর বাইরে এমআরডিআই দুটি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করে। তার একটি হলো তথ্য অধিকার আইন নিয়ে। কীভাবে এই আইন জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায়, কীভাবে এ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা যায়, কীভাবে এই আইন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করা যায়, কোথায় এর সীমাবদ্ধতা, এবং এই আইন বাস্তবায়নে কোথায় কী ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, সেসব বিষয় নিয়ে এমআরডিআই কাজ করে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হলো, তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের অনেকেই আইনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। সেজন্য তাদেরকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এমআরডিআই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে কাজ করে আসছে। আর এখন এই আইন বাস্তবায়নে বহুমাত্রিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আরেকটি জায়গায় এমআরডিআই অ্যাডভোকেসি করে, তা হলো : ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে।

আমরা তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করছি। আমরা প্রতিটি বিভাগে মতবিনিময় সভা করব। মতবিনিময়ের পর আমরা বিভাগীয় পর্যায়ের মতামতগুলো নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভার আয়োজন করব। এরপর প্রাপ্ত সুপারিশমালা সরকারকে উপস্থাপন করা হবে। এতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কোন বিভাগে কী সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ে উল্লেখ থাকবে। এ আইন বাস্তবায়নে কোন কাজ সরকারকে, এনজিওগুলোকে বা আমরা যারা কাজ করছি তাদের নিতে হবে বা করতে হবে, সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব তৈরি করে সরকার ও এনজিওগুলোকে দেব।

'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহম্মদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর পক্ষ থেকে উপস্থিত আছেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম আজাদ।

সঞ্চালক

ড. অনন্য রায়হান

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এ ক্ষেত্রে আমাদের কী ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে, আমরা কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এ আইন প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন? মানবাধিকারের ক্ষেত্রে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই আইনের গুরুত্ব কী– এসব বিষয় নিয়ে আমরা এই 'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' শীর্ষক এ মতবিনিময় সভা করছি। এই আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ চট্টগ্রামে মোকাবিলা করতে হবে, এ ক্ষেত্রে আমাদের কী ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে– এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এই আইনের যে প্রয়োজন রয়েছে তা এই আইনের সঠিক ব্যবহার করে বুঝতে পারব এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারব। এসব বিষয় নিয়ে আজকের এ উদ্যোগ।

এই আইনের উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন। আর জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন করতে হলে তথ্য দরকার। তথ্য ছাড়া জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন সম্ভব না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে তথ্য উন্মুক্ত করার। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ আইন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকারসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক

তানজিব-উল আলম

'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এ মতবিনিময় সভায় আমরা মূলত তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করব। এই বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। একটা হচ্ছে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে এবং কতটুকু বাস্তবায়নের সম্ভাবনা আছে এবং বাস্তবায়ন করতে হলে কী কী করণীয়। তথ্য কীভাবে আমাদের ব্যক্তিজীবনে, নাগরিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে– এই বিষয়ও আজকের আলোচনায় আসবে।

আপনারা দেখেছেন যে, আমাদের সংবিধান নিয়ে নানা আলোচনা হচ্ছে। পঞ্চম সংশোধনী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বাতিল বলে রায় প্রদান করেছে। কেউ যদি এই রায়টা পড়ে থাকেন, আপনারা দেখবেন যে, বলা হয়েছে : প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সংবিধানের মূল ভিত্তি ৭ নং অনুচ্ছেদে (১) বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতা জনগণের। সেই জনগণের ক্ষমতাই প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ব্যবহার করে। জনগণই রাষ্ট্রপরিচালকদের ক্ষমতা ব্যবহার করা ক্ষমতা দিয়েছে। জনগণই তাদের নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টে পাঠিয়েছে। একটা রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। জনগণ তাদের ক্ষমতা দিয়েছে, সেটাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার জন্য, অপব্যবহার করার জন্য নয়।

সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার থাকবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। জনগণ তাদের ক্ষমতা ও অধিকার বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচনের কোনো মানে থাকে না। এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনগণের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হলে তাদেরকে অবশ্য তথ্য জানতে হবে। সে যে প্রার্থীকে বা যাকে নির্বাচিত করবে তার সম্পর্কে তথ্য জানতে হবে। তাদেরকে আমরা যে নির্বাচিত করব, কিসের ভিত্তিতে করব? সেসব বিষয়ে না জানলে ওই নির্বাচনের কোনো মানে থাকে না। তাতে সংবিধান লঙ্ঘন করা হয়। কেননা রাষ্ট্রপরিচালনায় যারা যাবে তাদের ওপর নির্ভর করেই জনগণের ক্ষমতা ব্যবহার হবে। কিন্তু জনগণ যদি প্রতিনিধি নির্বাচিত করার আগে তাদের সম্পর্কে তথ্য না জানে, তাহলে তারা সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে না। আর সঠিক প্রতিনিধি নির্বাচিত না হলে দেশের ও দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না।

জনগণই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাহলে সেই ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় পড়ে তা হচ্ছে মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানো। তথ্য ছাড়া মানুষ যে সকল ক্ষমতার অধিকারী, তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই কারণেই তথ্য অধিকার আইন, যতগুলো আইন আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন হিসেবে একে গণ্য করা হচ্ছে। এই তথ্য অধিকার আইনটি পৃথিবীতে প্রায় ৪৫টিরও বেশি দেশে কার্যকর রয়েছে। এবং ৮০টিরও বেশি দেশে এই আইন পাস হয়েছে।

সবগুলো দেশে যে ধারণার থেকে তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছে, সেটা হলো যে মানুষের ক্ষমতা যদি তাদেরকে প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে তথ্য তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আপনারা জানেন যে আমরা কাকে জ্ঞানী বলি? যার কাছে সকল তথ্য আছে বা সে বিভিন্ন বিষয়ে জানে। কারণ তার কাছে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে।

মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য কী কারণে? তা হলো জ্ঞান। এই জ্ঞানের ভিত্তি হলো তথ্য। তথ্য ছাড়া আপনি কখনো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন না। আপনি বা আমি বা আমরা কাকে বিশেষজ্ঞ বলি? যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে বা নির্দিষ্ট বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানে, আমরা তাকে বিশেষজ্ঞ বলি। কারণ ওই বিষয় সম্পর্কে তার কাছে বেশি তথ্য রয়েছে। ধরুন, একজন ডাক্তার, তিনি যেকোনো রোগ সম্পর্কে আপনার-আমার বা সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি জানেন। কারণ তার কাছে রোগ বিষয়ে বেশি তথ্য আছে। তিনি রোগের নানা ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ জানেন, যা আমরা জানি না।

আমরা হয়তো এখানে বিভিন্ন আইন সম্পর্কে অনেকে জানি, কিন্তু একজন আইনজীবী আমাদের চেয়ে বেশি জানেন। কারণ তার কাছে আইন সম্পর্কে বেশি তথ্য রয়েছে। তাই যিনি সবচেয়ে বেশি একটা বিষয়ে তথ্য জানেন, আমরা তাকে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলি। যা আমরা জানি না, তিনি জানেন।

সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে জনগণের পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় যে জনগণ পর্যাপ্ত তথ্যের অধিকারী। চিন্তাশক্তি, স্বাধীনতা, নীতিচেতনা এবং বাকশক্তি আমাদের সংবিধানের একটি মৌলিক অধিকার এবং এই আইন এটি নিশ্চিত করে। এটা মৌলিক অধিকারের অংশ। মৌলিক অধিকারের আরেকটা রূপ হচ্ছে তথ্য। সংবিধানে বলা আছে, এমন কোনো একটা আইন যদি বাংলাদেশে তৈরি হয়, যেটা মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার পরিপন্থী, তাহলে সে আইনটা অবৈধ হবে।

বর্তমানে আপনারা তথ্য ছাড়া কোনো চিন্তা করতে পারবেন না। চিন্তা করতে গেলেও আপনাকে তথ্য জানতে হবে। যদি আপনাকে বলা হয় আপনি মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনার যদি মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে তথ্য জানা থাকে, তাহলে চিন্তা করতে পারবেন। না থাকলে পারবেন না।

যেমন ধরুন, আমরা হিব্রু কথা বলতে পারি না। কেন পারি না? কারণটা হলো হিব্রু ভাষার তথ্য জানি না। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় পারি। কেন পারি? কারণ এই ভাষার তথ্য জানি। তাহলে ভেবে দেখুন, তথ্য আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের কারণেই এই আইনটা করা হয়েছে।

তার মানে হচ্ছে, মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য তথ্যের স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই আইনটি পাসের আগে আমাদের সে স্বীকৃতি ছিল না। আগে যেটা ছিল—একটা পরোক্ষ স্বীকৃতি। সেখানে কাউকে বা কোনো সংস্থাকে কোনো বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করা যেত না। এখন সেটা আইনে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে আপনি বা আমরা আমাদের কোনো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না হলে তার জবাবদিহিতা চাইতে পারব। এবং রাষ্ট্র এ ব্যাপারে আইনগতভাবেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। প্রথমবারেরে মতো ২০০৮ সালে এই আইনটা অধ্যাদেশ আকারে আসে এবং ২০০৯ সালে সংসদে এটি পাস হয়। যার ফলে মানুষের যে তথ্য অধিকার সেটা আইনগতভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ভারতে আমরা দেখেছি, এই তথ্য অধিকার আইনের ফলে অনেকগুলো বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বা স্থানীয় সরকার-কাঠামোর মধ্যে এই আইনের প্রয়োগের ফলে জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসনের জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের জবাবদিহিতা স্পষ্ট হয়েছে এবং জনগণের ক্ষমতায়ন আগের চেয়ে অনেক গুণে বেড়েছে। গ্রাম ও গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত কাজ স্থানীয় সরকার করছে তার জবাবদিহিতার জায়গা এই আইনটা থাকার কারণে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এই আইনটার কারণে কৃষকরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জানতে পারছে যে কেন্দ্রীয় সরকার কোন কোন কৃষকের জন্য কী কী বরাদ্দ দিয়েছে। আবার স্থানীয় প্রশাসন এই আইনটার কারণে কৃষককে তাদের বরাদ্দের কথা জানাতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতে এই আইনটা কেন হলো? ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশের জনগণ স্থানীয় সরকার-কাঠামোর কাছে তারা নানা কাজের বিষয়ে জানতে চাইত। কিন্তু এসব বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন তেমন কোনো স্বচ্ছ তথ্য দিত না। যার ফলে তথ্য জানার জন্য নানা আন্দোলন গড়ে ওঠে। তথ্য জানার যে অধিকার ও সরকারি কাজের জবাবদিহিতার জন্য এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে ভারত সরকার এই আইনটি করে। এই তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে ভারত সরকার আগের চেয়ে প্রশাসনের দুর্নীতি কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

আমরাও ২০০৪ সাল থেকে কমবেশি আন্দোলন করেছি। বিশেষ করে, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীসহ সুশীল সমাজ এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অবশেষে ২০০৯ সালে এ আইনটি পেলাম। ২০০৮ সালে এই আইনটা অধ্যাদেশ আকারে আসে এবং ২০০৯ সালে এটি সংসদে পাস হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এই আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যেটি কার্যকর করা ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছে। এই আইনটি মূলত প্রথমদিকে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের জন্য করা হয়েছিল। কিন্তু এটি আজ আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন।

২০০৯ সনের ২০ নং আইনে অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে—যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং যেহেতু জনগণ গণপ্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক; এবং যেহেতু জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হইলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে, দুর্নীতি হ্রাস পাইবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে; এবং যেহেতু সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়। কথাগুলো দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে এই আইনটি জনগণের মৌলিক অধিকারকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বা নিশ্চিত করার জন্য করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। আপনারা হিসেব করে দেখুন, এই আইনের উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন। আর জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত বা বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই তথ্য দরকার।

আইনে বলা হয়েছে যে, যেকোনো কর্তৃপক্ষের কাছে আপনি তথ্য চাইতে পারবেন। কী কী তথ্য বা কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আপনাকে তথ্য দেবে না, তা এই আইনে বলা আছে। এতদিন কোনো তথ্য চাইলে কত ঝামেলা সহ্য করতে হতো। এই আইনের কারণে এখন আর সে ঝামেলায় পড়তে হবে না। এখন থেকে আইনের মাধ্যমে তথ্য পাবেন।

নাগরিক কার কাছে বা কোথায় তথ্য পাবে সে সম্পর্কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে :

১. সরকারি তহবিল হতে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

২. বিদেশ সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

৩. সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান।

৪. সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান : জেলা পরিষদ, উপজেলা বা থানা ও সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নাগরিককে তথ্য দিতে বাধ্য থাকিবে। সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এই আইনের বিধান অনুসারে নাগরিককে তথ্য দিতে বাধ্য।

অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে বা আমরা যে যে ক্ষেত্রে সরাসরি তথ্য পাব না, সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য পাওয়া যাবে। তাহলে তৃতীয় পক্ষ কে? ধরুন আমরা যদি শেয়ার কোম্পানি লিমিটেডের কাছে কোনো তথ্য চাই, তাহলে কি আমরা তথ্য পাব? না। কার কাছে পাব? বিএসটিআই-এর কাছে পাব। এ রকমের যত প্রতিষ্ঠান আছে সে ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

এই আইনে বলা হয়েছে যদি কেউ তথ্য নাও চায়, তাহলে কিছু মৌলিক তথ্য জনগণের কল্যাণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করবে। তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান তার কাজ-কর্ম ও হিসাবের স্বচ্ছতা প্রকাশ করবে। এতে করে জনগণ জানতে পারবে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এই তথ্য অধিকার আইনের মতো অন্য কোনো আইনের ক্ষেত্রে এত বাধ্যবাধকতা নেই। এই আইন যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে দেশের দুর্নীতি কমে আসবে। এ ক্ষেত্রে জনগণকে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্য নিতে হলে আপনাকে কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। কোন তথ্য চাইতে পারবেন, সেগুলো এই আইনে বলা আছে। কোন কোন তথ্য পাবেন না, তাও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ রয়েছে।

তথ্য প্রদানের ইউনিটগুলোকে কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়ে ভাগ করা হয়েছে। এ সমস্ত জায়গায় তথ্য পাওয়া যাবে। প্রতিটি কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তার তথ্য প্রদান করবে।

তথ্য সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে :

(১) তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করবে।

(২) যেসব তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায় তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য পাওয়ার সুবিধার্থে সারা দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করবে।

(৩) তথ্য কমিশন তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে এবং তা সব কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করবে।

তথ্য প্রকাশ প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে : তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রকাশের সময় কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য নিয়ন্ত্রণ বা লুকাতে পারবে না। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। এই আইনে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই আইনের ধারা ৭ অনুসারে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য নয়। অর্থাৎ যখন দেখা যাবে কোনো তথ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে, রাষ্ট্র ও জনগণের ক্ষতি হয়, এমন তথ্য রাষ্ট্র দিতে বাধ্য নয়। যেমন : কোনো সাংবাদিক পুলিশের কাছে যদি জানতে চান, অমুক সন্ত্রাসীকে কবে গ্রেপ্তার করবেন? এ ধরনের তথ্য পুলিশ দিতে বাধ্য নয়। ধারা ৯ অনুসারে কর্তৃপক্ষ আংশিক তথ্য প্রকাশ করতে পারবে, না করলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কিছু সংস্থা বা তার অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা এই আইনের আওতায় পড়ে না, যেমন এনএসআই, ডিজিএফআই, সিআইডি, এসএসএফ ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল, এসবি এবং র‍্যাব। তবে মানবাধিকার বা দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য হলে তা প্রকাশে বাধ্য।

তথ্য প্রাপ্তি প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে : তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে প্রয়োজনীয় মূল্য দিতে হবে।

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের তারিখ থেকে ২০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। একাধিক তথ্য প্রদানের ইউনিট থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করবেন। কর্তৃপক্ষ যদি আবেদন বাতিল করেন, তাহলে তা ১০ দিনের মধ্যে জানাবেন।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা তথ্য কমিশনের কাছে জানাতে হবে। তথ্য কমিশনের স্থানীয় বা প্রধান কার্যালয়ে জানাতে হবে। প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত।

কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পেলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আচরণে যদি ক্ষুব্ধ হন, তাহলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার আগে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনের সবল দিক : তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর সবল দিকগুলো হলো—স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা। কেউ যদি তথ্য নাও চায়, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তার কিছু তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবেন। এই আইনের প্রধান্য অন্যান্য আইনের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর, এর ফলে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩-ও বাধা হয়ে থাকবে না। এই আইন তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে।

তথ্য অধিকার আইনের দুর্বল দিক : তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর কিছু দুর্বল দিকও আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ করেছি। স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের উৎসাহ নেই। বাস্তব অবস্থাজনিত কারণে তথ্য দেয়া এবং নেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। তথ্য প্রদানকারীর কাছে পৌঁছানোর অসুবিধা, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অব্যবস্থাপনা, সম্পূরক তথ্য প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রিতা, তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক তথ্যের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি। কমিশনারবৃন্দের পদমর্যাদা ও হুইসেল ব্লোয়ারস প্রোটেকশন নিয়েও সমস্যা রয়েছে। তবে এগুলো কোনো মারাত্মক সমস্যা নয়। যদি তথ্য কমিশন ও জনগণ এগুলো সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করে, তাহলে এই দুর্বল দিকগুলোর সমাধান সম্ভব।

সঞ্চালক

ড. অনন্য রায়হান

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। এই আইনটাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা তার পক্ষেই সম্ভব। আমি তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই আইনে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই আইনে ৮টি প্রতিষ্ঠানের গোয়েন্দা ইউনিটকে বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এই আইনে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক সরাসরি তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে। ২০টি পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি বা সমস্যা সৃষ্টি করলে শাস্তি হিসেবে জরিমানার বিধান রয়েছে। সংবিধানের ১০২ ধারা অনুসারে যেকোনো সংক্ষুব্ধ নাগরিক উচ্চ আদালতে রিট করতে পারবে, তবে তথ্য কমিশনের বিরুদ্ধে কোনো রিট করার সুযোগ নেই।

এই সভায় আমরা এখন মতামত এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে এসেছি। আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে মতামত ও প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করছি :

১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম বিভাগে কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে? ২। এ ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠান কী করবে? ৩। কী ধরনের কাজ করলে এই আইন বাস্তবায়ন সহজ হবে? ৪। চট্টগ্রাম বিভাগে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এবং গত এক বছরে এই আইনের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে? আপনারা এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আপনাদের মতামত দেবেন।

মতামত ও প্রশ্নোত্তর পর্ব

মনিরুল ইসলাম মনু
কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা

গত ২০ জুলাই বান্দরবানে তথ্য কমিশনের একটি অবহিতকরণ সভায় আমাদের জেলা প্রশাসক বলছিলেন, তিনি তথ্য দিতে বাধ্য নন, কেননা এখন পর্যন্ত অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট প্রচলিত। এ বিষয়ে তথ্য কমিশনার দ্বিমত পোষণ করেননি। বা এ বিষয়ে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনায় বলা হয়েছে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট যা-ই থাক, তথ্য অধিকার আইনানুযায়ী তথ্য কমর্কর্তা তথ্য দিতে বাধ্য থাকবেন। আমি আজ আপনাদের কাছে জানতে চাই যে, আসলে কোনটা সত্য?

তানজিব-উল আলম
আপনি আমাদের কাছে এই বিষয়টি জানতে চাইছেন, তাই না? এটাও একটা তথ্য, আপনি অনুগ্রহ করে ধারা ৩টা দেখেন এবং পড়েন।

মনিরুল ইসলাম মনু
এ বিষয়টি আমরা পড়ে বলেছি। কিন্তু তথ্য কমিশনার এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

তানজিব-উল আলম
সেকশন ৩টা অষ্টম শ্রেণীর একটা ছেলে পড়লেও এ বিষয়টা বুঝতে পারবে।

ড. অনন্য রায়হান
এ বিষয়ে আপনি কি কোনো প্রতিবেদন করেছেন? সেকশন ৩-এ যে কথাগুলো আছে তা উল্লেখ করে?

মনিরুল ইসলাম মনু
আমরা যে পর্যায়ে সাংবাদিকতা করি সেখান থেকে তথ্য কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কথাগুলো তুলে ধরেছি। সেকশন ৩-এ যে কথাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিবেদন করিনি।

তানজিব-উল আলম
আমার মনে হয়, তথ্য কমিশনারদের মাথায় আগে তথ্য অধিকার আইন ঢোকাতে হবে। তাদের এই আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। কারণ তারা এই আইন সম্পর্কে অন্যদের বোঝাবেন। অথচ দেখা গেল, তারা এই আইন সম্পর্কে জানেন না। তাহলে তারা এই আইন সম্পর্কে কী অ্যাডভোকেসি করবেন?

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
বিভাগীয় (চট্টগ্রাম) তথ্য কর্মকর্তা

আমি তথ্য অধিকার আইনের কিছু দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করব। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন এই আইনটির ব্যাপক প্রচার, তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে ইউনিয়ন পর্যায়ের তথ্য উপজেলায় পাওয়ার চেয়ে উপজেলার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদে যাতে তথ্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। যাতে সরকারের উদ্দেশ্য ও উদ্যোগ জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া, তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য ইনডেক্স তৈরি করা; এর জন্য শ্রম, লোকবল, অর্থ প্রয়োজন; তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন, বাজেট থাকা প্রয়োজন। ম্যানুয়াল দরকার। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন।

ধারা ২৭(৬) ১ ও ৩-এ শাস্তির বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে, জরিমানা (৫০০০ টাকা) ও অসদাচরণের শাস্তির কথা। এখন দুটি শাস্তির জন্য ১০,০০০ টাকা জরিমানা করলে আমার বেতন থাকবে না। তাতে করে আমাদেরকে দুর্নীতির দিকে ধাবিত করানো হয়। জরিমানা ও অসদাচরণ দুটো শাস্তির বিধান দরকার নেই। দুটো শাস্তিকে একটি করা যায়। এ ক্ষেত্রে অসদাচরণের শাস্তির বিধান করা উচিত। এটির সংশোধন প্রয়োজন, আমি মনে করি।

এই আইনে দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এটি সংশোধন করা উচিত। ধারা ৯-(১) তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের তারিখ হতে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। একাধিক তথ্য প্রদানের ইউনিট থেকে তথ্য গ্রহণের উল্লেখ থাকলে সে ক্ষেত্রে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। কর্তৃপক্ষ যদি আবেদন বাতিল করেন তাহলে তা ১০ দিনের মধ্যে জানাবেন। ধারা ৯(২)—অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে ২০ দিনের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না। ফলে এখানে দিনের সংজ্ঞা হওয়া উচিত বা কার্যদিবস করা উচিত। তথ্যের অপ্রতুলতা এবং লোকবলের অভাব রয়েছে। অনেক জায়গা থেকে তথ্য দিতে চায় না। তথ্য দিতে তাদের আগ্রহ নেই।

অনুরোধকৃত কোনো তথ্য ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার থেকে মুক্তি-সম্পর্কিত তথ্য হলে অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ জানাবেন। অনেক সময় এসব তথ্য সংগ্রহ করতে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য না দিতে পারার কারণে শাস্তি পাব বা জরিমানা দিতে হবে, এটা ঠিক না। ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু বা ভিসেরা রিপোর্ট অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এখানে পুলিশ কমিশনার মহোদয় উপস্থিত আছেন। তিনি কিছুদিন আগে একটা সেমিনারে বলেছিলেন যে, মেডিকেল থেকে একটা ভিসেরা রিপোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে তথ্য কর্মকর্তা এবং পুলিশ কমিশনার কী করে এই ধরনের ভিসেরা রিপোর্ট দেবেন? এখানে তাদের দোষ কী? এজন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে। অনেক সময় চাকরির প্রমোশনের ক্ষেত্রে তাদের এজন্য সমস্যায় পড়তে হবে। এটার সংশোধন প্রয়োজন।

ধারা ৮-(২) মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এসব তথ্যের বা রিপোর্টের জন্য এত এত মূল্য দিতে হবে। মূল্য আদায় করা হলো, কিন্তু প্রশ্ন হলো, কার কাছে দিতে হবে এবং এই টাকা কোথায় জমা হবে, এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। মূল্য কি আমার পকেটে যাবে, না কোষাগারে যাবে? সরকারি সকল আয় তার কোষাগারে যায়। এ বিষয়ে কোনোকিছু উল্লেখ নেই। জরিমানার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। প্রকৃত মূল্যের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃত মূল্য কী এবং কে নির্ধারণ করবে? এই বিধিমালাটি অপূর্ণাঙ্গ। এটিও সংশোধন প্রয়োজন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাদের সবার দক্ষতা এক রকম নয়। প্রয়োজনে একেক জায়গার কর্মকর্তাদের একেক রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এত বড় একটা আইন হয়েছে। কমিশন হয়েছে। এটা অবশ্য সবল দিক। দুর্বলতা হলো যারা তথ্য প্রদান করবে, তাদের কাজের পাশাপাশি একটা অতিরিক্ত কাজ দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো সহকারী নিয়োগ দেয়া হয়নি। আমি আমার দৈনন্দিন কাজের জন্য দায়বদ্ধ। অন্যদিকে তথ্য প্রদানের জন্যও দায়বদ্ধ। না দিতে পারলে শাস্তি। এখন আমি একটা বাদ দিয়ে অন্যটা করতে পারব না। এতে করে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে। এজন্য একজন সহকারী নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন জনবল নিয়োগ দেয়া। সরকারি জনবল-কাঠামো ৪০ বছর আগে যা ছিল এখন প্রায় তা-ই। অল্পকিছু হয়তো বেড়েছে। কিন্তু আরো বেশি জনবল নিয়োগ দেয়া উচিত। প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক সময় আমার মনে হয় আমরা যারা তথ্য সংগ্রহ করি তারা ভুলে যাই যে, তথ্য প্রদানকারী বা তথ্য কর্মকর্তা আমাদের মতো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। এ বিষয়টি আমাদের মাথায় রাখা উচিত।

ধারা ১৪(৫)-এ বাছাই কমিটি সম্পর্কে যে ভোটের কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে নির্ণায়ক ভোটের দরকার নেই। এটি সংশোধন করা। আমরা জানি যে দুজনে কোরাম হয় না, সভা হয়। এই আইনে ১৮(৩)-এ কোরাম সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা সংশোধন করা দরকার। দুজনে কোরাম হয় না। সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ৫-এ করা উচিত।

মং থোয়াই চিং
নির্বাহী পরিচালক, গ্রীণ হিল, রাঙ্গামাটি

পার্বত্য চট্টগ্রামে এই তথ্য অধিকার আইন এখনো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। যার কারণে এখানে কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাইলেও তিনি দিতে পারবেন না। এটাই স্বাভাবিক। এ আইনের বাস্তবায়ন হাটি হাটি পা পা করে একটু বাস্তবায়িত হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যে ধরনের প্রচার-প্রচারণা দরকার ছিল তা হয়নি। ক্যাম্পেইন হয়নি।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলো আগে প্রয়োজন এই আইনটির ব্যাপক প্রচার, তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করার বিষয়ে বিভাগীয় (চট্টগ্রাম) তথ্য কর্মকর্তা যে কথা বলেছেন তা খুবই সত্য। আমি এর সাথে একমত। এই আইনটির ব্যাপক প্রচার না হওয়ার কারণে, তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ না থাকায় এবং জনবলের অভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তথ্য কর্মকর্তারা তথ্য দিতে পারছেন না। এজন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই আইন সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা প্রয়োজন। তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে এই আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে যাতে করে একটা তথ্য প্রদান ইউনিট থাকে, সে ব্যবস্থা করা দরকার। এটা কমিশনের উদ্যোগে হতে পারে বা করা যেতে পারে।

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে এই আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এজন্য এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য ইনডেক্স তৈরি করা, এর জন্য শ্রম, লোকবল বাড়ানো এবং এসব কাজের জন্য অর্থ প্রয়োজন। তাই বাজেট রাখা দরকার। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন। বাজেট না থাকলে প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাহত হবে। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন—সময় অনুযায়ী কাজ করা, তথ্য প্রদান ইউনিটকে আরো আধুনিকায়ন করা, তথ্য ওয়েব চালু করা, জেলা বাতায়নকে আরো সমৃদ্ধ করা।

শিশির দত্ত
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)

মং যে কথাটা বলেছে, আমি তার সাথে একমত। আমরা গত তিন বছর আগে এখানে তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আজ আবার করছি। আমাদের আজকের আলোচনায় এই তথ্য অধিকার আইনের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ে নানা মতামত চলে এসেছে। আমরা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কী করতে হবে, সে বিষয়ে আলোচনা করছি। এ ধরনের আলোচনা প্রয়োজন হয়েছে। এই আলোচনায় একটি বিষয় হলো এই আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে। প্রয়োগ সম্পর্কে এই আইনের নানা সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

আমার মনে হয়, এই আইন বাস্তবায়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে, তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। তারা জনগণের মধ্যে এই আইনকে কী করে নিয়ে যাবেন তা জানেন না। এটা দিয়ে মানুষের কী উপকার বা লাভ হবে তা তারা বোঝাতে সক্ষম হচ্ছেন না। তথ্য অধিকার আইন গণমানুষের মধ্য নিয়ে যেতে হলে জনগণ যেভাবে বোঝে সেভাবে তাদের বোঝাতে হবে।

তথ্য অধিকার আইনের কিছু দুর্বলতার বিষয়ে আমি দু-একটা কথা বলব। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ। প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কারণে এই আইন বাস্তবায়নের নানা সমস্যা চলে এসেছে। এই প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন।

তথ্য প্রদান ইউনিটের কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব রয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দরকার। তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম জেলায় তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানেন না; তাদের জানানো হয়নি। এ ব্যাপারে নানা ধরনের প্রচারণামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। লিফলেট, পোস্টার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও গণমাধ্যম, ইউনিয়ন পর্যায়ে বা গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক করা যেতে পারে।

পাঠ্যপুস্তকে কী কী তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা বিবেচনায় রাখা দরকার। এতে করে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো ভুল না শেখে, সে বিষয়টির দিকে লক্ষ রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

তানজিব-উল আলম

ধন্যবাদ জনাব শিশির দত্ত। আমি আপনার সাথে একমত যে, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন তাদের জন্য প্রশিক্ষণ দরকার। আমি শুনেছি যে, এমআরডিআই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেবে এবং প্রশিক্ষণ দেবে।

আমি সামসুদ্দিন ভাইসহ যাদের মনে কার্যদিবস সম্পর্কে এরকম ধারণা এসেছে, তাদেরকে বলছি, আপনারা সেকশন ৯টা দেখুন, ওখানে কার্যদিবস সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুতরাং বিভ্রান্তির কোনো সুযোগ নেই। ২০ কার্যদিবস, ৩০ কার্যদিবস এবং ১০ কার্যদিবস বলা হয়েছে, যেখানে তারা ইনফরমেশনটা দেবেন সেখানে। অন্যদিকে আপিলের ক্ষেত্রে দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাছাই কমিটিতে ৬ জনের কথা বলা হয়েছে। কোরাম ৩ জনের। কাস্টিং ভোট একজনের ২টি ভোট রয়েছে। ২ জনে কোরাম হয়। আলোচনাও করা যায়।

অ্যাডভোকেট আক্তার কবির চৌধুরী

আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটির (চট্টগ্রাম)

সংবিধানে থাকার পরও এই আইনটি থেকে ৩৮ বছর সময় লেগে গেছে। কারণ হলো, আমাদের মানসিকতা তথ্য গোপন করার। আমরা তথ্য দিতে চাই না। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যারা আমরা আইন বুঝি, তারাই আইন মানি না। এমনকি অনেক সময় যারা আইন প্রণয়ন করেন তারা আইন ভঙ্গ করেন। এমন সংস্কৃতিতেই আমরা অভ্যস্ত। আমাদের দেশে সরকারি কর্মকর্তাদের মানসিকতা ঔপনিবেশিক মানসিকতা, যা বহুকাল ধরে চলে এসেছে। এ ক্ষেত্রে এই তথ্য অধিকার আইন কতটুকু কার্যকর হবে তা বলা মুশকিল। এই তথ্য গোপন করা ও না দেয়ার মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। তবে এই আইন যদি কার্যকর করা যায়, তাহলে এতে করে জনগণের অধিকার আগের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিত হবে।

যারা তথ্য দেবেন এবং যারা তথ্য নেবেন, তারা এই আইন সম্পর্কে জানেন না। সাধারণ মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না। তাদের জানানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এই আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। তারা যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝাতে হবে। সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, যারা এই উদ্যোগের সাথে জড়িত তাদেরকেও এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং অন্যদের জানাতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন মানুষকে জানাতে হলে একটা আন্দোলন তৈরি করতে হবে। এ আন্দোলন নানা প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। জনগণ যে তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখে, সে সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদেরকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

এই তথ্য অধিকার আইন না থাকলে জনগণের অনেক অধিকারই পূরণ হয় না। এই আইনের কারণে আমরা জানলাম, কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকের অন্য কোনো রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়াটা একটা অধিকার। আর এতদিন জানতাম, এটা করুণা।

তথ্য প্রদানের জন্য ২০ কার্যদিবস, ৩০ কার্যদিবস এবং ১০ কার্যদিবস কম সময় নয়, অনেক বড় সময়। তথ্য না দেয়ার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

ইয়াছমীন রিমা

চট্টগ্রাম জেলা প্রতিনিধি, দ্য ডেইলি নিউ এইজ

একটা সময় আমাদের ধারণা ছিল যে ঈশ্বর বাস করতেন টাকায়। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন একটা সময়ে উপনীত হয়েছি যে এখন ঈশ্বর বাস করেন তথ্যে। এই আঙ্গিক থেকে আমি বলব যে 'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়'-বিষয়ক মতবিনিময় সভায় আলোচনা এবং এ পর্যন্ত এই আইন নিয়ে যতগুলো সভা বা আলোচনা হয়েছে সবগুলোতেই আইনটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এতে এই আইনের নানা সমস্যার কথা উঠে এসেছে। আমি সেই আলোচনার দিকে যাচ্ছি না।

আমার কাছে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তা হলো সচেতনতা। অর্থাৎ জনগণকে যদি সচেতন না করা যায় বা সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা না যায়, তাহলে তথ্য অধিকার আইন কেন, এ ছাড়াও আরো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আইন রয়েছে তা কার্যকর হবে না। এ দেশের অধিকাংশ জনগণ এখনো নানা বিষয়ে অসচেতন। তাদের সচেতন করে গড়ে তুলতে পারলে সব আইন পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

তথ্য যাদের প্রয়োজন তাদের সচেতন করতে হবে। তথ্য তাদের কী সুযোগ-সুবিধা দেবে তা জানানো— তথ্য কীভাবে তাদের জীবনধারণের জন্য সহায়তা করে সে বিষয়ে তাদেরকে জানানো। এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে এ আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য গ্রহণ-প্রদান ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে। যাতে জনগণ খুব সহজেই তার প্রয়োজনী তথ্য পেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজে কত পরিমাণ গম বা চাল বা টাকা এল, যাতে জনগণ তা জানতে পারে, তার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। নাগরিকের সিটিজেন চার্টারে তার কী অধিকার রয়েছে উল্লেখ করা দরকার। এতে করে স্থানীয় প্রশাসনের জবাবদিহিতার জায়গা অনেক বেড়ে যায়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাত
সম্পাদক, দৈনিক রূপসী গ্রাম

আমি একজন মাঠ পর্যায়ের সংবাদকর্মী। সে অবস্থান থেকে আমার কথাগুলো বলা। আমি এই আইন পাস হওয়াতে ঝামেলায় আছি। এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে, কেমন ঝামেলায় আছেন? আমি বলতে পারি যে, এই আইন পাস হওয়ার আগে আমার তথ্য সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু পাস হওয়ার পর আমার জন্য ঝামেলা হয়েছে। আগে আমি এক দিনের মধ্যে একটা ভালো রিপোর্ট করার জন্য তথ্য পেতাম। এখন সেটা এই তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পরে পাই না। এখন দেখি, সেটা হিতে বিপরীত আকার ধারণ করেছে।

আমি একবার এই জেলার মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়) ওপর একটি সার্বিক রিপোর্ট করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একজন সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার দীর্ঘ ১১ দিন ধরে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে ঘুরেও কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই কর্মকর্তাকে বলেছি যে আমরা এই স্কুলগুলোর শিক্ষকসংখ্যা, কতজন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন, কটি পদ খালি রয়েছে, শিক্ষার্থীসংখ্যা, কী কী ইনস্ট্রুমেন্ট আছে এবং কী কী নেই– এসব বিষয়ে তথ্য দরকার। কিন্তু তিনি দেননি। বরং তিনি আমাকে এই আইনের একটা কপি দেখিয়ে বলেছেন, এখন এটা আপনাকে নিতে হলে আইনি প্রক্রিয়ায় আবেদন করে নিতে হবে। তিনি বললেন, এরপর আমরা এই তথ্য আপনাকে ৩০ দিন পর দেব। এ রকম পরিস্থিতি হলে এই আইন বাস্তবায়নের কাজ কী করে এগোবে?

এই আইনে বলা হয়েছে, অনুরোধকৃত কোনো তথ্য ব্যক্তির জীবন, মৃত্যু, গ্রেপ্তার এবং কারাগার থেকে মুক্তি-সম্পর্কিত তথ্য হলে অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ জানাবে। অনেক সময় এসব তথ্য সংগ্রহ করতে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় প্রয়োজন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য দেয়ার কথা বলা হলেও তথ্য কর্মকর্তারা ২৪ ঘণ্টার মধ্য তথ্য দেন না।

আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকার তেমন উদ্যোগী নয়। যদি হতেন, তাহলে কেন গত ১ বছরের এ আইনের ১০% কাজ বাস্তবায়ন হয়নি? কক্সবাজারে এখনো কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি।

অনন্য রায়হান

আপনি যে ১১ দিন ঘুরে তথ্য পাননি, এ বিষয়ে আপনার বা অন্য কোনো পত্রিকায় রিপোর্ট করেছেন?

মোহাম্মদ আলী জিন্নাত

হ্যাঁ করেছি। ৬টি স্কুল ঘুরে এক মাস পর তথ্য সংগ্রহ করে তারপর রিপোর্ট করেছি।

হাসিবুর রহমান

আপনি যে ১১ দিন ঘুরে তথ্য পাননি, এ বিষয়ে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো পত্রিকায় রিপোর্ট করেছিলেন কি? আমার মনে হয়, আপনি করেননি। করলে পরে দেখতেন কী হয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে দেখেছেন, সেখানে কিন্তু জনগণ আইনটি ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছে।

আর সেখানে সাংবাদিকরা শুধু তথ্য চাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনে যান না, বরং তারা তথ্য কমিশনে বা তথ্য কর্মকর্তার কাছে থেকে জানতে চান, তথ্য চেয়ে কয়টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। তথ্য কর্মকর্তারা কয়টি আবেদনের জবাব দেন, তা দেখেন। তথ্য কর্মকর্তারা কয়টি আবেদনের জবাব দেন না তাও দেখেন। তারপর তারা এসব বিষয় উল্লেখ করে রিপোর্ট করেন, যে রিপোর্টে সরকারি কর্মকর্তাদের নাম-ঠিকানা ও পদবি উল্লেখ করা হয়। এটা হলো সাংবাদিকদের আইনের ব্যবহার। আরেকটা বিষয়ে সাংবাদিক এই আইনের ব্যবহার করতে পারেন, তা হলো কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ। তথ্য মানে সাংবাদিকদের প্রয়োজন, বিষয়টি এমন নয়। তথ্য অধিকার আইন মানে সাংবাদিকদের আইন, তাও নয়। জনগণের জন্য, তাদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এই আইন। এই মৌলিক অধিকার বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা সাংবাদিকরা দেখবেন। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য পদোন্নতি একটা বড় বিষয়। জরিমানা ও বিভাগীয় শাস্তির ভয়ে তারা জনগণকে যথাসময়ে তথ্য প্রদান করবেন। এভাবে ওখানকার জনগণ ও তথ্য কর্মকর্তারা সকলে এই তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে সাংবাদিকদের এ দায়িত্ব নিতে হবে। তাহলে এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
তথ্য কর্মকর্তা

এই আইনের গেজেট আমাদের কাছে মাত্র কয়েক দিন আগে এসেছে। তথ্য কমিশন ৮ আগস্টের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা বলেছে।

ড. অনন্য রায়হান

www.bdpress.govt.bd—এখানে আপনারা সব ধরনের সরকারি গেজেট পাবেন। www.cabinet.govt.bd—এখানে মন্ত্রিপরিষদ যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা পাবেন।

তথ্য অধিকার আইন হয়েছে আমরা জানি। সরকার এই আইন প্রচারের জন্য নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এখন আমরা যদি ভাবি, এই আইনের গেজেট সরকার আমার কাছে পৌঁছায়নি, অতএব এজন্য সরকার দায়ী, তা ঠিক হবে না। কিন্তু এই আইনের গেজেট সংগ্রহ করার দায়িত্ব কি আমাদের না? সরকার জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। সেখানে কি আমাদের সহযোগিতা করা উচিত না? নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব যে নিজের উদ্যোগে এসব বিষয় সংগ্রহ করা। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আমাদেরই বেশি ভূমিকা রাখতে হবে।

অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম
সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি

আমার বন্ধু শিশির দত্তসহ অনেকেই এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তাদের সাথে আমি একমত। তবে এতক্ষণ এই আলোচনা শুনে আমার মনে হলো, আমাদের মহান সংবিধানের আলোকে এবং মানুষ হিসেবে তথ্য পাওয়ার অধিকার আমাদের সবার। সেই অধিকারকে ২০০৯ সালে আইনে রূপান্তরিত করে সরকার। নাগরিকের কিছু জানার অধিকার যে মৌলিক অধিকার, তা এই আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি পেল।

তথ্য কর্মকর্তা আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। কিন্তু তার পরও কেন জানি বলতে হয়, তাদের কাজটা তারা জেনেশুনেই বেছে নিয়েছেন এসব সার্ভিস দেয়ার জন্য। তিনি বলেছেন, ডিসি সাহেবেরা অনেক পেরেশান হয়ে যান। আসলে মানুষের মাঝে মানুষের জন্য মাঠে-ঘাটে কাজ করলে এরকম একটু পেরেশান সবারই হতে হয়। কষ্ট হয়। কিন্তু কাজটা তারাই বেছে নিয়েছেন। যেমন : রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা কষ্ট করে গাড়ি চালায়। এত পরিশ্রমের পরও তাদের ক্লান্তি নেই। কারণ তারা জীবন-জীবিকার জন্য ওই কাজটি বেছে নেয়। কেননা সে জানে, রিকশা বা ঠেলাগাড়ি না চালাতে পারলে নিজে এবং পরিবার-পরিজন চলতে পারবে না। সকল পেশার ক্ষেত্রে এমনটি হয়। তো আমার যেসব ভাই এবং বন্ধু একটা ভালো অবস্থানে থেকে ওই গরিবদের কথা ভাববেন না এবং তারা রাত ১২টার সময়

অতীব প্রয়োজনে যদি কোনো একটা ছোট তথ্য জানতে চায়, তা দেবেন না– এটা কোনো মানবিকতা নয়। ভুলে যাবেন না, তাদের দেয়া করের টাকায় আপনি এবং আপনার পরিবার বাঁচে।

হয়তো একটা তথ্যের কারণে একজন মানুষের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে একজন নাগরিক নিজের দায়িত্ব মনে করে কোনো কর্তৃপক্ষকে বা ডিসি-এসপি বা অন্য কারো কাছে রাত ১২টার সময় তথ্য জানাতে বা চাইতে পারে। সেটার যদি জবাব হয়, আমি এখন ঘুমাচ্ছি এবং সকালে শুনব, যে কারণে ওই কাজটা বা একজন মানুষের জীবন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে এই রাষ্ট্রের এবং এই আইনের এত বড় আয়োজন তাও শেষ হয়ে যায়। তাই বলছিলাম, আমরা যে যে দায়িত্বে আছি তা পালন করা। আমরা আমাদের কাজগুলো বেছে নিয়েছি। মানুষের টাকায় আমাদের পরিবার-পরিজন চলে। আমাদের জন্য অর্থাৎ আমরা যারা শিক্ষিত মানুষ, যারা রাষ্ট্রের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি, তাদের আরাম-আয়েশের জন্য, কারও জন্য মাথার ওপর ফ্যান ঘোরে আবার কারো জন্য এসি থাকে— এ সবই জনগণের টাকায়। তাহলে সেই মানুষের জন্য আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো কেন পালন করব না? তাই আমাদের মধ্য মনুষ্যত্ব ও মানবতাবোধ নির্মাণ করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইন মানুষের জন্য। মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য। সাধারণ মানুষকে জানানোর দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, এ দায়িত্ব আমাদের সকলের। তানজিব ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মুনির হেলাল

পরিচালক, কোডেক (চট্টগ্রাম)

আমরা সব সময়ই দেখেছি যে, আমাদের মধ্যে সব সময় দুটি পক্ষের চিন্তা কাজ করে। আমরা মনে করি, যেকোনো কাজে সরকার একটা পক্ষ ও জনগণ আরেকটা পক্ষ। যেমন, আমরা অনেকে মনে করি যে এই তথ্য অধিকার আইন, এটা সরকারের। সাংবাদিক, আইনজীবী মনে করেন, এ আইন তাদের জন্য। আবার অনেকে মনে করেন, এটা এনজিও বা সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য। আসল কথা হলো, এই আইনটা সবার জন্য। সরকারি-বেসরকারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমরা যদি সব সময় 'দুই পক্ষ চিন্তা' মাথায় রাখি, তাহলে এই আইন বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে। দুই পক্ষ চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমাদের সন্তানেরা আমাদের অনুসরণ করে। আমাদের সবকিছু তারা শেখে।

আইনটি মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য করা হয়েছে। এখানে এ-পক্ষ বা ও-পক্ষ বলে কোনো পক্ষ নেই। আমরা সবাই এক পক্ষ। সবার জন্য এই আইন। এই আইন বাস্তবায়নেও আমাদের সবার কাজ করে যেতে হবে। জনগণের বা আমাদের কী কী তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে তা এই আইনে বলা হয়েছে। এই আইন মানুষের জন্য। যাতে মানুষ তার অধিকারগুলো বুঝে পায়, তার জন্য এই আইন করা হয়েছে। আর এটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের সকলের। এ ক্ষেত্রে আমাদের মধ্য বিভাজন থাকলে চলবে না।

এই আইন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। তারা যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝাতে হবে।

জনসচেতনতা তৈরি করা দরকার। সরকার ও এনজিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা যারা এই উদ্যোগের সাথে জড়িত, তাদেরও এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে এবং তারা অন্যদের জানাবেন। এটা মানুষ হিসেবে আমাদের সকলের দায়িত্ব।

হরি কিশোর চাকমা

প্রথম আলো প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

আমি তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করব না। আমি শুধু এই আইনের একটি বিষয়ে জানতে চাই। আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করছি, তারা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, শান্তকরণ প্রকল্প নামে একটা প্রকল্প রয়েছে। এটা বাস্তবায়ন করে সেনাবাহিনী। এই প্রকল্পে যে খাদ্যশস্য আসে এবং যা সেনাবাহিনী পার্বত্যবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। তানজিব ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, এই প্রকল্পের যে খাদ্যশস্য আসে তা সঠিকভাবে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় কি না, এ বিষয়ে আমি সেনাবাহিনীর কাছে তথ্য চাইতে পারব কি? বা এটা জানা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যা কি না বা এটা জানার অধিকার এই আইনে আছে কি না?

কেননা আপনি বলেছেন যে এই আইনে ৮টি গোয়েন্দা সংস্থাকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। আপনি আরো বলেছেন, তবে দুর্নীতি ও মানবাধিকার-সংক্রান্ত হলে তথ্য চাওয়ার অধিকার আছে। এ বিষয়ে একটু বলুন।

তানজিব-উল আলম

আপনাকে ধন্যবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলার জন্য। অবশ্যই তথ্য অধিকার আইনের ধারায় সেনাবাহিনী এ বিষয়ে তথ্য দিতে বাধ্য। সরকারের অর্থে পরিচালিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দাদের রেশন দেয়া হয়। এই প্রকল্প থেকে রাস্তাঘাট ও স্কুল করার কথা থাকলে তা যদি না করা হয়, এ ক্ষেত্রে সরকারের কাজ তারা যদি যথাযথভাবে পালন না করে এবং রেশন না দেয়, তাহলে অবশ্যই আপনি এই বিষয়ে তাদের কাছে তথ্য চাইতে পারবেন। এবং তার বা তাদের বিরুদ্ধে আপনি দুর্নীতির মামলা করতে পারবেন। ওরা যদি আপনাকে ইনফরমেশন দিতে রিফিউজ করে, তাহলে আপনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করবেন। না হলে তথ্য কমিশনে যাবেন। সবশেষে হাইকোর্টে যেতে পারবেন।

নারগিস আক্তার

সমন্বয়কারী, অ্যাডাব (অশোকতলা, কুমিল্লা)

'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় আমরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুনছি। সবাই অনেক অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরপর মূলত বলার কিছু থাকে না। আমি শুধু দুটো কথা বলব। আমরা যারা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, যারা সমাজের বিভিন্ন পেশায় জড়িত, তারা এই আইন সম্পর্কে জানি; কিন্তু আমার কথা হলো যাদের জন্য বা জনগণের জন্য এই তথ্য অধিকার আইনটি করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, তারা এই আইন সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাদের জন্য আমরা কী করতে পারি।

এই আইনে জনগণের মৌলিক অধিকারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে ভালো করে জানানো, তথ্যের ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তোলা, সাধারণ মানুষকে এ আইন জানানোর জন্য যে যে পদক্ষেপ নেয়া উচিত তা নিতে হবে।

আমার মনে হয়, জনগণকে জানাতে হলে এই আজকের মতো করে সারা দেশের গ্রামে গ্রামে মানুষ নিয়ে বসে আলোচনা করা– কোনো বিষয়ে জানতে চাইলে সেই বিষয়টা উল্লেখ করতে হবে। এই আইনের প্রচারের ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেসির কোনো বিকল্প নেই। এমনভাবে এই আইন প্রচার করতে হবে, যাতে সে জানতে পারে, এই আইনের কারণে সে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবে? এই আইনে তার কী কী স্বার্থ রক্ষা হবে। তাহলে জনগণ নিজের প্রয়োজনের তুলনায় এই আইন বাস্তবায়নে আগ্রহী হবে। কী কী তথ্য কোথায় গেলে পাওয়া যাবে, তার দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে। বা সেই দিক-নির্দেশনা এমনভাবে রাখা, যা জনগণ খুব সহজেই পেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আরেকটি কাজ করা দরকার, তা হলো, যারা তথ্য দেবেন বা যাদের কাছে আমরা তথ্য পাব, তাদেরকে তথ্য কী, তথ্য অধিকার কী, তথ্য অধিকার আইন কী, এ আইনে কী বলা হয়েছে– সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানানো। তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা প্রধান কর্তব্য।

শফিকুল ইসলাম

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম জেলা

আমি আসলে কোনো কিছু বলতে চাইছিলাম না। আমি আসলে শুনতে বেশি পছন্দ করি। সবার আলোচনা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। সবার আলোচনা শোনার পরে আমার মনে হলো আর বলার মতো কোনো কিছু বাদ নেই। তানজিব ভাই বললেন এবং আমি আইনের ৭ ধারাটা পড়েছি। তাতে আমি আমার বিভাগের দিক থেকে বলতে পারি, অনেক ক্ষেত্রে তথ্য না দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা তথ্য অধিকার আইন নিশ্চিত করেছে। তবে আমি মনে করি, এটা ঠিক নয়। এর সংশোধন দরকার। আরো লিবারেল হওয়া প্রয়োজন। আমি কী তথ্য দিতে পারব এবং আর কী তথ্য দিতে পারব না, তা স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকলে ভালো হতো।

আমি মনে করি, আমার ডিপার্টমেন্টের পুলিশ কোনো ব্যক্তিকে ধরলে সেই তথ্য ওই ব্যক্তির পরিবার বা অন্য যে-কারোর জানার অধিকার রয়েছে। আর যে ক্ষেত্রে তথ্য জানা যাবে না, তা হলো আমি বা পুলিশ যদি বাংলা ভাইয়ের জামাইকে ধরে এনে কোনো জঙ্গি বা সন্ত্রাসীর কাজের তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো তথ্য কাউকে দেয়া যাবে না। এ রকমভাবে স্পষ্ট করে এই আইনে কী তথ্য জানানো যাবে আর কী জানানো যাবে না, তার উল্লেখ নেই। এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আমি কোনটুকু জানাব আর কোনটুকু জানাব না। আমার মনে হয় এটা এভাবে ঢালাওভাবে না রেখে আরো নির্দিষ্টভাবে এই আইনের সংশোধন দরকার। তাহলে আমরা যারা এই পেশায় কাজ করি বা সরকার চাকরিজীবীদের জন্য সুবিধা হয়।

এক সাংবাদিক ভাই বললেন যে ওনাকে ১১ দিনেও শিক্ষা কর্মকর্তা তথ্য দেননি। আমি বলব যে এটা আসলে একটা মানসিকতার ব্যাপার। কারণ ওই কাজটা বা তথ্য দেয়া, এখন আইন হয়েছে, আমাকে করতে হবে। যে কাজটার জন্য একটা লোক এসে ১১ দিন আমাকে বিরক্ত করবে, সেটা নৈতিকভাবেই দিয়ে দেয়া উচিত। সংগ্রহে না থাকলে আমি তাকে বলে দেব যে এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমার এত দিন লাগবে এবং আপনি অমুক দিন এসে নিয়ে যাবেন। অথবা আমার কাছে এই তথ্যটা আছে এবং এটা নেই। আমি বলব যে এটা আমাদের মানসিকতার ব্যাপার।

এই তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর সমন্বয় থাকতে হবে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে। উভয়কে এই আইনটা সম্পর্কে জানতে হবে। এর সুফল-কুফল জানতে হবে। উভয়েরই সেবা প্রদানের মানসিকতা থাকতে হবে। তথ্য যাদের প্রয়োজন তাদের সচেতন করতে হবে। তথ্য তাদের কী সুযোগ-সুবিধা দেবে তা জানানো, জনগণ খুব সহজেই যাতে তার প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। আমি মনে করি, স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। সরকার আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নয়। যা ইচ্ছা তা-ই করা স্বাধীনতা নয়। আমার স্বাধীনতা হলো অন্যের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে চলে যতটুকু নিজের স্বাধীনতাকে প্রসারিত করা।

ড. অনন্য রায়হান

তথ্য অধিকার আইনসংক্রান্ত আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আজকের আলোচনায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভার মাধ্যমে একটা জিনিস পরিষ্কার হলো যে রাষ্ট্র চাচ্ছে, জনগণের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্র চাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে। রাষ্ট্র চাচ্ছে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে। রাষ্ট্রের চাওয়া ও আমাদের চাওয়া পূরণের জন্য যে কাজটি প্রয়োজন, তা হলো এর যথাযথ বাস্তবায়ন। আর এই আইন বাস্তবায়নের জন্য যা যা করণীয় তা এই মতবিনিময় সভায় চলে এসেছে। সেগুলো সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি।

১। অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের প্রাধান্য নিয়ে শীর্ষ পর্যায়ে বিভ্রান্তি রয়েছে।

২। জরিমানা ও অসদাচরণ দুটো শাস্তির বিধানের পরিবর্তে একটি করা যায় কি না, তা ভেবে দেখা দরকার।

৩। এই আইনে দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এটি সংশোধন করা দরকার।

৪। ভিসেরা রিপোর্ট অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এই বিষয়টি বিবেচনায় আনা দরকার।

৫। তথ্যের বা রিপোর্টের আদায়কৃত মূল্য কোথায় জমা হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে নির্দেশনা প্রয়োজন।

৬। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য ইনডেক্স তৈরি করা, বাজেট রাখা, অবকাঠামোর উন্নয়ন, দিক-নির্দেশনা, তথ্য প্রদান ইউনিটকে আরো আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ প্রয়োজন।

৭। তথ্য গোপন করা ও না দেয়ার মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। এই আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। তারা যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝাতে হবে।

৮। তথ্য অধিকার আইন মানুষকে জানাতে হলে একটা আন্দোলন তৈরি করতে হবে। এ আন্দোলন নানা প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে।

৯। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য গ্রহণ-প্রদান ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে।

১০। তথ্য অধিকার আইনের অপব্যবহার হচ্ছে, তথ্য পেতে সাংবাদিকবৃন্দকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

১১। এই আইনটা সবার জন্য। সরকারি-বেসরকারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। 'দুই পক্ষ' চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এ আইন করা হয়েছে। এখানে এ-পক্ষ বা ও-পক্ষ বলে কোনো পক্ষ নেই। আমরা সবাই এক পক্ষ। সবার জন্য এই আইন।

প্রধান অতিথি

এ বি এম আজাদ

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম জেলা

এই 'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এক মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক ফয়েজ আহম্মদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। কারণ তার শ্বশুর মারা যাওয়াতে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। তার প্রতিনিধি হিসেবে আমি এখানে এসেছি।

আমি এতক্ষণ এখানে বসে আসলে জ্ঞান অর্জন করেছি। আমি এখানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আসলে আপনাদের জ্ঞান দিতে পারব না। কারণ এই আইন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান আমার নেই। আমার অনেক দিন ধরে একটি আশা ছিল, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এই রকম একটা সেমিনারে কথা শোনার। আজ তা পূরণ হলো। এখান থেকে আমি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম ও শিখলাম। ভবিষ্যতে এ শিক্ষা আমার কাজে লাগবে।

সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার কিছু দায়দায়িত্ব আছে, আমি সেটা জানি। তথ্য অধিকার আইন সাম্প্রতিক সময়ে একটি আলোচিত আইন। এই আইনের 'সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' এই তিনটি বিষয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি আগামী দিনের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা।

আজকের আলোচনায় আমাদের একজন অ্যাডভোকেট ভাই বলেছেন, সরকারি কর্মকর্তারা তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন। আসলে তিনি ঠিকই বলেছেন যে, তথ্য না দেয়ার সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের চাকরিজীবনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমাদের সিনিয়র কর্মকর্তারা নানা আকার-ইঙ্গিতে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, আমলাদের আসলে আমলার মতো আচরণ করতে হয়। মানে তথ্য না দেয়ার বিষয়টি শিখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে আমরা তত নিজেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নিয়েছি। আমরা পরিবর্তিত হয়েছি। এই সময়ের আমরা যারা ছোটখাটো আমলা, তারা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নিচ্ছি। যেটা তানজিব সাহেব ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিছু দিন আগেও আমলাদের পুঁথিগত বিদ্যা, জ্ঞানের অভাব ও নানা কারণে তথ্য না দেয়ার মানসিকতা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই ধারণার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। এখন আমলারা নিজেকে জনগণের সেবক মনে করতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের এমনভাবে পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নানা আইনকানুন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়, যার কারণে তথ্য না দেয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠে। যখনই বা কিছু বা কোনো তথ্য আমরা মানুষকে দিতে চাই, তখন আমার সামনে যে আইনের বইটি থাকে, সেটা আমাকে তথ্য না দেয়ার কথা বলে। দিলে শাস্তি বা জরিমানার ভয় থাকে।

কিন্তু আমি তথ্য প্রদান করতে চাই। তথ্য প্রদানের জন্য আমাকে যেন শাস্তি না পেতে বা জরিমানা না দিতে হয়– এই ব্যবস্থা তথ্য অধিকার আইনে রাখা উচিত। তার পরও আমি বর্তমান সরকারকে সাধুবাদ জানাই, এই রকম একটা আইন করার জন্য। যেটা আমাদের দেশের মানুষের বহুদিন প্রত্যাশা করে আসছিল।

যাদের শ্রম-ঘামের পরিশ্রমে আমরা আসলে আমাদের বেতন-ভাতা পাই, তাদেরকে যদি আমরা সেবা না দিতে পারি, তাহলে তাদের প্রতি আমাদের অবিচার করা হবে। সেই জনগণ এই তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের জবাবদিহিতা চাইতে পারবে। আমার মনে হয়, তারা এত দিনে সেই সুযোগটি পেয়েছে। একইভাবে সেই রক্ষাকবজটি আমাদের থাকতে হবে, যেটা একটু আগে আমি বললাম। নইলে আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য সফল করতে পারব না।

এই আইনের কিছু দুর্বল দিক রয়েছে। এটা একটি স্বাভাবিক বিষয়। প্রতিটি আইনের শুরুতে এটা হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো আইন হয়েছে, সবগুলোর শুরুতে নানা দুর্বলতা ছিল। আইনের এই দুর্বলতাগুলো সময়ের ধারাবাহিকতায়, বাস্তবতার কারণে ও বাস্তব প্রয়োগ এবং ব্যবহারের কারণে একসময় চলে যায়। যেমন তানজিব ভাই বলেছেন, এই আইনটি এখনো শিশু পর্যায়ে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে প্রতিনিয়ত তথ্যের পরিবর্তন আসবে। কারিগরি তথ্য সব সময় পরিবর্তনশীল। এর সাথে তাল মিলিয়ে এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করবে। এই আইন শুধু কতগুলো শব্দের সমষ্টি নয়। এটার সাথে কারিগরিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপার জড়িত আছে। আগের কম্পিউটারের সফটওয়্যার কিন্তু এখন তেমন একটা কাজে লাগে না। এই পরিবর্তনগুলোর সাথে আইনের খাপ খাওয়ানোর সুযোগগুলো রাখতে হবে। এবং আমি মনে করি, এই আইনের কিছু বিষয় সংশোধন করা দরকার।

যত সমস্যার কথাই বলি, আমি যদি ইচ্ছা করি যে, এই লোকটাকে সেবা দিতে চাই, তাহলে তা করা সম্ভব। এই মানসিকতা আমাদের তৈরি করা দরকার। যারা তথ্য দেবেন এবং যারা নেবেন তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। একেকজনের তথ্য পাওয়ার কৌশল একেক রকমের। শ্রমিকের ও একজন গবেষকের তথ্য পাওয়ার কৌশল এক নয়। যা-ই হোক, আজকে আমি আর কথা বাড়াব না। সকলকে ধন্যবাদ। আমি এখানে অনেক কিছু শিখেছি। এই শেখার গতি অব্যাহত থাকবে—সে আশাবাদ ব্যক্ত রেখে শেষ করছি।

হাসিবুর রহমান

আমি নিজে এনজিও করি। সুশীল সমাজের দাবির প্রেক্ষিতেই এই আইন প্রণীত হয়েছে। আজকের আলোচনা চলে এসেছে আমাদের দেশের যেকোনো বিষয় বা আইন প্রচারে এনজিও বেশি ভূমিকা রাখে। কাজেই, এই আইনের যথাযথ প্রয়োগে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা সুশীল সমাজেরই দায়িত্ব। এজন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধা আদায়ে কাজ করছে, তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

আমি রায়হান ভাইয়ের বক্তব্যের কথা ধরেই বলি যে, এটা একটা সুযোগ নিজেদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য। আমরা সব সময় অন্যদের সুশাসন নিয়ে কথা বলি। কিন্তু নিজেদের সুশাসন নিয়ে কথা বলি না। এই আইনের মাধ্যমে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই। রায়হান ভাইয়ের বক্তব্য-কথা যদি আমরা কাজে পরিণত করি, তাহলে এই আইন বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে। সারা দেশে অ্যাডভোকেসি করার মাধ্যমে এই আইনের প্রচার আমরা করতে পারি। বিশেষ করে, সারা দেশের এনজিওগুলো এই কাজ করতে পারে। আমি জানি, চট্টগ্রামে যারা সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত, পাহাড়েও তাদের দৃঢ় অবস্থান রয়েছে। তাদের এই আইনটি ওই সমস্ত অঞ্চলের মানুষকে হাতে ধরে শেখানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিত সকলের কাছ থেকে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়

ক. আগামী এক বছর পর তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা পরিমাপের জন্য কী মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে?

- প্রতিষ্ঠানের কাজের ধরনের ওপর ভিত্তি করে তথ্য কমিশন কর্তৃক সুবিধাভোগীদের ওপর জরিপ চালানো।
- কতজন বা প্রতিষ্ঠান তথ্য চেয়েছে, তার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারী ও তথ্য প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠানের সংঘাত এবং তৎপ্রেক্ষিতে অভিযোগের পরিমাণ।
- দুর্নীতির পরিমাণ কমেছে।
- আইনটি সম্পর্কে সাধারণ সচেতনতা তৈরি হয়েছে।
- কত শতাংশে প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদান ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য সংরক্ষণ-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
- সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্যভান্ডার (ইনডেক্স) হয়েছে কি না।
- সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে কি না।
- সাধারণ জনগণের মধ্যে মতামত জরিপ : তারা আগের তুলনায় সহজে তথ্য পাচ্ছে কি না।
- জমির খতিয়ান, সত্যায়িত দলিলের অনুলিপিসহ জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় তথ্য আগের চেয়ে কম সময়ে পাচ্ছেন কি না।

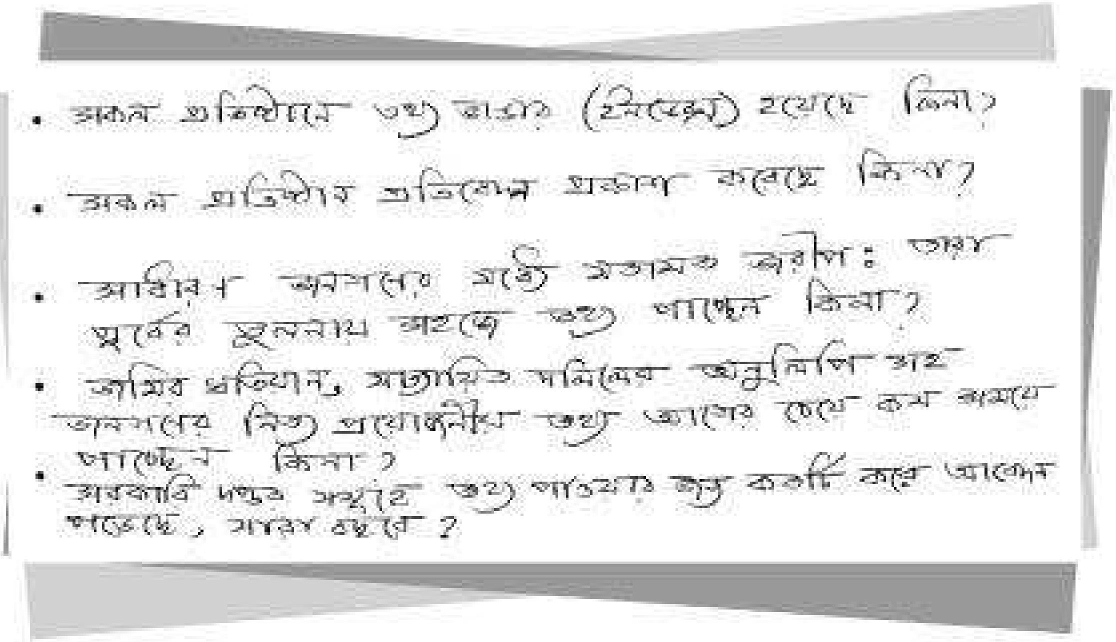

- সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য পাওয়ার জন্য কতটি করে আবেদন পড়েছে সারা বছরে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য কমিশনে এতৎসংক্রান্ত দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও নিস্পত্তির পরিসংখ্যান থেকে এর অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেতে পারে।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে (সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সকল) বার্ষিক একটি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দাখিল এবং এলাকা মনিটরিংয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতা যাচাই।
- মনিটরিং সেল গঠনপূর্বক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- তথ্য কমিশনকে কার্যকর করা হয়েছে কি না তার ওপর প্রতিবেদন তৈরি করা।
- কোনো মনিটরিং পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে কি না যাচাই করা।
- তথ্য কমিশনের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- সারা দেশব্যাপী মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করে বার্ষিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তা প্রকাশ (এনজিওর মাধ্যমে)।
- জনগণকে এ আইন বিষয়ে সচেতনমূলক উদ্যোগ দেওয়া হয়েছে কি না।
- ইউনিট অফিসসমূহে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগের শতকরা হার।
- অফিসসমূহে কম্পিউটার/ডিজিটাল সংযোজনের অবস্থা।
- তথ্য অধিকার আইন সাধারণ জনগণ পর্যায়ে কতটা অবহিত করা গেছে।
- চলতি অর্থবছরে কী কী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে জনগণ কতটুকু অবহিত হয়েছে বা সুযোগ-সুবিধাদি পেয়েছে তার তথ্যের ওপর নির্ভর করে।
- জণগণের ভোগান্তি কতটা কমেছে তা নির্ণয়ের মাধ্যমে।
- চাহিত তথ্যের ধরন নির্ধারণ— মৌলিক চাহিদাসংক্রান্ত ও মানবাধিকারসংক্রান্ত তথ্যের হার।
- জনগণের সকল স্তর থেকে যদি তথ্য চাওয়া হয়। স্তর নির্ধারণ করে নিম্ন স্তরের তথ্য চাওয়ার হার।
- অঞ্চলভিত্তিক মুক্ত আলোচনা।
- ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম।
- প্রতিটি সরকারি বিভাগ, স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থা এ আইন সম্পর্কে জানে এবং তথ্য সেল খোলা হয়েছে।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তথ্য মনিটরিং ব্যবস্থা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম সম্পর্কে স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করবে মুদ্রণের মাধ্যমে এবং অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

খ. চট্টগ্রাম বিভাগের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

- উপনিবেশ আমল থেকেই সারা দেশের সরকারি কর্মকর্তাগণ তথ্য গোপন করার সংস্কৃতিতে আক্রান্ত বিধায় দেশের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মচারী/কর্মকর্তারা একই রোগে আক্রান্ত।
- আইনটি সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়।
- সরকারি কর্মকর্তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।
- প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য সংরক্ষিত নেই।

- পাহাড়ি অঞ্চল বলে যোগাযোগ-সমস্যা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির কারণে জনগণকে সকল তথ্য উন্মুক্ত করতে সমস্যা।
- কর্মকর্তাদের সাথে জনগণের ভাষার (আঞ্চলিক) সমস্যা।
- প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা (জনসংযোগ কর্মকর্তা) বা পিআর সেল রয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা করা হয়েছে অন্য কর্মকর্তাকে, যা কাম্য নয়।
- সাংবাদিকগণ সরকারি দপ্তরে বেশি করে খবরদারি করতে পারেন
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনেকেই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত নন। ফলে তথ্য প্রাপ্তিতে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।
- এই আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা করা না হলে বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য হবে।
- প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্তগণ আইনটির প্রতি আন্তরিক না হলে।
- সাধারণ জনগণ আইনটির বিষয়ে অবহিত না হলে, এটির সফল বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে।
- সচেতনতার অভাব, কীভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা যায়, তার জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- প্রয়োগের সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ করে তোলা।
- পার্বত্য অঞ্চলে তথ্য অধিকার সম্পর্কে কোন ধরনের ব্যাপক সচেতনতা তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে।
- কর্তৃপক্ষগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি। এটি একটি চ্যালেঞ্জ।
- নাগরিক সমাজ ও কর্তৃপক্ষের আইনটি সম্পর্কে অজ্ঞতা
- পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ বিষয়কে নিরাপত্তা বিষয় হিসেবে দেখা।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সেবা গ্রহণকারী এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন।
- নাগরিকদের এই ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা করতে হবে।
- সরকারি অফিসগুলোতে জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট বাড়ানো দরকার।
- তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের অবহিতকরণ।
- তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, লজিস্টিক এবং বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ।
- তথ্যদাতাদের অফিসে লোক না থাকায় সংশ্লিষ্টদের মানসিকতার পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ।
- রিপোর্ট কিপিং সিস্টেম ডেভেলপ।
- অদক্ষতা।

- চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু অঞ্চলকে বা বিভাগকে 'বিশেষ' হিসাবে গণ্য করা হয় এবং সরকারি নির্দেশ চিহ্নিত হয়েছে।
- সিভিল প্রশাসনের অপেক্ষাকৃত তুলনায় সামরিক প্রশাসনের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
- অধিকার কর্মকর্তাগণ অনেক সংকুচিত।
- টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উপজেলা সদরের বাহির খুবই খারাপ।
- সকল জেলায় বিদ্যুতায়িত হবে।

- তথ্য প্রদানকারী সংস্থার দক্ষতা ও তথ্যের সংরক্ষণ পদ্ধতির অভাব।
- চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু অঞ্চল বা বিভাগকে 'বিশেষ' হিসেবে গণ্য করা হয় এবং পরস্পরবিরোধী বিধান রয়েছে।
- সাধারণ প্রশাসনও অঘোষিতভাবে সামরিক ব্যবস্থাপনার আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।
- অফিস ব্যবস্থাপনায় সেকেলে সরঞ্জাম।
- টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উপজেলা সদরের বাইরে যায়নি এখনো।
- সকল এলাকা বিদ্যুতায়িত হয়নি।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।
- অনেক সংস্থার কোনো তথ্য সেল নেই।
- সরকারি ও বেসরকারিভাবে স্থানীয় পর্যায়ে এখনো ইতিবাচক নন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে।
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে পার্বত্য অঞ্চলের অনেকগুলো স্থানীয় সংস্থা কিছু জানে না।
- এ বিভাগের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, এ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- এখানে অবস্থিত সকল বিভাগের সমন্বয়।
- পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের কাছে এ আইনের ব্যাখ্যা শুধু বাংলা ভাষায় দিলে তা আদিবাসীদের জন্য বোধগম্য হবে না, ফলে এ আইনের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে।
- তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের অনীহা।
- সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি ও এনজিও (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা।
- আইনটি সকলের নিকট বোধগম্যভাবে পৌঁছানো। ভৌগোলিক ও ভাষাগত সমস্যা রয়েছে।
- সরকার এবং সরকারি কর্মকর্তা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ভীতি দূরীকরণ। কোনো তথ্যের কারণে যদি কর্মকর্তা বা প্রতিনিধি ক্ষুব্ধ হন, তাহলে তিনি ক্ষতি করতে পারেন– এরূপ একটি ভীতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে।

গ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার? সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা দরকার। যেমন– হাসপাতাল, ভূমি অফিস, পুলিশ বিভাগ।
- সনাক, টিআইবি চট্টগ্রাম ইতিমধ্যে এই বিষয়ে চট্টগ্রাম পাসপোর্ট অফিস, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল/চমেক হাসপাতাল ইত্যাদিতে ইতিমধ্যে সফলভাবে কাজটি করেছে।
- স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
- জনসচেতনতা তৈরির জন্য জাতীয় ও স্থানীয় মিডিয়াগুলোতে বিশেষভাবে প্রচার-প্রচারণা করা উচিত ব্যাপকভাবে।
- সরকারের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা জরুরি।
- কর্তৃপক্ষের সিটিজেন চার্টার সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পরিষ্কারভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা। সিটিজেন চার্টার না থাকলে তা প্রস্তুত করা।
- বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বোধগম্য ভাষাতে আইনটির সুবিধাগুলো পৌঁছানোর ব্যবস্থা দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠান অ্যাডভোকেসিতে সহায়তা দিতে পারবে।

- শুরু করতে গেলে মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির সাথে সাথে সমন্বয় স্থাপন করা।
- সাংবাদিকতার নীতিমালা অনুসরণপূর্বক আইনের সার্বিক প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- সংবাদকর্মীরা এ আইন সম্বন্ধে যেন সম্যক ধারণা রাখেন, সে উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন।
- জেলা থেকে প্রচারণা শুরু করতে হবে আইন সম্পর্কে।
- আমার প্রতিষ্ঠানের তথ্য সেল খোলার মাধ্যমে তথ্য আইন বাস্তবায়ন শুরু করা যেতে পারে।
- তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে সহায়তার উদ্যোগ নিয়ে।
- স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা যেতে পারে।
- আমার প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে www.ypsa.org তথ্য উন্মোচন করছে।
- তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি থেকে শুরু করা উচিত।
- সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগ প্রাপ্তির পর প্রশিক্ষণের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দেয়া দরকার।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেই প্রথমে শুরু হওয়া দরকার। পর্যায়ক্রমে ডাউনওয়ার্ড পর্যায়ে এটির বাস্তবায়ন হওয়া উচিত।
- আমার কর্মরত প্রতিষ্ঠান তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সর্বাধিক সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী।
- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা দরকার (জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়)।
- প্রতিষ্ঠান ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।
- তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ।
- সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- আমার প্রতিষ্ঠানে কাজটি শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল ও সুযোগের অভাব রয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইনটি তথ্য মন্ত্রণালয় করলেও তথ্য অফিসসমূহকে একটি তথ্য প্রদানকারী ইউনিট ছাড়া অন্য কোনো ভূমিকায় সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। করার সুযোগ আছে।
- প্রতিটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এর মাঠ পর্যায় থেকে হতে পারে।
- আমার প্রতিষ্ঠান থেকে অবশ্যই এই আইন মেনে চলে নাগরিক অধিকার জনগণকে জানাতে হবে, সেটা সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন প্রচারণামূলক সভা-সমিতি করে অগ্রসর হওয়া যায়।
- প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে শুরু করতে হবে
- নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে সংকলিত করে নেয়ার পর কম্পিউটারে নিয়ে আসার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ের দপ্তরগুলোকে তথ্য প্রদানকারী হিসেবে উপযুক্ত করে নেয়া।

- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে প্রারম্ভিক পর্যায়ে কার্যকরী Awareness বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।
- স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে তাদের দপ্তরে সেবা কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রচার করতে পারেন।
- আমার প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে সকল কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে জনগণকে জানানোর চেষ্টা করবে।
- তথ্য পেতে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অবশ্যই করব।

- সমাজে তৃণমূল পর্যায় থেকেই তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে এই আইনে জনগণকে প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হলে এবং এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা হলে এর বাস্তবায়ন সহজ হবে।
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ে কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।
- স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান তাদের দপ্তরে সেবা কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রচার করতে পারে।
- আমার প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে প্রকল্প এলাকায় ব্যাপকভাবে জনগণকে জানানোর চেষ্টা করবে।
- তথ্য পেতে আগ্রহীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান আমরা করব।
- পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, বিষয়টি বিবেচনা করা।
- বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সচেতনতামূলক প্রচারণার উদ্যোগ নেওয়া।

ঘ. এই বিভাগে কী ধরনের কার্যক্রম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে?

- সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে প্রধান করে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন কমিটি গঠন।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একজন করে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান।
- তথ্য কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মিডিয়াকে গঠনমূলক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- তথ্য প্রদানকারী সংস্থা/সংগঠনসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য অধিকার সম্পর্কে জানা।
- জনগণের এই আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর সমন্বয় সাধন।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব মানে না সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন। পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী গঠিত প্রতিষ্ঠান ও সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সমন্বয় ও কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করে সরকারি নির্দেশনা বিধিমালা প্রণয়ন।
- প্রশিক্ষণ।
- Develop MIS (Management Information System)
- লোকবল বৃদ্ধি।
- Record keeping system-কে শক্তিশালী করা।
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজড করা।
- জেলা পর্যায়ের সকল অফিসে এবং উপজেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে বাড়তি জনবল নিয়োগের মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব দিতে হবে।
- বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো কম্পিউটার ডাটাবেজে নিয়ে আসা।
- তথ্য সেল খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

- জেলা পর্যায়ে এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সংস্থা নিয়ে আইনি বাস্তবায়ন সম্পর্কে মতবিনিময় সভা করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করার ব্যাপারে আরো ব্যাপক প্রচার করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- বাস্তবভিত্তিক অ্যাডভোকেসি করা দরকার।
- এ আইনের বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোকে জনবান্ধব হতে আহ্বান জানানো।

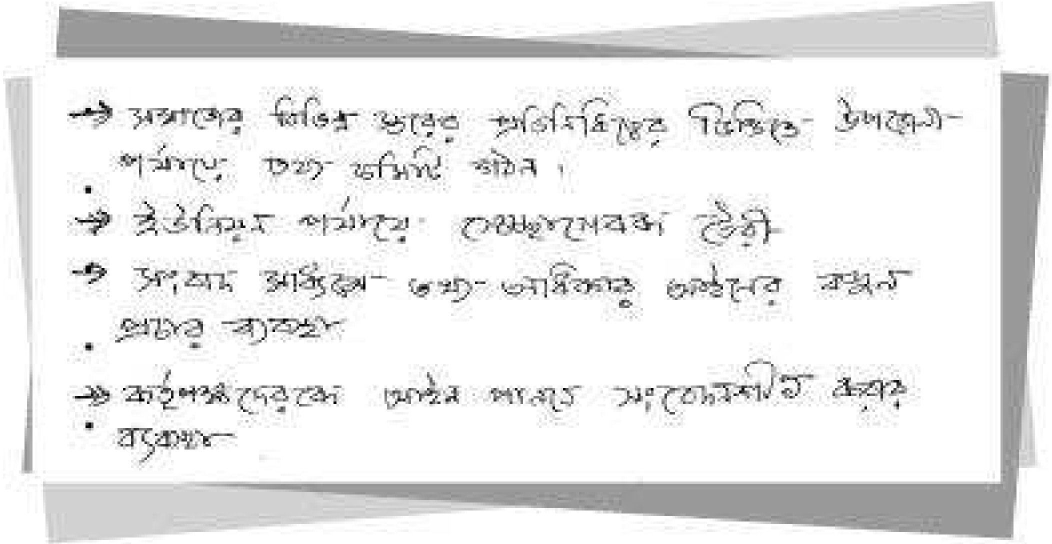

- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় এর ব্যাখ্যা পুনর্লেখনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- যেসব প্রতিষ্ঠান-প্রধানরা অনীহা প্রকাশ করবেন তাদের মধ্যে আস্থা আনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ের তথ্য কমিটি গঠন।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি।
- সংবাদমাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের বহুল প্রচার ব্যবস্থা।
- কর্তৃপক্ষদের আইন পালনে সংবেদনশীল করার ব্যবস্থা।
- সিভিল সোসাইটিকে আরো সচেতন ও অ্যাকটিভ হওয়া।
- গণ-উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা। এজন্য তথ্য অফিসসমূহকে equiped ও কাজে সংশ্লিষ্ট করা।
- সরকারি কর্মকর্তাদের আঞ্চলিক ভাষা অনুধাবনে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে সাংবাদিকদের আন্তরিকভাবে সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি করতে হবে; প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো নয়।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ওপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে আইনটি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে
- জেলায় দায়িত্ব পালনের জন্য দপ্তর স্থাপন বা কে ব্যবহার অথবা সেল গঠন করে আন্ত-প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।
- আইনটি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা/ক্যাম্পেইন আয়োজন করা যেতে পারে।
- গণমাধ্যমকে ব্যবহারের মাধ্যমে এই আইন কার্যকর বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
- প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য প্রদানকারী ফোকাল পারসন রাখতে হবে, এমন উদ্যোগ নেওয়া।
- সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের এ আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সচেতন নাগরিক সমাজের মাঝে আইনটির ব্যাপক প্রচার।
- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে বিলবোর্ড স্থাপন।
- তথ্য বিভাগের উদ্যোগে আইন-সম্পর্কিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী।
- সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচারমাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রকাশ ও প্রচার।

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল বিভাগীয় আলোচনা

৯ আগস্ট ২০১০, বিডিএস মিলনায়তন, বরিশাল

সঞ্চালক	: ফরিদ হোসেন ব্যুরো-প্রধান, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	: মইনুল কবির আইন বিশেষজ্ঞ
প্রধান অতিথি	: এস এম আরিফ-উর-রহমান জেলা প্রশাসক, বরিশাল

এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক

হাসিবুর রহমানের উদ্বোধনী বক্তব্য

এমআরডিআই মূলত কাজ করে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের মান উন্নয়নে। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ক্যাম্পেইনের সাথে এমআরডিআই সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই আইনটির খসড়া প্রণয়নের কমিটির সদস্য ছিল এমআরডিআই। আমরা প্রথমেই বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই আইনটি পাস করার জন্য। সংসদের প্রথম অধিবেশনে এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি পাস হয়।

এই আইনটির মধ্য সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা আছে; তবে আইন বাস্তবায়ন না শুরু হলে এই সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা দূর করা সম্ভব নয়। আমরা গত এক বছরে দেখেছি, এই আইন ব্যবহার করে মানুষ তথ্য চাইছে, তথ্য কর্মকর্তা তথ্য দিচ্ছেন— এমন বিষয়গুলো খুব একটা আলোচনায় আসেনি। আইন প্রণয়নের পরে গণমাধ্যমও এই আইন নিয়ে তেমন একটা কাজ করেনি। গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করতে তাই এমআরডিআই কাজ করছে। আইনটি সম্পর্কে ধারণা দিতে গণমাধ্যম ও এনজিও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করেছি। সরকারি কর্মকর্তা, বিশেষ করে দুর্নীতি দমন কমিশনের সারা দেশের ১০০ জন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে আমরা তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছি। এরপর আমরা কনট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করব, এর পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য কর্মকর্তদের এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মূল চ্যালেঞ্জ হলো, তথ্য প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের অনেকেই আইনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন না। সেজন্য তাঁদেরকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।

পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন বিভাগীয় পর্যায়ে এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোথায় কী সমস্যা আছে, কীভাবে এই আইন জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া যায়, কীভাবে এ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা যায়, কীভাবে এই আইন জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করা যায়, কোথায় এর সীমাবদ্ধতা এবং এই আইন বাস্তবায়নে কোথায় কী ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, সেসব বিষয় চিহ্নিত করছে।

ভৌগোলিক অবস্থানভেদে আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ভিন্ন কি না, তা বোঝার জন্য আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে যে মতবিনিময় সভা আয়োজন করছি, এই আজকের মতবিনিময় সভা তারই একটি। এখানে এনজিও কর্মকর্তারা আছেন, সরকারি কর্মকর্তারা আছেন, সাংবাদিক ও শিক্ষকবৃন্দ আছেন এবং বরিশালের নানা শ্রেণীপেশার মানুষ রয়েছেন। এটি আমাদের চতুর্থ মতবিনিময় সভা। আমরা দেখতে পেয়েছি যে একেক বিভাগে তথ্যচাহিদার ভিন্নতা রয়েছে। আজকে বরিশালে আলোচনার মধ্য দিয়ে এই আইন সম্পর্কে নানা বিষয় বেরিয়ে আসবে। আজকে আপনারা বরিশাল বিভাগে এই আইন বাস্তবায়নে করণীয়, সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করবেন।

সঞ্চালক

ফরিদ হোসেন

ধন্যবাদ, হাসিবুর রহমান। আমি সবাইকে স্বাগত জানাই, বিশেষ করে বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলা প্রশাসক এস এম আরিফ-উর-রহমান, যিনি আজকের আমাদের এই মতবিনিময় সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন। আজকের এই আলোচনায় সঞ্চালক হিসেবে আমি রয়েছি। এবং আজকের এই আলোচনায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ মইনুল কবির। তারপর আমরা মুক্ত আলোচনায় চলে যাব। তার আগে আমরা আমাদের সবার পরিচয় জেনে নিই। [পরিচয় পর্ব]। ধন্যবাদ, সবাইকে। পরিচয় পর্ব শেষ। এখন আমরা আমাদের প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসকের বক্তব্য শুনব।

প্রধান অতিথি

এস এম আরিফ-উর-রহমান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল

'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান, এই মতবিনিময় সভার সঞ্চালক সাংবাদিক ফরিদ হোসেন ভাই এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক আইন বিশেষজ্ঞ মইনুল কবিরসহ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই আলোচনায় মূলত আমরা আইন বিশেষজ্ঞ মইনুল কবির ভাইয়ের কাছে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে শুনব। এই আইন বাস্তবায়নে সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় কী- এসব বিষয়ে তিনি আমাদের বিস্তারিত বলবেন।

'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পাস হওয়ার পর শুনেছিলাম যে এটি তথ্য অধিকার বিষয়ে একটি আইন। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়ার পর থেকে অপেক্ষায় ছিলাম। এর কিছুদিন আগে এই আইনটির কপি আমার কাছে এসেছে। গতকাল এই আইনটি পড়ছিলাম। কিন্তু বিদ্যুৎ বারবার চলে যাওয়ার কারণে পড়া ভালো করে শেষ করতে পারিনি। এরকম একটা অনুষ্ঠানে আসার আগে একটা মানসিক প্রস্তুতি থাকে এবং সেই

প্রস্তুতি বিদ্যুতের কারণে সম্ভব হয়নি। একটু জেনেশুনে এলে ভালো হয়। কারো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিতে হয়। তাই সকালে উঠে এই আইনটা একটু চোখ বোলাই।

আমার কাছে এটি অসাধারণ লেগেছে। কিছুটা এভাবে বলা যায় যে, আমাদের একটি বড় সম্পদ আমাদের সংবিধান। এই সংবিধানে আমাদের যে মৌলিক অধিকার রয়েছে সেটি আমি বলব যে একটি অসাধারণ বিষয়। সংবিধানে আমাদের মৌলিক অধিকারের যে স্বীকৃতি রয়েছে তা আমাদের জন্য একটি বড় প্রাপ্তি। এ আইনটিও অসাধারণ। এই অধিকারের মধ্যে মানুষের বাকস্বাধীনতা একটি বড় বিষয়। মানুষের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা, বিনিময় করার ক্ষেত্রে এই বাকস্বাধীনতা আমাদের বড় একটি অধিকার।

অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে আমাদের তথ্য যদি আমরা তালাবদ্ধ করে রাখি, তাহলে সংবিধানের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন কী করে সম্ভব? বিশেষ করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধান যখন বলছে জনগণই রাষ্ট্রের মালিক বা ক্ষমতার উৎস। সাংবিধানিক এই অধিকার তখনই নিশ্চিত হয় যখন জনগণের সাথে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ থাকে। তথ্যপ্রবাহের যুগে মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত হলো কি হলো না, এ ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম ও সাংবাদিক বন্ধুরা।

এই আইনটি অনেক পরে হলেও একটি যুগোপযোগী একটি আইন। আমি মনে করি, এই আইনটির প্রয়োজন ছিল। বিশ্বব্যাপী যে তথ্যপ্রবাহের যুগের সূচনা হয়েছে, সেই চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশে এই আইনটি এসেছে। এ আইনের যে বিষয়গুলো রয়েছে তা চমৎকার। এই আইনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। তথ্য প্রদানের একটা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এই আইনের এটাই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী বিষয়। মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেল। যারা তথ্য প্রদান করবে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের তথ্য দেওয়া আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে।

এই আইনের কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। তা ছাড়াও আমাদের অভ্যাসগত, আচরণগত কিছু সমস্যা রয়েছে। যে কারণে এই আইন বাস্তবায়নে মন্থর গতি দেখা দিয়েছে। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। এই আইন বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তিপর্যায়ে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। এই আইনের ব্যর্থতা-সফলতা নির্ভর করে আমাদের ওপর, এই আইন প্রয়োগের ওপর। সবকিছু মিলিয়ে এই আইন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, একটি আইন প্রথমে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ হয় না। এটি ধীরে ধীরে প্রয়োগের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করবে। একটি আইন বিভিন্ন বাস্তবতার নিরিখে প্রণয়ন হয়। আইনে সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে। তবে তা আমাদের প্রয়োগের ওপর নির্ভর করবে এর সুবিধা ও অসুবিধা। এভাবে একটি আইনে ব্যবহারের মাধ্যমে সংশোধন, সংযোজন এবং পরিবর্তন হয়ে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে।

এই আইন বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞ মইনুল কবির ভাইয়ের কাছে শুনব। আজকে আসলে এর বাইরে কথা বলা প্রস্তুতি আমার নেই। প্রস্তুতি থাকলেও আইনের বিশ্লেষণ সবাই পারে না। যারা আইনের বিশ্লেষক তারাই মূলত আইন ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন। আমি মূলত একজন শ্রোতা হিসেবে শুনব।

আমার মনে হয় যে একটু পরেই আমরা খোলামেলা আলোচনায় যাব এবং সেখানে তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে আমার বিরুদ্ধে আলোচনা আসবে। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভুলগুলো সঠিক করে নিতে পারব এবং আমাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাব। অনেক বিষয় আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে, আমাদের ভুলগুলো বুঝতে পারব এবং একটা ভালো বোঝাপড়া গড়ে উঠবে।

ফরিদ হোসেন

প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ। তিনি বলেছেন এটা একটা যুগোপযোগী আইন। এটি একটি যুগান্তকারী আইনও বাংলাদেশের জন্য। শুধু তথ্য পাওয়াই নয়, সেই সাথে প্রশাসনের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত হবে। এই আইনের মাধ্যমে আমাদের দেশের দুর্নীতি কমে আসবে। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে। আমাদের সংবিধানে যে বাকস্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তা এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে পারব।

আমরা এই আইনের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ে আইন বিশেষজ্ঞ মইনুল কবিরের কাছে মূল আলোচনা শুনব। তার আগে একটা বিষয় বলে নিই; তা হলো, আপনাদের সামনে প্রশ্ন-সংবলিত চারটি কাগজ আছে, যেখানে আপনারা ১. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বরিশাল বিভাগে কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে? ২. এ ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠান কী করবে? ৩. কী ধরনের কাজ করলে এই আইন বাস্তবায়ন করা সহজ হবে? ৪. বরিশাল বিভাগে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এবং গত এক বছরে এই আইনের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে? এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের মতামত লিখে দেবেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক

মইনুল কবির, আইন বিশেষজ্ঞ

সকলকে ধন্যবাদ। আমি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে মোটা দাগে যে আলোচনা করব তার একটি অনুলিপি আপনারা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছেন। আমাদের বাংলাদেশের ভিত্তি, মৌলিক অধিকারের ভিত্তি, এবং আমাদের অন্যান্য যা কিছু আছে, সবকিছুরই মূল উৎস হচ্ছে সংবিধান। আপনারা জানেন, ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের সংবিধান পেয়েছি। তার আগে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ, সে মুক্তিযুদ্ধের সময়টা আমি আমার এই উপস্থাপনায় উল্লেখ করেছি। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংবিধান তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

1. Proclamation of Independence, 10 April 1971
2. Laws Continuance Enforcement Order, 10 April 1971
3. Provisional Constitution Bangladesh Order, 1972 (11 January 1972)

এই তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আমাদের যতগুলো অধিকার আছে, আইন আছে সবই এই তিনটি ভিত্তির ওপরে। এই তিনটি দলিলের ওপর ভিত্তি করে আমাদের সব অধিকার সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা যদি তথ্য অধিকার আইনটা দেখেন, তার মধ্যে এই প্রস্তাবনার বিষয় রয়েছে। আমরা সাধারণত যখন আইন করি, তখন বলি, যেহেতু আইনটা সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সেহেতু আইনটা করা হলো। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনটা যখন করা হলো তখন এর প্রস্তাবনাটা একটু বড় আকারে ও বিস্তারিতভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। যেই প্রস্তাবনাটা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে আছে। কারণ হলো সংবিধান ঘোষণা করেছে, প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। আমি না, জেলা প্রশাসক না, সাংবাদিক ফরিদ হোসেন না, হাসিবুর রহমান না, আসলে ব্যক্তিগতভাবে প্রজাতন্ত্রের মালিক কেউ নয়— আমরা সবাই।

এই যে প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ, আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায়– সংবিধানে, আইনে, মৌলিক অধিকারে ও নাগরিকত্বে জনগণকে হাইলাইট করা হয়েছে। যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার আমাদের যে অধিকার রয়েছে তা এই তথ্য অধিকার আইনে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নাগরিকের যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, এই নাগরিক কে? এই নাগরিক আমরা সবাই। জনসাধারণ। এই নাগরিকের মধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের সংবিধানে নাগরিকের অধিকার (আর্টিকেল ১ ও ২ এ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত আছে। নাগরিক কে? সেটা সংবিধানে পরিষ্কার উল্লেখ আছে। Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, P.o 149 of ১৯৭২-এ নাগরিক সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে।

সংবিধানের প্রাধান্য মানেই হচ্ছে নাগরিকের প্রধান্য। আমি যেটা বলেছি সংবিধানের প্রাধান্য, কেন? আর্টিকেল ৭-এ এই নাগরিকের প্রধান্যের কথা বলা হয়েছে। কোনো আইন রাষ্ট্র করবে বা করেছে, সেই আইন যদি সংবিধানের সাথে বা কোনো আইনের বিধানের সাথে এমনকি সংবিধানের কোনো অংশের সাথে যদি প্রণীত আইনটি সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে ওই সাংঘর্ষিক অংশ বাতিল হবে বা বাদ পড়ে যাবে। এটা মেনডেট রুলস। এটাকে নতুন করে ঘোষণার কিছু নাই।

আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের যে অংশ আছে, তার আগে মূলনীতির একটা অংশ আছে। ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল আরেকটা ফান্ডামেন্টাল ওয়াইজ। ফান্ডামেন্ট অব প্রিন্সিপল যেখানে আছে সেইখানে কিন্তু গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সেখানে অধিকার ও কর্মের কথা বলা আছে।

নাগরিকের যে সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যে সেবাটা আমি বা আপনি দেবেন, সেটা অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম। অনুচ্ছেদ ২০-এ বলা আছে, সেবাটা আমার তাকে দিতে হবে। এই বিষয়গুলো আমাদের সংবিধানে উল্লেখ আছে। তাই আমাদের কাজটা হলো নাগরিককে সেবা

দেয়া। নাগরিক যে তথ্য চাইবে বা জানতে চাইবে সে তথ্য দেয়া আমাদের কর্তব্য। এটা সংবিধানে বলা আছে। এটা সব আইনে বলা আছে। সর্বশেষ আমাদের যে তথ্য অধিকার আইন আছে, এই আইনে এটাকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন খুবই সাধারণ মানুষ, তার প্রয়োজনীয় একটা ছোট তথ্য দরকার, সেই তথ্য যাতে সে পায়, এজন্য তথ্য অধিকার আইন। এবং তথ্য প্রদানকারী যাতে ওই তথ্যটি দিতে বাধ্য থাকেন, সেজন্যও এই আইন। একটা ছোট উদাহরণ দিই। আমি একদিন কোর্ট শেষ করে যখন কোর্টের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছি তখন দেখি, আমাদের একজন আইনজীবী তার এক মহিলা মক্কেলের কাছে একটি তথ্য গোপন করছেন এবং বলছেন, আপনার ছেলে যে মামলায় পড়েছে তা থেকে ওকে বাঁচানো বা ছাড়ানো মুশকিল। ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন আইনে ধরা পড়েছে? আইনজীবী বললেন, DMP অর্ডিনেন্সে ধরা পড়েছে। মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, DMP কী? আইনজীবী বললেন, ডেথ, মার্ডার, পানিশমেন্ট। ওই মহিলাকে বোঝানো হলো এটা মারাত্মক কেস। মানে ওই আইনজীবী তার কাছে তথ্য গোপন করে ভুল তথ্য দিয়েছেন, তার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায়ের জন্য।

আমরা যারা শিক্ষিত, আমাদের মৌলিক বিষয়টা হচ্ছে জ্ঞান। আর তথ্য হচ্ছে জ্ঞানের বাহন। এই জ্ঞান যে মানুষের থাকবে, সে বিনয়ী হবে। সে মানুষের কাছে সহজ হবে। সে খুব সাধারণভাবে মানুষের সাথে মিশবে। কিন্তু আমরা যারা এই জ্ঞানটাকে ধারণ করছি না, তারা কি কখনো একবার চিন্তা করি, কেন এই জ্ঞানটাকে অন্যদের দিচ্ছি না বা জানাচ্ছি না? এই জ্ঞান দেয়ার জন্য বা জানানোর জন্য কেন এতগুলো আইনের দরকার হয়? কারণ আমরা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো পালন করি না।

প্রজাতন্ত্রের সকল মালিক যে জনগণ, এবং এদেরকে সেবা করার মৌলিক দায়িত্ব যে আমাদের এবং এ দায়িত্ব যে আমাদের কর্তব্যকর্ম তা পালনের জন্য সংবিধান আমাদেরকে বারবার বলছে। এবং এই সংবিধানকে সমর্থন করছে অন্যান্য আইনগুলো। এই তথ্য অধিকার আইন বহু বছর ধরে আমরা চেষ্টা করেছি প্রণয়ন করতে। এটা আমাদের বহু দিনের সাধনার ফল। অথচ ১৯৭২-এর সংবিধানে এই সাধনার ফসলটা পেয়েছি। যেখানে এই আইনের ইঙ্গিত রয়েছে। এই সাধনার ফসলটা প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে পারি নাই। কিন্তু কেন? এই কেনই হচ্ছে আজকে আমাদের সমস্যা। প্রথম সমস্যা হচ্ছে সেবা প্রদানে অনীহা। সেবা প্রদানে আমরা আগ্রহী নই। এর ফলে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে যে কর্মকাণ্ড আছে তা যেন মানুষ জানতে না পারে, তার জন্য একটা দেয়াল তৈরি করে দেয়। আমি কেন স্বচ্ছ হব না?

আমি একটা ছোট গল্প বলছি। হিন্দু শাস্ত্রে একজন মনীষী ছিলেন, তার নাম জাগোগল্প। এই জাগোগল্পের কাছে এক রাজা এসেছিলেন। এই রাজার কোনো কিছু ভালো লাগছিল না তাই। তিনি জাগোগল্পের তার ভালো না লাগার কথা। বললেন, আমার রাজ্য চলে গেছে, ধন-সম্পদ চলে গেছে, আত্মীয়স্বজন চলে গেছে, আমার জীবন সুখ-শান্তি চলে গেছে, দিন চলে গেছে, আমার জীবন-সূর্য ডুবে যাচ্ছে; এখন আমি কী নিয়ে বাঁচব? জাগোবাবু বললেন, আপনি আপনার আত্মজ্যোতি নিয়ে বাঁচবেন। এই জ্ঞানজ্যোতি যদি আপনার-আমার থাকে, তাহলে আমরা বিনয়ী হব। আমরা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করব। কিন্তু কেন করি না? কারণ আমাদের জ্ঞানের অভাব। এই জ্ঞান অর্জনের জন্য নিজেকে জানতে হয়। দার্শনিক সক্রেটিস বলেছিলেন, নিজেকে জানো। আমাদের নবী বলেছেন, যে নিজেকে চিনবে সে আল্লাহকে চিনবে। জ্ঞানে বিষয়টা হলো নিজেকে জানা। আর তথ্য ছাড়া আপনি কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন না। নিজেকে জানা ও চেনার মূল সূত্র হলো তথ্য। জ্ঞান অর্জন করে সেবা প্রদানের মানসিকতা তৈরি না হলে ওই জ্ঞানের কোনো মানে নেই। আমাদের সেবা প্রদানের মানসিকতা থাকতে হবে, তৈরি করতে হবে।

এই আইনের উদ্দেশ্য হলো জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়নের বাস্তবায়ন। আর জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত বা বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই তথ্য দরকার। তথ্য ছাড়া জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন সম্ভব না। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ আইন করা হয়েছে।

এই আইনের তিনটি পক্ষ রয়েছে। ১. নাগরিক (যারা তথ্য চাইবে) ২. কর্তৃপক্ষ (তথ্য প্রদানকারী, তথ্য ইউনিট) ৩. নাগরিক ও কর্তৃপক্ষ মধ্যে যারা পড়ে না, তারা। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের বাইরে যে বা যার কাছে তথ্য পাওয়া যাবে, তারা তৃতীয় পক্ষ। তার মানে হলো এই তিনটা পক্ষের একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। এই সমন্বয়টা করবে কে? এই সমন্বয়টা করবে হলো আমাদের সেবা প্রদানের মানসিকতা। আমি যে জায়গায় বসে আছি, আমাকে মনে করতে হবে এই জায়গাটা আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এটা আমার দায়িত্ব পালনের জায়গা। আমার কাছে

মানুষ এসে তথ্য চাইবে এবং আমি ওই তথ্য তাকে দিতে বাধ্য। কারণ জনমানুষের টাকায় এই রাষ্ট্র চলে এবং সেই রাষ্ট্রের আমি একজন কর্মকর্তা। আমার বেতন হয় জনগণের টাকায়। আমার সন্তানের চিকিৎসা, পড়াশোনা সবই হয় জনগণের দেয়া টাকায়। সেই জনগণকে আমি আমার দায়িত্ব পালন করে তার অধিকার কীভাবে বাস্তবায়ন করব? সংবিধান তাই আমাকে আমার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধক করেছে। তাই আমি তথ্য দিতে বাধ্য। জনগণের অধিকারগুলো তাদেরকে জানাতে হবে। এই অধিকারগুলো জানানোর জন্য এখন আইনগতভাবে রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে বাধ্য করা হয়েছে।

সেবা প্রদানে অনীহার কারণ সঠিক জ্ঞানের অভাব। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কতটুক তথ্য দেয়া উচিত, সেটা এই আইনের ধারা ৬, ৭-এ বলেছে। আবার এই আইনের ধারা ৮, ৯-এ কী কী তথ্য প্রদান করা যাবে না, তা বলা হয়েছে। মানুষ যখন আমার কাছে আসবে তখন তাকে তথ্য দিতে হবে। আর যে তথ্য আমার কাছে নেই অথবা কোথায় আছে আমি জানি, এরকমের তথ্য ওই তথ্য আবেদনকারীকে জানাতে হবে যে আপনি কোথায় গেলে এই তথ্যটি পেতে পারেন। আর একেবারে যে তথ্য আমার কাছে নেই, তাও তথ্য গ্রহণকারীকে বলে দিতে হয়। অথবা আমি এই এই তথ্যগুলো আগামী ২০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করে দেব।

সেবা প্রদানের নামে আমরা দুর্নীতি করি। আপনারা দেখবেন যে রাষ্ট্রের যতগুলো নিবন্ধন অফিস আছে সেখানে ফাইল আটকিয়ে দুর্নীতি করা হচ্ছে। কাগজ ঠিক করতে, রেজিস্ট্রেশন করতে, লাইসেন্স করতে কত টাকা ফি এবং আনুষঙ্গিক খরচ তার সঠিক তথ্য দিচ্ছে না।

আপনারা যদি ধরেন কাজি অফিসের কথা। গ্রামে বা শহরে প্রতিদিন কাজি সাহেব বিয়ে পড়ান। কিন্তু কোনো কাজি সাহেবই বিয়ের রাষ্ট্র-নির্ধারিত ফি বর ও কনেপক্ষের কাউকে জানান না। বরং তিনি নিজে একটা উল্টো ফি ধার্য করে নেন। এ ক্ষেত্রে জনগণ যদি কোনো বিষয় জানতে চাইত তা তিনি বলতেন না। আর এখন এই তথ্য অধিকার আইন হওয়ার কারণে তারা তথ্য দিতে বাধ্য। না দিলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে। কিন্তু উনি যদি তার নিবন্ধন অফিসে একটি বিলবোর্ডে বিয়ের বিষয়ে তথ্য দিয়ে রাখতেন, তাহলে আর জনগণকে বেশি টাকা দিতে হতো না। এবং অনেক সময়ও বাঁচাতে পারত। এতে করে একটা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা থাকত। আর যদি আমাদের মধ্যে সেবা প্রদানের মানসিকতা তৈরি হয়, তাহলে আমরা যে তথ্য দেয়া যাবে তা এমনিতেই দেব।

পুলিশ যে বিষয়টি ইতোমধ্যে করেছে, তারা শহরের প্রতিটা রাস্তার মোড়ে মোড়ে তাদের কাছে জরুরি ফোন করার জন্য পুলিশ কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছেন। যাতে মানুষ তার প্রয়োজনে পুলিশকে পায়। কোনো দুর্ঘটনা হলে যাতে জনগণ জানাতে পারে।

আমি কী তথ্য চাইতে পারি, কী তথ্য দিতে পারি, কতটুকু দেব, কাকে দেব, কেন দেব– এসব বিষয় এই আইনে রয়েছে। এবং আমাদের জানতে হবে।

তথ্য সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে : ধারা ৫-এর (১) তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করবে। (২) যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায় তা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য পাওয়ার সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমগ্র দেশে তার সংযোগ স্থাপন করবে। (৩) তথ্য কমিশন তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে এবং তা সকল কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করবে।

জনগণ কোথায়, কীভাবে, কখন তথ্য পাবে? কার কাছে পাবে? কী মাধ্যম পাবে? এটা জনগণ জানবে কার কাছে এবং কী করে? জানানোর দায়িত্ব আমাদের। এই ধরনের তথ্যগুলো জনগণকে আমাদেরই জানাতে হবে। সবার ইন্টারনেটে যাওয়ার সুযোগ এখনো নাই। তাহলে কী পদ্ধতিতে জনগণ তথ্য জানবে? সেটা জানাবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমাদের আছে কি না? আমি আগেই বলেছি, আমাদেরকে জনগণকে সেবা দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের নিজ দায়িত্বে জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে আগ্রহী হব।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি রেকর্ড রুম আছে, যেটা আজ থেকে এক শ বছরের পুরোনো। প্রশাসন যত পুরোনো, জমিসংক্রান্ত রেকর্ড তত পুরোনো। আপনি যদি ওখানে জায়গা-জমি সম্পর্কে কোনো তথ্য চান তা পাবেন। কিন্তু এজন্য আপনাকে অনেক টাকা দিতে হবে। অথচ ওই তথ্যগুলো কাগজে ছাপানো থাকে, যা সরকার খুব অল্প মূল্যে জনগণকে সরবরাহ করার জন্য দিয়েছে। আর সরকারি কর্মকর্তারা তা মানছেন না। অথচ একটা বিলবোর্ডে RRDC (জমিসংক্রান্ত রেকর্ড) কী কী সেবা বা ইনফরমেশন দেবে তা রাখতে পারে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

হাসিবুর রহমান

তথ্য প্রকাশ প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে : ধারা ৬-তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রকাশের সময় কর্তৃপক্ষ কোনো তথ্য নিয়ন্ত্রণ বা লুকাতে পারবে না। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। এই আইনে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাও এই আইনে বলা আছে।

প্রতিটা প্রতিষ্ঠানে তার তথ্য জানানোর জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব কতটুকু? আইন অনুযায়ী প্রতিটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিওতে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে। আসলে এটা কি আমরা করেছি? না। কেন? কারণ আমরা মানুষকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক নই।

মৌলিক অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য তথ্যের স্বীকৃতি প্রয়োজন। এই আইনটা পাশের আগে আমাদের সে স্বীকৃতি ছিল না। আগে যেটা ছিল সেটা একটি পরোক্ষ স্বীকৃতি। সেখানে কাউকে বা কোনো সংস্থাকে কোনো বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করা যেত না। এখন সেটা আইনে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে আপনি বা আমরা আমাদের কোনো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না হলে তার জবাবদিহিতা চাইতে পারব। এবং রাষ্ট্র এ ব্যাপারে আইনগতভাবেই জবাবদিহিতা দিতে বাধ্য।

মইনুল কবির

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ১০-এ বলা হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য প্রদান, তথ্য প্রকাশ ও নাগরিক কর্তৃক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন। তথ্য প্রদানে অবহেলা করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সর্বনিম্ন ৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫০০০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। এটা বিভাগীয় মামলার বিধান।

দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব কী হবে? এ দায়িত্ব সে কোথায় পালন করবে? কীভাবে করবে? সে বিষয়ে এই আইনে বলা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার প্রতিষ্ঠানের তথ্য সবার চেয়ে বেশি জানেন। আপনি আমি অন্য প্রতিষ্ঠানের তথ্য জানব এবং তা জনগণকে জানাব এর চেয়ে বরং এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা জানালে সবচেয়ে ভালোভাবে সকল তথ্য জানাতে পারবেন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যদি নিজ উদ্যোগে তার তথ্যগুলো জনগণকে জানায়, তাহলে এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সহজ হবে। তথ্য অধিকার আইনেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নিজ উদ্যোগে তার তথ্যগুলো প্রকাশ করার জন্য বলেছে।

এই আইনে বলা হয়েছে, যদি কেউ তথ্য নাও চায়, তাহলেও কিছু মৌলিক তথ্য জনগণের কল্যাণের জন্য সব প্রতিষ্ঠান স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে। তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান তার কাজ-কর্ম ও হিসাবের স্বচ্ছতা প্রকাশ করবে। এতে করে জনগণ জানতে পারবে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

কী তথ্য কারা দিতে বাধ্য নয়, তা জানতে ধারা ৯(৯) না পড়লে শুধু ধারা ৭ কমপ্লিট হবে না। এতে তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে বলা আছে, কতিপয় তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়। ২০টি পরিস্থিতিতে তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। তবে এ ধারার সাথে ধারা ৯(৯) পড়তে হবে। যতটুকু তথ্য প্রকাশ বা প্রদান করা সম্ভব তা প্রকাশ বা প্রদান করা যাবে। রাষ্ট্রের অনেক গোপন তথ্য রয়েছে যা প্রদান করলে রাষ্ট্র ও জনগণের ক্ষতি হবে, এমন তথ্য রাষ্ট্র দিতে বাধ্য নয়। ধারা ৯(৯) অনুসারে কর্তৃপক্ষ আংশিক তথ্য প্রকাশ করতে পারে। সম্পূর্ণ তথ্য প্রকাশ না করলে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

সরকারি কিছু সংস্থা রয়েছে যারা এই আইনের আওতায় পড়ে না; যেমন– এনএসআই, ডিজিএফআই, সিআইডি, এসএসএফ ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গোয়েন্দা সেল, এসবি ও র‍্যাব। তবে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে ও দুর্নীতি বিষয়ে এই আইনের আওতায় এ ধরনের সংস্থাগুলোও তথ্য দিতে বাধ্য।

ধারা ৮-এ বলা হয়েছে, নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে বা ই-মেইলে আবেদন করা যাবে। বিনা মূল্যে, স্বল্পমূল্যে, প্রকাশনা-মূল্যে তথ্য প্রদান করার বিধান রয়েছে। তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯-এর বিধি ৮ ও ফরম 'খ'-এ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি উল্লেখ করা আছে। তা ছাড়াও এই আইনের ধারা ৮(৫)-এ কোনো ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণীকে সরকার কর্তৃক তথ্যের মূল্য প্রদান থেকে অব্যাহতির বিধান রয়েছে।

তথ্য প্রাপ্তি প্রসঙ্গে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এ বলা হয়েছে : ধারা ৮ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন। তথ্য প্রাপ্তির জন্য তথ্য প্রদানকারী ইউনিটে প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে হবে।

তথ্য প্রদান প্রসঙ্গে ধারা ৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের তারিখ থেকে ২০ কর্মদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে। একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হলে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যদি আবেদন বাতিল করে, তাহলে তা ১০ দিনের মধ্যে জানাবে।

ধারা ২৪ অনুসারে কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য না পেলে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আচরণে ক্ষুব্ধ হলে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হওয়ার পরে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে হবে।

ধারা ১৩ অনুসারে তথ্য সংগ্রহ সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে তা তথ্য কমিশনের কাছে জানাতে হবে। তথ্য কমিশনের স্থানীয় বা প্রধান কার্যালয়ে জানাতে হবে। প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত।

তথ্য প্রদান পদ্ধতির ইতিবাচক দিক হলো সময়সীমা নির্ধারণ। তথ্য প্রদান এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রদান এবং প্রাপ্তি নিশ্চিত করা মূল কর্তব্যকর্ম।

নাগরিক কার কাছে বা কোথায় তথ্য পাবে সে সম্পর্কে আইনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদের প্রণীত কার্যবিধিমালার অধীন গঠিত সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া, সরকারি তহবিল থেকে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান, এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয় : আইন, সংসদ, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, জ্বালানিসহ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ হিসেবে তথ্য দিতে বাধ্য। সরকারি তহবিল থেকে সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন– স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বায়ত্তশাসিত সকল প্রতিষ্ঠান নাগরিককে তথ্য দিতে বাধ্য। বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন– এনজিও ও বিভিন্ন সংস্থা তথ্য দিতে বাধ্য। সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান, যেমন– জেলা পরিষদ, উপজেলা বা থানা ও সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নাগরিককে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। এ ছাড়া, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সরকারের পক্ষে কোনো সেবা নাগরিককে দিচ্ছে, তারাও তথ্য দিতে বাধ্য। সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এই আইনের বিধান অনুসারে নাগরিককে তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে।

তথ্য প্রদান ইউনিট বা তথ্য সংগ্রহের কার্যালয়গুলোকে কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, জেলা কার্যালয় বা উপজেলা কার্যালয়ে ভাগ করা হয়েছে। এসব জায়গায় তথ্য পাওয়া যাবে। তথ্য প্রদানের ইউনিটগুলোতে তথ্য না পাওয়া গেলে ঐ প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তথ্য পাওয়া যাবে।

জনাব মইনুল কবির তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বেশকিছু সমস্যা চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, জনগণকে সেবা প্রদান প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য, আর রাষ্ট্রের কর্মচারী কর্মকর্তাগণের মৌলিক কর্তব্য কর্ম। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সেবা প্রদানে অনীহা সবচেয়ে বড় সমস্যা।

নাগরিক জানে না তথ্য অধিকার কী, তথ্য কমিশন কী, কর্তৃপক্ষ কারা, এই আইন কবে কার্যকর হয়েছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কারা, তথ্য প্রদান ইউনিট কী, ইত্যাদি। অর্থাৎ এসবের তথ্যগত সঠিক জ্ঞানের অভাব একটি বড় সমস্যা।

আইনে দ্বিতীয় পক্ষ ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে দায়িত্বের অস্পষ্টতা রয়েছে। তথ্য ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, কোন তথ্য দেয়া যাবে আর কোন তথ্য দেয়া যাবে না সে বিষয়ে দ্বিতীয় পক্ষ ও তৃতীয় পক্ষের দায়িত্ব অস্পষ্ট।

তথ্য প্রদানে বিভিন্ন আইনি বাধা রয়েছে, যেমন– Official Secrets Act-1923, Rulels of Business, 1996, Public Servants Conduct Rules, 1979। প্রচলিত অন্যান্য আইনের ওপর তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও এগুলি এখনো বাধা হিসেবে রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ও প্রচলিত আইন সমভাবে প্রযোজ্য।

তথ্য প্রদানে পদ্ধতিগত কারণে সময়ক্ষেপণ আরেকটি প্রতিবন্ধকতা। বিভিন্ন ধারায় (ধারা ৯, ১০, ২৪ ও ২৫) তথ্য প্রকাশ ও প্রদানে সময়সীমা নির্ধারণ করা সত্ত্বেও চূড়ান্তভাবে একটি সাধারণ তথ্য পেতে পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে সর্বসাকুল্যে সর্বোচ্চ ২১০ দিন বা সাত মাসেরও বেশি সময় লেগে যেতে পারে, ফলে যেকোনো নাগরিকের তথ্য পাওয়ার আগ্রহ নষ্ট হতে পারে।

মৌলিক অধিকার হওয়ার কারণে তথ্য প্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হলে বা চূড়ান্ত বিচারে সকল পদ্ধতি নিঃশেষ করে তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন রিট মামলা করলে কত দিনে তা নিষ্পত্তি হবে তা অনির্দিষ্ট, ফলে মৌলিক অধিকার বলবৎ করাও দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করলে প্রজাতন্ত্রের মালিক তথা জনগণ/নাগরিকের সাধারণভাবে যেসব সুবিধা হবে সেগুলো হচ্ছে :

- মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন
- জীবনমান উন্নয়নের সাথে জড়িত তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি
- সরকারি/বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি
- দুর্নীতি হ্রাস, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ
- তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের জনগণের প্রত্যক্ষ ক্ষমতায়নের সুযোগ প্রশস্তকরণ, এবং
- রাষ্ট্রপরিচালনার সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত করণীয়গুলি জরুরি মনে করেন :

ক. মানব সম্পদ প্রস্তুতি

- ✓ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ
- ✓ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- ✓ বিদ্যমান তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনার মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন
- ✓ অভ্যন্তরীণ নীতিমালা প্রস্তুত বা হালনাগাদকরণ
- ✓ প্রতিষ্ঠানের সব কর্মীবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করে তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সৃষ্টির জন্য উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

খ. তথ্য প্রকাশের নীতিমালা প্রণয়ন

- ✓ প্রতিষ্ঠানের সব তথ্যকে শ্রেণীবদ্ধ করা
- ✓ একটি কমিটি গঠন করে দায়িত্ব দেয়া
- ✓ অপ্রকাশিত তথ্য, যেগুলি চাইলেও দেয়া যাবে না, তা শ্রেণীবদ্ধকরণ
- ✓ প্রতিষ্ঠানের কোন কোন তথ্য কীভাবে সবাই পেতে পারে এবং এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে তা চিহ্নিত করে ওয়েবসাইটে, প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে ও লিফলেট আকারে প্রকাশ করা
- ✓ তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বিধিমালা তৈরি করা হলে সে অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা।

গ. পরিমাণগত কর্মপ্রক্রিয়া

- ✓ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বিধিমালা প্রণয়ন ও প্রকাশ করার সময়কাল নির্ধারণ
- ✓ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা, যেখানে আইন অনুযায়ী তথ্যপ্রদান ইউনিট গঠিত হয়েছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত হয়েছেন তার তালিকা প্রস্তুতকরণ
- ✓ সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহের সংখ্যা, যারা আইন অনুযায়ী আইন প্রণয়নের পরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ প্রদান করেছেন তার তালিকা প্রস্তুতকরণ
- ✓ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা, যেমন :
  - খাতভিত্তিক তথ্য প্রদানের অনুরোধের সংখ্যা
  - প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য প্রদানের অনুরোধের সংখ্যা
  - খাতভিত্তিক অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের সংখ্যা

- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের সংখ্যা
- খাতভিত্তিক অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে অপারগতা/অস্বীকৃতির সংখ্যা
- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে অপারগত/অস্বীকৃতির সংখ্যা
- প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে খাতভিত্তিক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপিলের সংখ্যা ও আপিল নিস্পত্তির সংখ্যা
- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপিল ও আপিল নিস্পত্তির সংখ্যা
- তথ্য কমিশনে অভিযোগের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)
- তথ্য কমিশনে খাতভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অভিযোগ নিস্পত্তির সংখ্যা
- তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতির কারণে জরিমানার সংখ্যা (খাতভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)
- তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি কারণে জরিমানার সংখ্যা (খাতভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)
- তথ্য সরবরাহের গড় মূল্য (খাতভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক), তথ্যের ধরন অনুযায়ী
- প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট বা বিশেষ প্রকাশনার সংখ্যা এবং ধারা ৬ অনুসারে তথ্য প্রকাশের মাত্রা
- তথ্য অধিকার আদায়ে নাগরিকের গড় খরচের পরিমাণ (খাতভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক)
- তথ্য প্রদানে অনুরোধকারী নাগরিকের পরিসংখ্যানঃ গ্রাম/শহর (ভৌগোলিক অবস্থান), পুরুষ/নারী (লিঙ্গ), দারিদ্র/দরিদ্র নয় (আয়), বয়স, পেশা, ধর্ম, জাতীয়তা
- তথ্য অধিকার আদায়ে সক্রিয় সংগঠনের সংখ্যা (খাতভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক)

ঘ. গুণগত কর্মপ্রক্রিয়া

- ✓ তথ্য প্রদানে অপারগতা/অস্বীকৃতির পক্ষে যুক্তিসমূহ (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং তথ্য কমিশনের ক্ষেত্রে, খাতভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক)
- ✓ তথ্য কমিশন আইনের ধারাসমূহের অনুসরণের মাত্রা
- ✓ অনুরোধকৃত তথ্য প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আপিল না করার কারণসমূহ
- ✓ তথ্য সরবরাহের মূল্য তথ্য অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে কি না
- ✓ অপর্যাপ্ত শাস্তি তথ্য প্রদানের অনীহার কারণ হয়েছে কি না
- ✓ আইনের অজুহাত তথ্যের প্রাপ্তি প্রতিবন্ধকতা বেড়েছে কি না
- ✓ তথ্য প্রদানের নিয়মাবলির অস্পষ্টতার মাত্রা
- ✓ তথ্য অধিকার আদায়ে অনুরোধকারী নাগরিকদের প্রণোদনাসমূহ
- ✓ আইন প্রণয়ন পরবর্তীকালে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাত্রা।

ঙ. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মপ্রক্রিয়া

- ✓ তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ
- ✓ আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ
- ✓ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ
- ✓ প্রকাশযোগ্য ও অপ্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা
- ✓ প্রকাশযোগ্য তথ্যের মধ্যে স্বপ্রণোদিত তথ্য ও অনুরোধ প্রদেয় তথ্য চিহ্নিত করা
- ✓ প্রকাশযোগ্য তথ্যের মধ্যে বিনা মূল্যে প্রদেয় ও মূল্যান্বিত তথ্যের তালিকা প্রকাশ
- ✓ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পদ্ধতিসমূহ (ওয়েবসাইটসহ)
- ✓ অনুরোধকৃত তথ্যের ভিত্তিতে স্বপ্রণোদিত তথ্যের কলেবর বৃদ্ধি।

চ. নাগরিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য অধিকার মূল্যায়ন

- ✓ চাহিদানুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি
- ✓ তথ্য প্রাপ্তির পর প্রয়োজনানুযায়ী তথ্যকে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারা
- ✓ সঠিক তথ্য সঠিক সময়ের মধ্যে পাওয়া
- ✓ সঠিক এবং নির্ধারিত ন্যায়সংগত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা
- ✓ তথ্যকে ব্যক্তির নাগরিকের ক্ষমতায়নে ব্যবহার করতে পারা
- ✓ অসম্পূর্ণ তথ্য প্রাপ্তির পর আপিল বা আবেদন করতে পারা
- ✓ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল বা আবেদনের সঠিক সুরাহা হওয়া
- ✓ আপিল বা আবেদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারা।

সঞ্চালক

ফরিদ হোসেন

তথ্য অধিকার আইন আমাদের অনেক দিনের চাওয়া। এটি পাস হয়েছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন তেমনভাবে অগ্রসর হয়নি। এটিকে চর্চার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। যেকোনো আবিষ্কার, তা কাজে না লাগলে কোনো ফল আসে না। এ আইনকে কাজে লাগাতে হবে।

এই আইনটি ভালো। কেন ভালো? কেননা এটি জনগণের আইন, জনস্বার্থের আইন। কিন্তু এই আইনটির যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে না। কারণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণ জানে না। এ 'আইনের সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ে জনগণকে জানাতে হবে।

এই আইনের মাধ্যমে আমরা ঘুষ দেওয়া সংস্কৃতি বন্ধ করতে পারি। আমাদেরকে ঘুষ দেওয়ার সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে। আমরা যে কাজ করি তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সব ক্ষেত্রে রাখতে হবে। 'তথ্য অধিকার আইন' কী, কেন, কার জন্য দরকার, এতে জনগণের কী স্বার্থ রক্ষা হবে– এসব বিষয় সম্পর্কে সবাইকে জানাতে হবে। আপামর জনগণ যদি 'তথ্য অধিকার আইন' চর্চা করে, তাহলেই এ আইন সার্থকভাবে কার্যকর হবে।

এই আইন বাস্তবায়নে, এই আইন সাধারণ জনগণের কাছে নিয়ে যেতে গণমাধ্যমগুলো অনেক বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে। এই আইনটি ব্যবহার করে আমরা দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করতে পারি। এজন্য তথ্য সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এ ক্ষেত্রে আমাদের কী ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে, আমরা কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, এবং এ আইন প্রয়োগ বা ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়, মানবাধিকারের ক্ষেত্রে, আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই আইনের গুরুত্ব কী– এসব বিষয় নিয়ে আমরা এই 'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এ মতবিনিময় সভা করছি।

এই সভায় আমরা এখন মতামত ও প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে এসেছি। আমরা বিভাগীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে মতামত ও প্রশ্ন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করছি।

১। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বরিশাল বিভাগে কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে? ২। এ ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠান কী করবে? ৩। কী ধরনের কাজ করলে এই আইন বাস্তবায়ন সহজ হবে? ৪। চট্টগ্রাম বিভাগে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে এবং গত এক বছরে এই আইনের কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে? আপনারা এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আপনাদের মতামত দেবেন।

মতামত ও প্রশ্নোত্তর পর্ব

রহিমা সুলতানা কাজল
নির্বাহী পরিচালক, আভাস (বরিশাল)

এই তথ্য অধিকার আইনটি পাস হওয়ার পর থেকে সরকারের উদ্যোগ তেমনভাবে চখে পড়েনি। সরকারের উদ্যোগে সারা দেশে এর প্রচার হয়নি। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপজেলা পর্যন্ত যদি মানবসম্পদ না থাকে, তাহলে কী করে এই আইন বাস্তবায়ন হবে? এখানকার তথ্য কমিশনার নিজেই বলেছেন তাঁর কাছে একটা ল্যাপটপ ও একজন সহকারী ছাড়া ওনার কাছে কিছু নেই। কিছুদিন আগে আমাদের এনজিওদের একজন তথ্য কর্মকর্তার নাম দেয়ার কথা বলা হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। আমরা অনেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ইতোমধ্যে দিয়েছি, যার কাছে জনগণ গেলে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সঠিকভাবে পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের ওই তথ্য (দায়িত্বপ্রাপ্ত) কর্মকর্তার নাম তাদের কাছে সংরক্ষণে নেই। এ রকম একটা অবস্থা এই প্রতিষ্ঠানের ভেতর আছে।

এই আইন সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তা, জনগণ ও আমরা যারা এই আইন বাস্তবায়নে কাজ করছি তারা এই আইন সম্পর্কে অবগত নই। সেই জন্য আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা খুবই ভালো উদ্যোগ। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন এই আইনটির ব্যাপক প্রচার, তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা।

জিয়াউল আহসান
পিরোজপুর গণ-উন্নয়ন সমিতির নির্বাহী পরিচালক

তথ্য অধিকার নিয়ে আমরা তেমন একটা কাজ করিনি। তথ্য অধিকার নিয়ে দু-তিনটি এই ধরনের মতবিনিময় সভায় আমি থেকেছি। আজকেও এখানে চলে এসেছি। তবে এই আইনটি পড়ে, শুনে এবং জেনে-বুঝে আমার কাছে মনে হলো এই আইনটি প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি ছিল অস্পষ্ট। কারণ, এই আইনটি প্রণয়নের সময় যারা এর উদ্যোক্তা ছিলেন তারা প্রায় সবাই (একজন বাদে) আমলা ছিলেন। শুধু একজন এনজিও কর্মকর্তা ছিলেন। পরবর্তী সময়ে দু-একজন আইনজীবী যুক্ত করা হয়।

তথ্য অধিকার কমিশন এখনো অনেক দুর্বল। তথ্য কমিশন এই আইন প্রয়োগে তেমন কোনো জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। কারণ এই কমিশনের কর্মকর্তারা তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ততটা বিজ্ঞ নন। যদি বিজ্ঞ হতেন, তাহলে তার ফল আমরা গত এক বছরে পেতাম। কিন্তু তা পাইনি। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, এই আইনটা মানুষ জানে না। মানুষ না জানলে এই আইন দিয়ে কী হবে? সে ক্ষেত্রে মানুষকে জানানোর পদক্ষেপ নিয়ে এগোতে হবে।

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অফিসে একটা সিএ পদ আছে। 'সিএ'-র বাংলা হচ্ছে গোপনীয় সহকারী। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা, তিনি এমন কী কাজ করবেন যে তার জন্য একজন গোপনীয় সহকারী থাকবে? এই পদটি তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। আমার মনে হয় এটি থাকা উচিত না। একমাত্র প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থা ছাড়া অন্য কোনো গোপনীয় তথ্য থাকা দরকার নেই। তথ্য অধিকার আইনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এই পদটি বাতিল করা হোক।

আরেকটা বিষয়, নির্বাচন কমিশন গত এক বছর ধরে সরকারি-বেসরকারি, রাজনৈতিক দলের, বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব দেয়ার জন্য বলেছেন। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত কেউ সম্পদের হিসাব দেননি। যদিও তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সম্পদের হিসাব দেওয়ার কথা বলেছিল। এই তাহলে যারা আইন প্রণয়ন করলেন তাদের যদি তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে এই অবস্থা হয়, তাহলে আইন কী করে বাস্তবায়িত হবে?

সরকারি-বেসরকারি, রাজনৈতিক দলের, বিভিন্ন কর্মকর্তাসহ সাধারণ মানুষও তথ্য দিতে চায় না। কারণ দুর্নীতি অথবা আত্মসম্মানবোধ। যার বেশি সম্পদ রয়েছে, তাদের অনেকে সে সম্পদের সঠিক হিসাব দেবে না। আবার অনেকের সম্পদ নেই, সে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য তথ্য দিতে চায় না। এই তথ্য না দেয়ার সংস্কৃতি থেকে আগে আমাদের সবার বেরিয়ে আসতে হবে। বিচার বিভাগের তথ্য চাওয়া যাবে না। বিচারকরা তা-ই মনে করেন। তবে এটা ঠিক নয়।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে এই আইনকে সহজ করে জনগণকে জানাতে হবে। কর্মশালা, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, লিফলেট, পত্রিকা, বই-পুস্তক প্রকাশ করে প্রচারণার মাধ্যমে এই আইনকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সব ধরনের প্রচারের মাধ্যমে সবাইকে জানাতে হবে। এই আইন নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করা। শুধু জিও ও এনজিও নয়, সবাইকে নিয়ে এই আইন বাস্তবায়নের কাজ অগ্রসর করে নিয়ে যেতে হবে।

এইচ এম আখতারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক, দুস্থ মানুষ উন্নয়ন সোসাইটি, ঝালকাঠি

আসলে আমাদের দেশে প্রশাসনিক বা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এত বেশি যে কোনো আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এই কারণে হয় না। তথ্য অধিকার আইনও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বাস্তবায়ন বিলম্ব হবে। একটা ছোট উদাহরণ দিই : আমি একবার জেলা স্বাস্থ্য হাসপাতালের সার্বিক তথ্য চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা এই তথ্য আমাকে দেননি। এই যে তথ্য না দেয়ার সমস্যা সর্বক্ষেত্রে। এই সমস্যা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদেরকে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে জানাতে হবে। তারা এই আইন সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমরা তৃণমূল থেকে শুরু করে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষের মানুষকে যদি এই আইনটা জানাতে পারি, তাহলে এই আইন বাস্তবায়ন সম্ভব।

এ কে এম খালেক

নির্বাহী পরিচালক, আরডিএম, পটুয়াখালী

আমরা একটি প্রকাশনা ছাপানোর কাজে জনসংখ্যাবিষয়ক কিছু তথ্যের জন্য ঝালকাঠির উপজেলা তথ্য ইউনিটে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তাদের কাছে কোনো তথ্য পাইনি। তারা বলেছে এ বিষয়ে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। সিটিজেন মনিটরিংয়ের কথা আমরা শুনেছি। সেটা তো আগে জনগণের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সিটিজেন মনিটরিং করতে হবে। এজন্য এফজিডি করতে হবে। সেজন্যও তথ্য দরকার। কিন্তু সে তথ্যও নেই। বিশেষ করে, আমরা যারা সেবা খাতে আছি তাদেরও তথ্য নেই। উপজেলা পরিষদে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) তথ্য নেই। তাহলে কেমন করে আমরা তথ্য পাব?

মোঃ নেয়ামত উল্যাহ্

জেলা প্রতিনিধি, প্রথম আলো, ভোলা

আমি আমার কাজ করার ক্ষেত্রে যেটা উপলব্ধি করছি যে অধিকাংশ অফিস-আদালত জানে না এই আইনটা পাস হয়েছে বা এ রকম একটা আইন আছে। অনেকে এই আইন আছে জেনেও মানছেন না। আমি বিশেষ করে বলছি, যারা এই আইনের সাথে সরাসরি যুক্ত, এই আইনি লোকগুলোর সবার আগে আইনটা মানা উচিত।

সাধারণ মানুষ তথ্য কী, তথ্য অধিকার কী, তথ্য আইন অধিকার কী— তা জানে না। তাদের জানানো হচ্ছে না। বিশেষ করে, ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসে দেখা যায়, প্রতিদিন মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। কোনো কাজ করতে গেলে ঘুষ দিতে হয়। এটা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা এখনো সরকারি ফি জনগণকে জানায় না।

আমার মনে হয়, প্রথমে জনগণকে এই আইনটা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা দরকার। তাদের সচেতন করে তোলার জন্য প্রয়োজন নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা; রেডিও-টেলিভিশনে এই আইন সম্পর্কে প্রতিনিয়ত প্রচার করা। এনজিওগুলো এই আইন প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা পালন করতে পারে। তথ্য ইউনিট অফিসের সামনে এই অফিস কী কী সেবা দিতে পারে, তার একটা তালিকা তৈরি করে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। এটা অনেকেই পড়বে।

সৈয়দ দুলাল

সম্পাদক, দৈনিক আজকের পরিবর্তন, বরিশাল

এই আইনটি একটি যুগোপযোগী আইন। আমি মনে করি, এই আইনটি আমাদের সবার প্রয়োজন। এই আইনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। তথ্য প্রদানের একটা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এই আইনের এটাই হলো মূল বিষয়। মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেল। অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে এই আইনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলে আমরা বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অনেক সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। এই আইন যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে আমরা দেশের দুর্নীতি কমিয়ে আনতে পারব। অনৈতিক কাজে কমানো সম্ভব হবে।

আমি ষাট বা সত্তরের দশকে দেখেছি, একজন জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলতে হলে কতই না ভোগান্তি পোয়াতে হতো। দু-তিন দিন আগে অনুমতি নিতে হতো। এখন তা আর দরকার হয় না। প্রশাসন ও জনগণের মাঝে যে দূরত্ব ছিল তা দিন দিন কমে এসেছে। আশির দশকের পরে তা দিন দিন কমে এসেছে। ভবিষ্যতে আরো তা কমে আসবে। এই পরিবর্তনগুলো আমলাদের মধ্যে এসেছে। এখন যেকোনো সময় জেলা প্রশাসকের সাথে মানুষ দেখা করতে পারে, এমনকি তার বাসায় গিয়েও কথা বলতে পারে। এই বিষয়টি বা এই পরিবর্তন এক দিনে আসেনি। এটা পর্যায়ক্রমে আসছে।

সবার আগে আমি মনে করি এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে জনমানুষকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এমনভাবে প্রচার করতে হবে যে এই আইন তারা যাতে বুঝতে পারে। এ দেশের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষার অভাব আছে, এজন্য তাদের এই আইন হাতে-কলমে বোঝাতে হবে। হাটেঘাটে গ্রামে গান, নাটক, জারিগানের মাধ্যমে যদি সাধারণ মানুষকে সচেতন করা যায়, তাহলে এই আইন বাস্তবায়নের সমস্যা থাকবে না।

এখন আইন বাস্তবায়ন করা আমাদের সবার কাজ। এটা খুব অল্প সময়ে বাস্তবায়িত হবে এবং এই আইনের সমস্যাগুলো খুব সহজে কাটিয়ে উঠবে– এটা আমি বিশ্বাস করি না। আমরা সবাই কথায় কথায় এর ওর দোষ ধরি, কিন্তু কখনো নিজের দোষ বিচার করি না। একবারও মনে করি না যে এই দেশের একজন নাগরিক হিসেবে এই আইন বাস্তবায়ন করার জন্য আমারও দায়িত্ব রয়েছে।

সোহেল হাফিজ
এনটিভি ও দৈনিক কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি

এই আইনের তিনটি পক্ষ রয়েছে। আমি প্রথম পক্ষের মধ্যে পড়ি। আমি মানে নাগরিক। আমরা বা আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে তথ্য নিয়ে সেই তথ্য আবার দ্রুত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিই। এখন কথা হলো, আগে আমি কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তার কাছে কোনো বিষয়ে ফোনে বা যোগাযোগ করে তথ্য নিয়ে রিপোর্ট করতাম। তাতে তেমন একটা সময় লাগত না। আর এখন তথ্য চাইলে তারা তথ্য অধিকার আইনের কথা বলে, ফলে যথাসময়ে আমি তথ্য পাচ্ছি না। এ ক্ষেত্রে আমরা কী করব? আরেকটি বিষয়, আমরা সাংবাদিকরা একই সময় একই বিষয় নিয়ে তথ্য কর্মকর্তাকে যদি বিরক্ত করি তাহলে তিনি কি বিরক্ত হবেন না?

অ্যাডভোকেট সৈয়দ গোলাম মাসুদ বাবলু
বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সম্পাদক

মোবাইল কোম্পানিগুলো পত্রিকায় নানা সুযোগ-সুবিধার বিজ্ঞাপন দিয়ে নিচে একটু ছোট করে লিখে দেয় ভ্যাট প্রযোজ্য। এটাও একধরনের প্রতারণা। এটার ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ নেয়া উচিত। আর বিশেষ করে, একজন আলোচক বললেন যে বিয়ের রেজিস্ট্রেশন করতে সাধারণ জনগণ প্রতারণার শিকার হয়, আমি তার সাথে একটি বিষয় যোগ করতে চাচ্ছি। গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করতে সাধারণ জনগণ প্রতারণার শিকার হয়। অথচ এই অফিসগুলোতে যদি একটা তালিকা থাকত এবং তাতে যদি উল্লেখ থাকত, তাহলে সাধারণ জনগণের ভোগান্তি হতো না।

কোন এলাকার জমির দাম কী এবং তার রেজিস্ট্রেশন ফি কত, তার যদি একটা তালিকা থাকত, তাহলে জনগণের জন্য খুবই ভালো হতো; জনগণ তার প্রয়োজনীয় বিষয় জানতে পারত। বিআরটিএতে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করতে গেলেও ওই একই ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। এসব কাজ করতে গেলে দালালদের অর্থ দিতে হয়। আর তালিকা থাকলে এই অর্থ দিতে হতো না।

আইনকানুনের বিষয়ে জাজমেন্টের আগে তথ্য দেয়া আসলেই ঠিক নয়। জাজমেন্ট হওয়ার পরের তথ্য তা তো এমনিতে জাজমেন্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যে তথ্য দেয়া ক্ষতিকর তা না দেয়াই উচিত।

তথ্য যাদের প্রয়োজন তাদের সচেতন করতে হবে– তথ্য তাদের কী সুযোগ-সুবিধা দেবে তা জানানো; সাধারণ জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো; তথ্য কীভাবে তাদের জীবনধারণের জন্য সহায়তা করে সে বিষয়ে তাদেরকে জানানো। এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে এ আইন সম্পর্কে জানাতে হবে।

নাসিম আলী
স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক (পিরোজপুর অফিস)

জনগণের কাছাকাছি সেবা প্রদানকারী যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ এই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কতটা জানেন, এটি আমাদের এই মুহূর্তে বিবেচনা করতে হবে। আমার অভিজ্ঞতা হলো, ইতোমধ্যে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো জেনেছে যে তথ্য অধিকার আইন নামে একটি আইন আছে। কিন্তু এই আইনে কী আছে এ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা আছে কি? আমি ধারণা করি সবার নেই। সে ক্ষেত্রে আমাদের আইন সম্পর্কে জানা দরকার। মৌলিক চাহিদা যারা বাস্তবায়নে কাজ করবেন তাদের কাছে এই আইনটি সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা থাকলে হবে না। মানুষকে এই আইন কী সুফল দেবে তা তাদের না জানা থাকলে কী করে এই আইন বা মৌলিক অধিকার বাস্তবায়িত হবে।

সাংবাদিক হিসেবে আমরা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এই আইনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারব। আমাদের তাতে কোনো সমস্যা হবে না। তার পরও যদি কেউ আমাদের হাইকোর্ট দেখায়, তাহলে আমরা অতীতে যেভাবে কৌশলে গোপনে তথ্য নিয়ে এসেছি সেভাবে তথ্য নেব।

তথ্য অধিকার আইন আমরা পেয়েছি। এটি জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায় হোক। কিন্তু কীভাবে হবে? জনগণ এই আইন সম্পর্কে জানে না। প্রথমে তাদের এই আইন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে। জনগণের দোরগোড়ায় এই আইন পৌঁছে দিতে হবে।

এই আইন বাস্তবায়নে এনজিওদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মিডিয়াকর্মীকেও এই আইন বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। জনগণকে এই আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও উপজেলার জনপ্রতিনিধিরা এই আইন সম্পর্কে জানেন না। তাদের প্রশিক্ষণ বা সভা-সেমিনারের মাধ্যমে এই আইন জানাতে হবে। তারা যদি আইনটি সম্পর্কে জানেন, তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের কাবিখার কাজের বিবরণ নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে জনগণকে জানাবেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে ইউনিয়ন পর্যায়ের তথ্য উপজেলায় পাওয়ার চেয়ে উপজেলার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদে যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা উচিত।

মোঃ আনছার উদ্দিন
উপাধ্যক্ষ, বিএম কলেজ

সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা বাস্তবায়নে এই আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এজন্য এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন দরকার। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এই আইন বাস্তবায়নের জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে, তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। তারা জনগণের মধ্যে এই আইনকে কী করে নিয়ে যাবেন তা জানেন না। এটা দিয়ে মানুষের কী উপকার বা লাভ হবে তা তারা বোঝাতে সক্ষম হচ্ছেন না। তথ্য অধিকার আইন গণমানুষের মধ্য নিয়ে যেতে হলে জনগণ যেভাবে বোঝে সেভাবে তাদের বোঝাতে হবে।

বরিশালের এ সার্বিক প্রেক্ষাপটে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে আমাদের করণীয়' সম্পর্কে আমার সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করছি :

১। বরিশালে বিভাগীয় প্রশাসনের উদ্যোগে এর আওতাধীন সকল জেলা ও উপজেলার সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস; আদালত; হাসপাতাল; ব্যাংক; বীমা; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক; চিকিৎসককে উক্ত আইনের কপি বিতরণ করার প্রস্তাব করছি।

২। প্রত্যেক দপ্তর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার আইনকে নিয়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করবে।

৩। বিভাগীয় প্রশাসন কর্তৃক এই আইনের আলোকে প্রত্যেক দপ্তরে সিটিজেন চার্টার ডিসপ্লে করা, তথ্যসেল গঠন এবং আইনটির ১০ নং ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজনীয় অফিস আদেশ বা নির্দেশনা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৪। বিভাগীয় পর্যায়ে তথ্য কমিশনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাব করছি (ধারা ১১(৩) অনুযায়ী)।

৫। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-কে নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করার প্রস্তাব করছি।

৬। প্রতিটি দপ্তরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলার প্রস্তাব করছি।

৭। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ব্যাপারে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রিন্টিং ও স্ক্রিন মিডিয়া কর্তৃক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উপসম্পাদকীয় প্রকাশ ও অনুষ্ঠান প্রচার করা।

৮। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, পথনাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি ব্রজমোহন কলেজে কোনো পদক্ষেপ নিতে চায়, আমি সর্বতোভাবে সহযোগিতা করব।

৯। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বরিশাল বেতারে অনুষ্ঠান প্রচার করার প্রস্তাব করছি।

১০। উপকূলীয় ও চরাঞ্চলের মানুষের জন্য ঐসব এলাকার ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য অধিকার-সম্পর্কিত বিলবোর্ড নির্মাণ করার প্রস্তাব করছি।

১১। দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নত করতে হবে, যা তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করবে।

মো. মনিরুজ্জামান

উপ-পুলিশ কমিশনার, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ

আমি ধন্যবাদ জানাই মইনুল কবির ভাইকে। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে আজকের এই 'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এ মতবিনিময় সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। আমার কাছে তার প্রাণবন্ত আলোচনা খুবই ভালো লেগেছে।

তিনি আলোচনার মধ্যে একটি জায়গায় 'নিজেকে জানা' প্রসঙ্গে বলেছিলেন, জীবনে যখন কোনো আলো থাকবে না, তখন আমরা কী নিয়ে চলব? জ্যোতি নিয়ে। নিজের জ্ঞানের জ্যোতি নিয়ে। নিজের আলো নিয়ে। এ বিষয়টি আবারও আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এ কথাটি আমাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আর এই আইনের প্রয়োজনের নানা দিক তিনি আমাদের সামনে তুলে এনেছেন।

তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে গত বছর ২০০৯ সালে। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি, এই আইন পাস হওয়ার পর এই আইনের অধীনে কেউ আমার দপ্তরে তথ্য নিতে আসছে বলে মনে হয় না। তবে মানুষজন আমাদের কাছে আসে। আমরা মানুষজন নিয়ে কাজ করি। মানুষ নানা বিষয়ে আমাদের কাছে আসে। তাদের যতটুকু সম্ভব সেবা দেয়ার চেষ্টা করি। যথাসাধ্যভাবে যার যে বিষয়ে প্রয়োজন তা মেটানোর চেষ্টা করি।

এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা কোথায় সে বিষয়ে আমি ব্যক্তিগত কিছু মতামত দিতে চাই, যদি আপনারা অনুমতি দেন। জানি, এজন্য আমার ওপর অনেকেই অখুশি হতে পারেন। কিন্তু তাতে আমি কিছু মনে করব না। কারণ এই তথ্য দেয়ার ফলে আমার নিজেকে প্রকাশ করাও তথ্য অধিকার আইনে পড়ে এবং এই তথ্যও দেয়া উচিত।

নাগরিক তার আয়ের তথ্য দিতে চায় না। কারণ সে তার কালো টাকা লুকিয়ে রাখতে চায়। দুর্নীতি এভাবে দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি বড় বাধা। আবার এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা বা বন্ধ করা সম্ভব। তা মূলত নির্ভর করছে আমাদের ওপর। ধরুন একটা ছুরি, তার ব্যবহার নির্ভর করে ব্যবহারকারীর ওপর। সে এটা দিয়ে কী করবে? সবজি কাটবে না ছিনতাই করবে তা নির্ভর করে ব্যবহারকারীর ওপর। এখন ব্যবহারকারী যে ব্যক্তিটি সে যদি ভালো মানুষ হয় তার ব্যবহার হবে এক রকম। আর সে যদি ছিনতাইকারী বা ডাকাত হয় তাহলে তার ব্যবহার হবে আরেক রকম। এখন প্রশ্ন আসে, তাহলে ছিনতাইকারী বা ডাকাত কেন সমাজে তৈরি হয়? এর উত্তর সমাজব্যবস্থা এবং এই সমাজব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারীদের কারণে সমাজে ছিনতাইকারী বা ডাকাত তৈরি হয়। তাহলে এর মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা আমরা সকলে কম-বেশি বুঝতে পারছি।

দুর্নীতি এভাবে দিনের পর দিন সমাজে তৈরি হতে থাকে। ধরুন, আমার চাকরি নেওয়ার সময় ঘুষ দিয়ে চাকরি নিতে হয়েছে। এখন আমি যে টাকা দিয়ে চাকরি নিয়েছি সে টাকা কারো না কারো কাছ থেকে এনে দিয়েছি। চাকরিতে যোগদানের পর পরই আমার চিন্তা থাকে, ওই টাকা যার কাছ থেকে এনেছি তাকে শোধ করার। তাই আমাকেও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে হয়। আর আমার যদি মেধা ও যোগ্যতায় চাকরি হতো, তাহলে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে হতো না। দেখুন, এই দুর্নীতিতে আমাকে কে আনল? নিশ্চয়ই আমার ডিপার্টমেন্টের সিনিয়ররা। তারা আবার দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছে কেন? কারণ সরকার। তাহলে রাষ্ট্রের কাঠামো-অবকাঠামোতে আমরা যারা জনগণের সেবক হিসেবে আছি তারা প্রায় সবাই দুর্নীতিপরায়ণ। তাহলে এই আইন কী করে বাস্তবায়িত হবে।

এই আইনের মাধ্যমে আমরা দুর্নীতির সংস্কৃতি বন্ধ করতে পারি। আমাদেরকে ঘুষ দেওয়ার সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে। আমরা যে কাজ করি তার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সব ক্ষেত্রে রাখতে হবে। আমাদেরকে মানুষ হতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে যেতে হবে।

'তথ্য অধিকার আইন' কী, কেন, কার জন্য দরকার, এতে জনগণের কী স্বার্থ রক্ষা হবে– এসব বিষয় সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে। আপামর জনগণ যদি 'তথ্য অধিকার আইন' চর্চা করে, তাহলেই এ আইন বাস্তবায়নে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

মো. সিরাজুল হক মল্লিক
সহকারী তথ্য অফিসার (বরিশাল বিভাগীয় তথ্য অফিস)

সবাই মনে করেন তথ্য অফিসার বা কর্মকর্তার কাছে অনেক তথ্য আছে। আসলে এই আইনের গেজেটটি ছাড়া আমাদের কাছে কিছু নেই। তথ্য অফিসে কোনো কাজ নেই। কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। আমরা তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে কীভাবে সচেতন করব সে বিষয়ে আমি কিছু করণীয় সম্পর্কে বলতে চাই।

গ্রামের মানুষের নানা বিষয়ে কী কী করণীয় সে বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যদি একটা সিডি করে আমাদের দেয়া হতো, তাহলে আমরা তা গ্রামে গ্রামে নিয়ে দেখানোর মাধ্যমে জনগণকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করতে পারতাম। লোকগান বা বয়াতি গানের মাধ্যমে এই আইনের নানা বিষয় নিয়ে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে। মাইকে গ্রামে গ্রামে যদি এই আইন সম্পর্কে প্রচার করি, তাহলে আমার মনে হয় এভাবেও আমরা জনগণের মাঝে প্রচার করতে পারি। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যদি পোস্টার, লিফলেট করে প্রচার করতে পারি, তাহলেও জনগণকে এই আইন জানানো সম্ভব। দেয়াল লিখন ও বিলবোর্ডের মাধ্যমে আমরা এই আইন প্রচার করতে পারি। তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে যদি জেলা ও উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে কর্মশালা করা যায়, তাহলেও জনগণকে এই আইন জানানো সম্ভব। এই আইনটির ব্যাপক প্রচার না হওয়ার কারণে, তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ না থাকায় ও জনবলের অভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের তথ্য কর্মকর্তারা তথ্য দিতে পারছেন না। এজন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই আইন সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা প্রয়োজন। তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

মেজর তুহিন মোহাম্মদ মাসুদ
পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন (বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়)

আমি ধন্যবাদ জানাই মইনুল কবির ভাইকে তার চমৎকার আলোচনা করার জন্য। আজকের এই 'তথ্য অধিকার আইন : সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ক এ মতবিনিময় সভার সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমার কাছে আজকের আলোচনা খুবই ভালো লেগেছে। আমিও এই আইন সম্পর্কে আরো বেশি জানলাম। আসলে এ রকম আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়েই এই আইন জনগণের কাছে পৌঁছে যাবে বলে আমার ধারণা।

জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই তথ্য দরকার। তথ্য ছাড়া জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে তথ্য প্রাপ্তি ও প্রদানের। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছে।

এই কমিশনে কাজ করতে গিয়ে আমার অভিজ্ঞতার দু-একটি কথা বলছি। সাধারণ মানুষ হিসেবে যদি এই আইনটাকে দেখি, তাহলে এই তথ্য অধিকার আইনটা আমাকে, একজন নাগরিক হিসেবে আমি যা জানতে চাইব তা জানাবে বা জানাতে বাধ্য– এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই। আর সরকারি কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি বা তথ্য কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই আইনটা মনে হবে জনগণের তথ্য পাওয়ার একটি আইন হিসেবে। এখন কথা হলো জনগণকে জানানো যে এই আইনের মাধ্যমে তারা এই এই সুযোগ-সুবিধা পাবে। জনগণ এই আইন সম্পর্কে কিছু জানে না। তাদের জানানো, আমাদের প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তার জন্য অবশ্যকীয় দায়িত্ব-কর্তব্য। এ দায়িত্ব আমরা কেউ এড়াতে পারব না। কারণ এই জনগণের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের বেতন হয়। এই জনগণের সেবা করার কথা আমাদেরকে সংবিধান বারবার বলেছে। সেবা করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

জনসচেতনতার অভাবই আমাদের সব প্রতিবন্ধকতার মূল। এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলো এই আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বা তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের যে অনাগ্রহের মানসিকতা রয়েছে তা পরিহার করতে হবে।

এই আইন দুদককে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করবে। এতে করে সমাজে দুর্নীতি কমে আসবে। এটা আমাদের জন্য, রাষ্ট্রের খুবই প্রয়োজনীয় আইন। এই আইনকে আমরা যদি কার্যকর করতে পারি, তাহলে আমাদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব।

আমাদের কাজের গতি বাড়াতে হবে। কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। এই আইন বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার করে এই আইনের সুফল অর্জন করতে হবে। এই আইনটির ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচার দরকার। তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। জনবলের অভাব দূর করা। বাজেট থাকা প্রয়োজন। ম্যানুয়াল দরকার। তথ্য সংগ্রহে একটা দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

মো. মনিরুল ইসলাম

জেলা নির্বাচন অফিসার (বরিশাল)

আমার কাছে নির্বাচনসহ অন্যান্য যে তথ্য সাংবাদিক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ চেয়েছে তা প্রদান করেছি। তথ্য অধিকার আইনে যে সময়ের মধ্যে তথ্য কর্মকর্তা (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সে সময়ের মধ্যে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারেনি। এই আইন পাস হওয়ার এক বছরের বেশি সময় ধরে ৪০ জন তথ্য কর্মকর্তার (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) মধ্যে এখনো ১৫ জন নিয়োগ দেয়া হয়নি। অনেক জায়গায় এখনো এ পদ শূন্য রয়েছে।

জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই তথ্য অধিকার আইন দরকার। এই আইন ছাড়া জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও ক্ষমতায়ন সম্ভব না। মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অধিকার আইন অপরিহার্য। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে এখনো জটিলতা আছে। আইনের কিছু ধারা তথ্যদাতাকে নিরুৎসাহিত করছে। আইনের এই সীমাবদ্ধতা দূর করে তথ্যপ্রাপ্তির পথ সুগম করতে হবে। তথ্য অধিকার না থাকলে দেশে গণতন্ত্র বিকাশ কখনো সম্ভব নয়। গণতন্ত্র বিকাশের অন্যতম শর্ত হচ্ছে সব নাগরিকের জন্য তথ্য অধিকার।

আমার দপ্তর এই আইন বাস্তবায়নে কাজ করছে এবং আগামী দিনগুলোতে কাজ করে যাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই আইন যাতে জনগণের মধ্যে প্রচার হয় তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছি। এই আইন বাস্তবায়নে আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন এই আইনটির ব্যাপক প্রচার, তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা বাস্তবায়নে এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে ইউনিয়ন পর্যায়ের তথ্য উপজেলায় পাওয়ার চেয়ে উপজেলার পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদে যাতে তথ্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

পঙ্কজ রায় চৌধুরী

জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা (বাংলাদেশ শিশু একাডেমী)

এই তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর সাংবাদিকরা মনে করেছিলেন, এই আইনের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তাদের ধরবেন। আর সরকারি কর্মকর্তারা তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর মনে করেছিলেন, এবার আমাদের রক্ষা নেই। পরে দেখা গেল এই আইন আসলে তা নয়। এই আইন জনগণের অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য। মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য। রাষ্ট্র দেরিতে হলেও এই তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে। এজন্য সরকারকে ধন্যবাদ। এটা জনগণের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটি ব্যবহার করে জনগণ তার জীবনযাপনে উপকৃত হবে। কিন্তু যে জনগণের জন্য এই আইনটি করা হয়েছে, সে জনগণ এই আইন সম্পর্কে কিছু জানে না। জনগণকে এই আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। এ দায়িত্ব আমাদের সবার। সরকার ও এনজিওগুলোর পাশাপাশি আমাদের সবার উচিত এই আইন বাস্তবায়নে কাজ করা।

এক ভাই বলেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এখনো নিয়োগ দেয়া হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এখন নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাদের সবার দক্ষতা এক রকম নয়। প্রয়োজনে একেক জায়গার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একেক রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এত বড় একটা আইন হয়েছে। কমিশন হয়েছে। এটা অবশ্য সফল দিক। আর বাকি সফলতা নির্ভর করে আমাদের কাজের ওপর।

মো. সিরাজুল হক
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

যারা তথ্য দেবে বা যাদের কাছে আমরা তথ্য পাব, তাদেরকে তথ্য কী, তথ্য অধিকার কী, তথ্য অধিকার আইন কী, এ আইনে কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে জনগণকে ভালোভাবে জানানো; তাদেরকে প্রশিক্ষণ সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা আমাদের প্রধান কর্তব্য।

এই আইনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। তথ্য প্রদানের একটা বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এই আইনের এটাই মূল বিষয়। মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার আইনি স্বীকৃতি পেল। অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে এই আইনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসেবে অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব পড়ে এই আইন সম্পর্কে জনগণকে ভালোভাবে জানানোর। সেই দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে।

আমি এই আইনে কয়েকটি বিষয়ে সংশোধনী আনার জন্য প্রস্তাব করছি।

১. ধারা ৯(৬) স্ববিরোধী। এটাকে সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করছি।

২. এই আইনে দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এটি সংশোধন করা উচিত।

৩. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরমেটের সংশোধনী আনা দরকার।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন এই আইনটির ব্যাপক প্রচার। তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা প্রয়োজন। সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা বাস্তবায়নে এই আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ জন্য এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য ইনডেক্স তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য দরকার লোকবল বাড়ানো। এসব কাজের জন্য অর্থ প্রয়োজন। বাজেট দরকার। তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন। বাজেট না থাকলে প্রয়োজনীয় কাজ ব্যাহত হবে। জনগণকে তথ্য আদান-প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

সঞ্চালক
ফরিদ হোসেন
আজকের আলোচনায় তথ্য অধিকার আইনের সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ে নানা মতামত চলে এসেছে। এর মধ্যে আমি কয়েকটি বিষয়ের কথা তুলে ধরছি :

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করতে হলে আগে প্রয়োজন এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ। প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কারণে এই আইন বাস্তবায়নের নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নেয়ার প্রস্তাব এসেছে।

তথ্য প্রদান ইউনিটের কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব রয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দরকার।

তথ্য প্রদান ইউনিটকে তথ্যায়িত করা এবং তা সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা, তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন ও লোকবল বাড়ানো প্রয়োজন। জনগণকে তথ্য প্রদানে উৎসাহী করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণামূলক পদক্ষেপ নেয়া দরকার। কীভাবে আমরা তথ্য সংগ্রহ করব, তার একটা দিক-নির্দেশনা থাকা খুব প্রয়োজন।

তথ্য কী, তথ্য অধিকার কী, তথ্য অধিকার আইন কী, এ আইনে কী বলা হয়েছে সে সম্পর্কে জনগণকে ভালোভাবে জানানো। এই আইন দিয়ে তার কী উপকার হবে, এতে তার লাভ কী ইত্যাদি বিষয় জানাতে হবে। বরিশাল বিভাগে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে জানানোর জন্য তেমন কোনো উদ্যোগ বা পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ অঞ্চলের মানুষ এই আইন সম্পর্কে জানে না। তাদের জানানো হয়নি। এ ব্যাপারে নানা ধরনের প্রচারণামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। লিফলেট, পোস্টার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও গণমাধ্যম, ইউনিয়ন পর্যায়ে বা গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক করা যেতে পারে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই আইন সম্পর্কে সেমিনার করা। তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তা, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক ও শিক্ষকসহ সবাইকে এ আইন যাতে কার্যকর করা যায় তার জন্য দায়িত্ব পালন করা দরকার। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মাধ্যমে আইন সম্পর্কে প্রচার করা যেতে পারে। সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, রেডিও, টেলিভিশনসহ সব গণমাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। বিলবোর্ডের মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।

এই আইনে দিবস, কার্যদিবস ও দিন-তারিখের কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এটি সংশোধন করা উচিত। ভিসেরা রিপোর্ট অনেক সময় ২৪ ঘণ্টার মধ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য কর্মকর্তা এবং পুলিশ কী করে এই ধরনের ভিসেরা রিপোর্ট দেবেন, তা স্পষ্ট নয়।

তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্য ইনডেক্স তৈরি করা দরকার। আইন বাস্তবায়নের জন্য বাজেট রাখা দরকার। অবকাঠামোর উন্নয়ন, দিক-নির্দেশনা প্রদান, তথ্য প্রদান ইউনিটকে আরো আধুনিকায়ন করা দরকার।

তথ্য গোপন করা ও না দেয়ার মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। এই আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। তারা যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝাতে হবে। এই আইন বাস্তবায়ন করতে হলে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে এ আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য গ্রহণ-প্রদান ইউনিট স্থাপন করা যেতে পারে।

সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারী উভয়েরই সেবা প্রদানের মানসিকতা থাকতে হবে।

হাসিবুর রহমান

তথ্য অধিকার আইনকে জনগণের কাছে পরিচিত করতে হবে যেকোনো কৌশলে। এনজিওদেরই এটা করতে হবে। আমরা এনজিওরা এতদিন সরকারের সুশাসন নিয়ে অনেক কথা বলেছি। এখন আমাদের নিজেদের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এ নিয়ে অনেক আলোচনা প্রয়োজন। এনজিওদের তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। হাজার হাজার এনজিওর মধ্যে এ পর্যন্ত ১২০টি এনজিও তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম তথ্য কমিশনে জমা দিয়েছে। এ সংখ্যা খুব কম। সরকারের পক্ষ থেকে ৫ হাজারেরও বেশি তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আমাদের সরকারের পাশাপাশি কাজ করে যেতে হবে।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিত সবার কাছ থেকে নিম্নলিখিত মন্তব্য ও সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়

ক. আগামী এক বছর পর তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা পরিমাপের জন্য কী মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে?

- সাধারণ জনগণ থেকে তথ্য যাচাই/জনমত যাচাই/জনমত জরিপ
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে গোপন তথ্য নেয়ার ভিত্তিতে
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানের বিবরণী অবহিত করা
- প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ
- চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে হাসপাতালের ডাক্তার কেন আসেনি তার তথ্য লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাওয়া
- খাসজমিপ্রাপ্ত মানুষের নাম-পরিচয় ভূমি অফিসে প্রকাশ্যে দেখা যাবে
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে তাৎক্ষণিক মামলা বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে
- তথ্য কমিশনের রিপোর্ট
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানে গৃহীত ব্যবস্থা
- পর্যাপ্ত মনিটরিং
- কী ধরনের সমস্যা বেশি পরিলক্ষিত হয় বা তার সমাধান কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তা খতিয়ে দেখা বা মূল্যায়ন করা
- নির্দিষ্ট একটি ফরম তৈরি করে তা সব অফিসে সরবরাহ করা এবং বছর শেষে তা সংগ্রহ করা

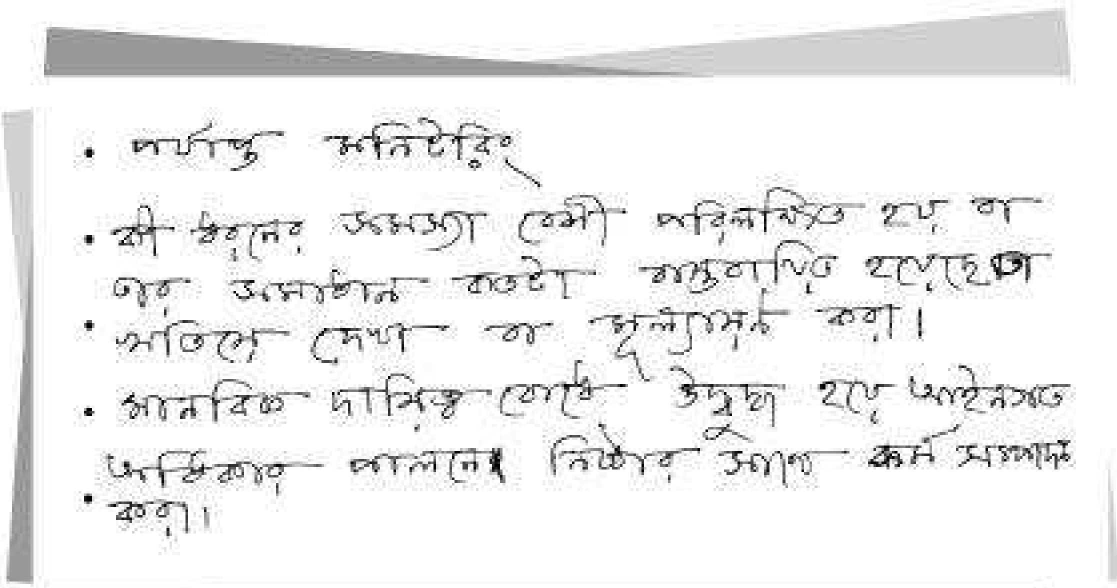

- বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে থেকে সারা বছরের তথ্য সংগ্রহ করা অর্থাৎ মিডিয়া রিপোর্ট মনিটরিং করা
- বাস্তবের নিরিখে আজকের চিত্রটি রেকর্ডভুক্ত রেখে পরবর্তী এক বছর পরে তার তুলনা করা
- তথ্য প্রদানকারী অফিসারের নিকট থেকে কতজন তথ্য নিয়েছেন তার পরিসংখ্যান নেয়া
- তথ্য প্রদানে সমস্যার কারণে কোনো আপিল বা অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে কি না
- স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য অধিকার-সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করা
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ প্রদান করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা এবং তা শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য অধিকার-সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞানের স্তর যাচাই করা
- উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরে জরিপ করে তথ্যচাহিদা ও প্রমাণের হার নিরূপণ
- আপিল বিভাগের অনুরূপ জরিপ
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন চার্টারের বিলবোর্ড, কার্ড ইত্যাদি কতটা স্থাপিত হয়েছে তা নিরূপণ করা
- অধিকারের প্রশ্নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়িত নানা কর্মসূচির হার নির্ধারণ
- মিডিয়ায় অধিকারসংক্রান্ত খবর লেখার প্রচার প্রকাশ মনিটরিং
- মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না
- তথ্য প্রদানকারী সংস্থাগুলো কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে কি না
- সব মহলের সব শ্রেণীর মানুষ জানবে দেশে তথ্য অধিকার আইন চলমান আছে। যেকোনো তথ্য যেকোনো সময় পাওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে
- মানুষের কতটা মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার পূরণ হচ্ছে, কতটা প্রতারিত হচ্ছে
- দুর্নীতির পরিমাণ
- জাতীয় উন্নয়নের সামগ্রিক পরিমাপ
- এক বছর পরে জরিপের মাধ্যমে জানতে হবে সাধারণ মানুষ অধিকার সম্পর্কে, তার মানবাধিকার সম্পর্কে ও তথ্য অধিকার সম্পর্কে কতটা জানতে পেরেছে। যাচাই করতে হবে।
- মতবিনিময় সভা/মতামত গ্রহণ
- প্রতিটি দপ্তরের প্রকাশযোগ্য ও অপ্রকাশযোগ্য তথ্যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা
- দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি না তা যাচাই করা
- প্রত্যেক দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ফরম 'ক'-সহ অন্যান্য ফরম পাওয়া যাচ্ছে কি না তা যাচাই করা
- সেবা গ্রহণকারীর সন্তুষ্টির মাত্রা
- তথ্য প্রদান প্রতিষ্ঠানে কী পরিমাণ আবেদন পড়েছে
- উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায় থেকে কী পরিমাণ তথ্য প্রদান করা হয়েছে তার সংখ্যা
- সাধারণ মানুষ তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক ব্যবহার করেছে
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কী পরিমাণ/কতজনকে তথ্য দিচ্ছে তা যাচাই করা
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য হয়েছে
- তথ্য কমিশনে কী পরিমাণ প্রতিবেদন ও অভিযোগ আছে তা বিশ্লেষণ করা
- মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের প্রধানদের এই কাজে সম্পৃক্তকরণের বিষয়টি মনিটরিং করা

খ. বরিশাল বিভাগের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

- কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল্যবোধগত নেতিবাচক মনোভাব
- কর্তৃপক্ষের জনবল সংকট
- কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে মনে করি না। তবে জনগণকে এ আইন সম্পর্কে জ্ঞাত করতে হবে
- সাধারণ মানুষকে তথ্য ও অধিকার দুটি বিষয়ে ধারণা দিতে হবে
- প্রশাসনিক পর্যায়ে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ
- সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যেসব সুবিধাভোগী গোষ্ঠী জড়িত তাদের সম্মিলিত নেতিবাচক মনোভাব
- সাধারণ জনগণের রাষ্ট্রীয় সেবা দেয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের প্রক্রিয়া
- ভূমি ব্যবস্থাপনা ও খাসজমি বন্টনের নীতিমালা বাস্তবায়নে বাটপারদের সাথে ভূমি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐক্য
- রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সচেতনতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মানসিকতা
- অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দরিদ্রতা
- সরকারি ও বেসরকারি 'উন্নয়ন ও সচেতনতা তৈরি' সংস্থাসমূহের স্বল্পতা
- তথ্য জানার ক্ষেত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা
- তথ্য চাইবার অনাগ্রহ
- তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা
- আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
- কর্মকর্তাবৃন্দের তথ্য প্রদানে অনীহা
- ব্যাপক প্রচার-প্রচারণায় কোনো সুযোগ না থাকা
- বরিশাল বিভাগের যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত
- যারা এই আইনের সুবিধা পাবেন, তারা এই বিষয়ে জানেন না
- যারা তথ্য প্রদানে বাধ্য, তারাও বিস্তারিতভাবে সমৃদ্ধ নন

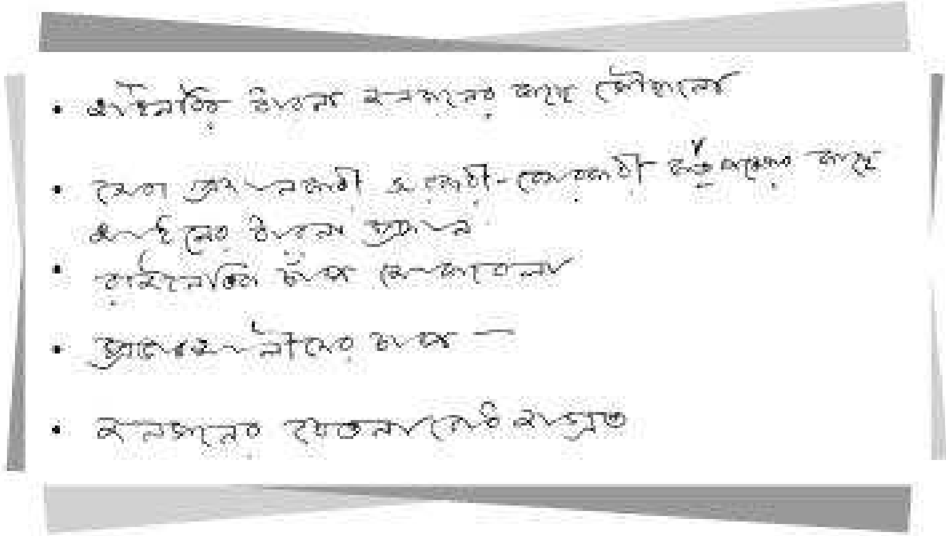

- জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ
- বিভাগীয় পর্যায়ে এই আইনের প্রয়োগে সরকারি যথাযথ (গুরুত্ব সহকারে) দিক-নির্দেশনা না আসা
- ব্যাপক জনসাধারণ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানেন না
- তথ্য প্রদানকারীদের তথ্য দিতে অনাগ্রহ, ঘুষ ও অন্যান্য সুবিধা দাবি
- তথ্যের আদান-প্রদানের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান নয়
- তথ্য প্রদানে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা
- তথ্য পাওয়ার পদ্ধতি বা প্রকৃতি সাধারণ মানুষ জানে না

- প্রথমত জনসচেতনতার অভাব
- সামগ্রিক মানসিকতার অচলায়তন অপসারিত করা
- আইনটির ধারণা জনগণের কাছে পৌঁছানো
- সেবা প্রদানকারী সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আইনের ধারণা প্রদান
- এই আইন সম্পর্কে এখনো সর্বমহলের জনগণ জানে না
- তথ্য অধিকার আইন থাকলেও কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদানে অনীহার মানসিকতা
- তথ্যদাতা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের নিকট বিষয়টি গুরুত্বহীন
- মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে আগে
- সরকারি-বেসরকারি সংগঠনগুলোর কর্মকর্তাদের তথ্য না দেয়ার এবং আইন মেনে চলার অনেক দিনের অভ্যাস
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানে অসহযোগিতা
- সেবা প্রদানের মানসিকতার পরিবর্তন না হলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়
- পদ্ধতিগত জটিলতা দূর না হলে অর্থাৎ আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করা না গেলে এই আইনের বাস্তবায়ন করা যাবে না
- প্রতিটি দপ্তরের জনবলের ঘাটতি পূরণ করতে হবে
- নিয়োজিত তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র ফরম 'ক'-সহ অন্যান্য ফরমসমূহ প্রতিটি দপ্তরে সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ
- প্রতিটি দপ্তরের প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুতকরণ
- বিচারকদের তথ্য প্রকাশে বাধ্য না থাকা
- মিডিয়ার কিছু ব্যক্তি এই আইনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অপব্যবহার করবেন। এতে ক্ষতি হবে প্রতিষ্ঠানসমূহের

গ. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার? সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

- কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে অধিকার বাস্তবায়নে সক্রিয় করা
- জনগণকে আইন ও অধিকার প্রশ্নে আগ্রহী করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচারণা
- জনপ্রতিনিধি ও গ্রামের সুশীল সমাজকে সক্রিয় করা
- গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায়ে সেখানে সাধারণে অনুপ্রবেশক্ষমতা বেশি
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
- পল্লী তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ
- তথ্য কী? কেন প্রয়োজন সে বিষয়ে ধারণা প্রদান

- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের এ আইন না মানলে তার ক্ষতি হবে। এ বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে
- সরকার ও প্রশাসনের উচ্চমহল থেকে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)
- দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহকে এ বিষয়ে অধিকতর সচেতন করে তোলা। এ কাজে তাদের সর্বোচ্চ মহল থেকে সহায়তা করা
- জনগণকে দুদককে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে হবে
- তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করা দরকার
- আমার প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে জনবল কাঠামো, চাকরিবিধি ও নীতিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে
- প্রতিটি অফিস থেকে প্রথম শুরু করা দরকার
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি তথ্য সেল গঠন করা
- যারা তথ্য প্রদান করবেন সেই তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নির্ধারণ করা
- বিভাগীয় পর্যায়ে সব ইউনিটকে এ বিষয়ে অবগত করে তথ্য প্রদানবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে হবে
- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় থেকে কাজ শুরু করা দরকার
- তৃণমূল সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষের কী কী সেবা দেয়া হয় সেগুলি প্রকাশ্য এবং সহজলভ্য করা
- মানুষকে সংগঠিত করার দায়িত্ব আমার প্রতিষ্ঠান করতে পারে
- ব্যাপক প্রচারণার দায়িত্ব আমাদের প্রতিষ্ঠান দিতে পারে
- নাগরিক সমাজের এবং জনপ্রতিনিধি সাংবাদিকসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা
- আপডেট তথ্য প্রস্তুত করা (সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়)
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- কর্ম-এলাকার আপডেট তথ্য সংগ্রহ করা ও সংরক্ষণ করা এবং তথ্য সরবরাহ করা
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা
- তৃণমূল পর্যায়/গ্রামভিত্তিক যেমন : উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, উদ্বুদ্ধকরণ সভা
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ প্রথমত সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেই শুরু করতে হবে

- নিজ প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা।
- তথ্য কর্মকর্তা সম্পর্কে সকলকে জানানো।
- তথ্য কর্মকর্তাকে তথ্য সমৃদ্ধ করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য কর্মকর্তাকে দক্ষ করে গড়ে তোলা,
- তথ্য অধিকার আইন এবং এর সুফল সম্পর্কে অধিকতর মানুষকে সচেতন করা।

- এ ছাড়া স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাতেও তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ এখন থেকেই শুরু করা দরকার
- রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ স্থান থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত অধিকার বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করতে হবে
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে আমার প্রতিষ্ঠানের করণীয় হবে তা বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করা
- ইতিমধ্যে আমার প্রতিষ্ঠানের অধস্তন অফিসসমূহে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে
- স্থানীয় সরকার থেকে
- জনগণ এবং স্থানীয় সরকারের এর সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে
- নিজ প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা
- তথ্য কর্মকর্তা সম্পর্কে সকলকে জানানো
- তথ্য কর্মকর্তাকে তথ্যসমৃদ্ধ হওয়া
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য কর্মকর্তাকে দক্ষ করে তোলা
- তথ্য অধিকার আইন এবং এর সুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই আইনের প্রতিটি ধারা ও তার ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে
- সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য সংরক্ষণ সেল থাকা ও তা উন্মুক্ত করার বা অপরকে প্রদানের পলিসি থাকা দরকার
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর একবারে ওপরের দপ্তরগুলো থেকে কাজ শুরু করতে হবে
- পুলিশ প্রশাসনকে সর্বপ্রথম এই আইনটি মানতে বাধ্য করতে হবে
- সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সহযোগিতা চালিয়ে যাব

ঘ. এই বিভাগে (বরিশাল) কী ধরনের কার্যক্রম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে?

- জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি
- বেসরকারি খাতে এ সেবা প্রদানের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে
- কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রচুর পরিমাণ প্রশিক্ষণ
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তাদের সেবা প্রদানের তালিকাসহ মূল্য জনসাধারণের সম্মুখে বিলবোর্ডে প্রদান করে
- সংবাদপত্র ও টিভিতে প্রচারসহ অধিকার আইনের ওপর নাটক, গান প্রচারের মাধ্যমে
- তথ্য অধিকারবিষয়ক ভিডিও ক্যাম্পেইন
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তথ্যের সহজলভ্যকরণে উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার যেকোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে বাধ্যতামূলকভাবে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানো
- সামাজিক কর্মকাণ্ড যারা করে যথা : রেডক্রিসেন্ট, স্কাউট, গার্লস গাইড ও নাট্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে প্রচার প্রচারণার জন্য ব্যবহার করা
- যেহেতু এ বিভাগের মানুষ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বাঁচে, তাই তাদের এত আধুনিক আইন সম্পর্কে ধারণা কম। তাদেরকে এ আইনের সুফলগুলো সম্পর্কে অবহিত করতে সুস্থ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে কাজে লাগানো

- অধিকসংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও এনজিওকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে
- যোগাযোগব্যবস্থা ও স্থাপনার উন্নয়ন
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়, যার মাধ্যমে কর্ম সম্পাদনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে
- বিভিন্ন অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন করা
- সিটিজেন চার্টার ও বিলবোর্ড তৈরি করা
- তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন করা
- বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের কর্মকর্তাদের অবহিতকরণ বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন
- গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ
- তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যানের বরিশাল সফরের ব্যবস্থা করে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন
- জনপ্রতিনিধিদের সচেতন করে এ বিষয়ে তাদের কার্যকর ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা
- সামগ্রিক সচেতনতা আইনে সমন্বিত উদ্যোগ
- হাট-বাজার, জনসমৃদ্ধ অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার
- পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, জনসচেতনতামূলক নাটক, জারিগান, পথনাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করা
- জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল থেকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত কার্যক্রম গ্রহণ। যেমন : আলোচনা, উঠান বৈঠক, গণসংস্কৃতি
- সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কার্যকর ও ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপন
- স্থানীয় সরকারকে কার্যকরীভাবে এ আইনে সম্পৃক্ত করা
- গ্রামভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন। ইন্টারনেট ও বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত বই, লিফলেট ইত্যাদিসহ
- উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারীদের সচেতন করা
- জনপ্রতিনিধি ও তৃণমূলের ফোকাস গ্রুপকে নিয়ে কর্মশালা, সেমিনার, ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ
- মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচার
- তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার জন্য প্রচার অভিযান দল করা প্রয়োজন
- সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবাগ্রহীতাদের সমন্বয়সাধন করতে হবে
- এলাকাভিত্তিক, শ্রেণীভিত্তিক সমন্বয় কমিটি গঠন

- সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তথ্য সম্বলিত চিত্র প্রদর্শন করা।
- তথ্য অধিকার, প্রোগ্রামসহ স্থানীয় ও জাতীয় মিডিয়া অধিক প্রচারিত সংযোগ করা।
- বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে সচেতনতা আলোচনা
- সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য সরবরাহ করা
- লোকবল নিয়োগ করা।

- সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থায় তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্যকেন্দ্র গঠন
- তথ্য অধিকার আইন সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে
- সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য তথ্য কর্মশালার একটা নীতিমালা প্রস্তুত করতে হবে
- তথ্য প্রদানকারী সংস্থা ও আবেদনকারীর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন
- সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা
- জনগণের দ্বারা ওয়াচডগ কমিটি গঠন করে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা
- তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে, এমন এনজিওদের নিয়ে একটি জোট গঠন করা
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং তথ্য প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা
- সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের সুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা এবং তথ্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা
- এই আইন অবগতির জন্য মতবিনিময় সভা করা। জনগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনের ধারাসমূহ জানাতে হবে
- আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে (জনবল, উপকরণ বৃদ্ধি ও পদ্ধতির প্রয়োগ)
- কোন আপিল হলে নির্ধারিত সময়ে মধ্যে সম্পন্ন করা
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজেদের মধ্যে তথ্য আপডেট করতে হবে
- সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তথ্য-সংবলিত চিত্র প্রদর্শন করা
- তথ্য অফিস, প্রেসক্লাবসহ, স্থানীয় ও জাতীয় মিডিয়া অফিসে তথ্যচিত্র সরবরাহ করা
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সভা করা
- উপকারভোগী তথা সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য সমাবেশ প্রয়োজন
- তৃণমূল প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা ও বাস্তবায়নে সতর্ক করানো
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালাতে হবে
- তথ্য নিতে এলে সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের কর্মকর্তারা তথ্য দিচ্ছে কি না এটা সব সময় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে

সিলেট বিভাগ

সিলেট বিভাগের তথ্য অধিকার-সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের লিখিত মতামত

১. তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কাজ কোন জায়গা থেকে শুরু করা দরকার? সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কী?

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা জাতীয় সংসদ থেকে এ আইন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা প্রয়োজন।
- তথ্য মানুষের অধিকারের মধ্যে পড়ে এ বিষয়ে গণ-সচেতনতামূলক সংবাদ প্রকাশ বা প্রচার করা যেতে পারে, কোন কোন তথ্য উন্মুক্ত, কোন কোন তথ্য প্রকাশ করা যৌক্তিক নয়—এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করে জনগণকে জানানো যেতে পারে।
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করা দরকার, যেহেতু তথ্য প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে থাকে, সেহেতু সকল প্রতিষ্ঠান থেকেই শুরু করা উচিত, সমাজের সকল স্তরে একই সঙ্গে সচেতনতা বাড়াতে হবে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে এখনো সমাজের বিরাট অংশ সচেতন নয়, তাই আইনের বিষয়ে সকল পর্যায়ে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে, এজন্য ব্যাপক প্রচারণা চালানো উচিত, বর্তমানে এ আইন বিষয়ে সাধারণ ধারণা হচ্ছে, এটি মনে হয় সাংবাদিকদের জন্য। এর পরিবর্তন করা দরকার।
- প্রথমে সরকারি সংস্থাসমূহ থেকে তা উন্মুক্ত করতে হবে, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সংবিধানের ৩৯(১) ধারার আলোকে যথাযথ আইন প্রণয়ন, উক্ত ধারার সাথে সাংঘর্ষিক সকল আইন বাতিল করতে হবে, আমার কর্মরত সংস্থা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যেমন—সংস্থার কোনো তথ্য সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করা উচিত। আমার প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমরা যেহেতু গ্রাম পর্যায় থেকে কাজ করি। আইন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি এবং সঠিক আইন জনগণের মধ্যে তুলে ধরা বা প্রচার করার জন্য আমার প্রতিষ্ঠান কাজ করবে, আমার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠিত সংগঠনসমূহের নারী-পুরুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করে আইন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে, আইন প্রয়োগ নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে কি না বা জনগণের মধ্যে আইন কী সফলতা আনছে, আমার প্রতিষ্ঠান এর কিছু অংশে হলেও যাচাই করার কাজে সম্পৃক্ত থাকবে।
- মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করা দরকার, সংস্থাকে নিজ উদ্যোগে নিজের অস্তিত্ব তুলে ধরতে হবে, সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে সরকারি গণমাধ্যমে এ বিষয়ে স্বচ্ছ তথ্য প্রচার করতে হবে।
- পলিসি লেভেল থেকে কাজ শুরু করতে হবে, সাধারণ জনগণকে সচেতন করতে হবে, তথ্য অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে এ বিষয়ে আরো কাজ করতে হবে।
- সরকারি অফিস এখন তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা সচেতন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে, আমার প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে সকলকে অবহিত করতে হবে, একমুখী না হয়ে দ্বিমুখী তথ্য প্রদান ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

- প্রথমেই সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অবহিত করা দরকার, এ বিষয়টি পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করা দরকার, এ বিষয়ে নিজে জেনে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জানানো, প্রথমেই উচ্চ পর্যায় থেকে কাজ শুরু করা দরকার।
- স্থানীয় সরকার থেকে কাজ শুরু করতে হবে, সমাজসচেতন ব্যক্তিদের প্রথমেই ধারণা দিতে হবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে, সকলকে এ আইন জানাতে হবে।
- নিজের প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিজেকেই সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরতে হবে, সরকারি-বেসরকারি তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে গণ-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে হবে, এ অধিকার বাস্তবায়নে মানুষকে সচেতন করতে হবে, শিক্ষা ও কৃষি বিষয়ে অবাধ তথ্যপ্রবাহ থাকতে হবে, এ আইন জেনে নিজেকে ও সমাজকে সচেতন করতে হবে।
- প্রত্যেক অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ, নিয়মাবলি প্রচার (তথ্য প্রাপ্তির জন্য) করা আবশ্যক, তথ্য আইনে সঠিকভাবে সরবরাহ ও আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই, যেসব তথ্য প্রদানের উপযোগী সেগুলো প্রদান করা হবে, জনগণের স্বার্থে নিহিত যেসব কাজ সে সেবাগুলো নিশ্চিত করে মানিয়ে দেওয়া।
- জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন তথ্যাদি 'তথ্য অধিকার আইন'-বহির্ভূত রেখে অন্যান্য তথ্যাদি প্রকাশ করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'তথ্য সেল গঠন' করে জাতীয় পর্যায় থেকে তা প্রকাশ করা ও প্রচারের কাজ শুরু করা যায়, প্রকাশ ও প্রচারযোগ্য সকল তথ্য ইন্টারনেটে দেয়া যায়।
- Motivation Level থেকে শুরু করতে হবে, সাংবাদিকদের নিয়েই শুরু করা উচিত। কারণ প্রথমেই তারা এ আইন সম্পর্কে কর্মশালার মাধ্যমে জানা উচিত, তথ্য দিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছি, লোকজনকে জানার জন্য আসতে হবে, সেবাগ্রহীতারা এলে সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে জানা যাবে, তথ্য প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সচেতন রাখা হয়েছে।
- যেকোনো সংস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট থেকে শুরু হওয়া দরকার, কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, সুনির্দিষ্ট কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া, যিনি তথ্য নেবেন তার সম্পূর্ণ পরিচয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে দিতে বাধ্য থাকবেন, তথ্য প্রদানকারীকে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করতে হবে, যা এক সুনাগরিক একজন কর্মকর্তার কাছে থেকে আশা করেন।

২. এই বিভাগে (সিলেট বিভাগের) কী ধরনের কার্যক্রম তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়ক হবে?

- সিলেটের স্থানীয় পত্রিকায় সচেতনতামূলক সংবাদ প্রকাশ, সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে, কৃষক সমাবেশে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ নিয়ে প্রচারণা।
- এ আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণমাধ্যম কর্মীদের মতবিনিময়ের আয়োজন করা যেতে পারে, তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণ-পেশাজীবীদের মতবিনিময়ের আয়োজন– এ বিষয়ে কর্মশালায় আয়োজন করা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সচেতনতা কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে, স্থানীয় গণমাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচারণা চালানো উচিত।
- সহজবোধ্য ভাষায় তথ্য প্রকাশ করা, সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে জনসাধারণের দূরত্ব কমাতে হবে, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার এবং এ সম্পর্কে জনগণকে আস্থাশীল করে তুলতে হবে, দুর্নীতির মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে।
- মসজিদ-মাদ্রাসায় মাওলানা ও ইমামদের নিয়ে ওয়ার্কশপ, তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে সম্পৃক্ত করা, র‌্যালি ও সমাবেশ করা, আইন সম্পর্কে প্রচারাভিযান এবং সকল স্তরের মানুষদের নিয়ে ওয়ার্কশপ ও সেমিনার।

- বেসরকারি সংগঠনগুলোর মধ্যে সমন্বয়সাধন, তৃণমূল পর্যায় সবাইকে নিয়ে র‍্যালি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ আইনের প্রচার ঘটানো, সরকারি-বেসরকারি সকল প্রোগ্রামে এ বিষয়ে অ্যাজেন্ডা রাখা, লিফলেট, পোস্টার, ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

- এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ করাতে হবে, এ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন করতে হবে, এলাকা-এলাকায় অ্যাওয়ারনেস করতে হবে, অধিকার প্রাপক ও প্রদানকারীকে এ বিষয়ে জানাতে হবে, খুব বেশি এ বিষয়ে সম্প্রচার দরকার।

- তথ্য অধিকার আইনের ওপর বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতাসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে, ব্যানার, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড করে জনগণকে জানানো যেতে পারে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ বিষয়ে অবগত করা যেতে পারে, সিলেটের হাওর অঞ্চলের সংস্কৃতির মাধ্যমে এটি প্রকাশ করা সহায়তা হবে, চা-বাগানগুলোতে মালিকের সহায়তায় এটি বাস্তবায়নে সহজ হবে।

- বিনা মূল্যে সরকার জনগণকে কী সুযোগ দিচ্ছে সে তথ্য যেন সবাই সহজে জানতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে, চা-বাগানগুলোতে শ্রমিকদের এ তথ্য আরো সহজলভ্য করতে হবে, যেন সবাই বুঝতে পারে, হাওরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল বোর্ড দিতে হবে যেন এ বিষয়ে কৃষক সহজে তথ্য জানতে পারে, কারিগরি শিক্ষা কোথায় কীভাবে দেওয়া হয় সে বিষয়ে অবাধ তথ্য দিতে হবে।

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সঠিক তথ্য পাহাড় এলাকাগুলোতে ব্যবহার করতে হবে, হাওর অঞ্চলে হাওর উন্নয়ন বিষয়ে তথ্য দিতে হবে, আবহাওয়া অফিসকে আরো জোরদার করতে হবে যেন সহজে তথ্য পাওয়া যায়, এ বিষয়ে ইমাম/পণ্ডিতদের ব্যবহার করে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

- হাওর ও চা-শিল্পের জন্য আবহাওয়াবিষয়ক তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে, শিক্ষাবিষয়ক তথ্য আরো উন্মুক্ত করতে হবে, গুপ্ত হত্যা/নারীর আত্মহননসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে, আইনশৃঙ্খলা-বিষয়ক তথ্য আরো সহজলভ্য হতে হবে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় সরকারকে আরো বেশি তথ্য জনগণকে দিতে হবে।

- প্রত্যেক সংস্থার সিটিজেন চার্টার থাকা উচিত, অধিকারটি আদায় করতে পারছে কি না তা তদারক করা, সিলেট বিভাগে আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কি না, এর জন্য মনিটরিংয়ের উদ্যোগ নেয়া দরকার, তথ্য অধিকার আইনের সেক্টরওয়ারি মনিটরিং ব্যবস্থা চালু রাখা আবশ্যক, এনজিওগুলোর মাধ্যমে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা সেবার দিক উত্থাপন করা, কীভাবে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়নে জনগণকে অবহিত করতে হবে, জনগণ কী ধরনের সেবা পেতে পারে তা জানতে হবে। ব্যাপক হারে প্রচার করতে হবে, যাতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনগণ জানতে পারে।

- জাতীয় তথ্যভান্ডার থেকে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা যায়, বিভাগীয়-আঞ্চলিক বা এর নিম্ন পর্যায় থেকে তথ্য সরবরাহ করা হলে তথ্য বিভ্রাট বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

- সিলেটের জেলায় কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ তথ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা করে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বাস্তবিক অর্থে জনগণকে জানানোর জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে, কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকতে হবে, তথ্য আদান-প্রদানকারীদের পরস্পর সহযোগিতাসুলভ মনোভাব থাকতে হবে।

- জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে, প্রতিটি অফিসে কর্মকর্তাদের আইন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে, উপজেলা-জেলা পর্যায়ে পরিষদের সভায় বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা, জেলা প্রশাসক মহোদয় প্রতি মাসে জেলার কর্মকর্তাদের সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সভার আয়োজন করতে পারেন, প্রেসক্লাবের সদস্যগণ বিভিন্ন অফিসে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ২/৩ সদস্যের টিম গঠন করে বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান-প্রধানদের সাথে মতবিনিময় করতে পারেন।

৩. সিলেট বিভাগের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?

- সিলেট বিভাগে আসা সরকারি কর্মকর্তাদের বেশিরভাগই জনগণের সেবক ভাবেন না, শিক্ষাসচেতনতার অভাব, লেগে থাকার মানসিকতা কম এ অঞ্চলের মানুষের, তথ্য আনতে গিয়ে হয়রানির শিকার হন কি না— এই ভেবে অনেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তথ্য সংগ্রহ করতেই যাবেন না, তথ্য প্রদান করতে ও এ বিভাগে ঘুষ আদান-প্রদান হতে পারে।
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেই এ-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিই দায়ী। এরাই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সামাজিক সচেতনতার অভাব, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টিও উল্লেখ করা যেতে পারে, তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের বিষয়টি ক্ষেত্রবিশেষে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যেতে পারে।
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, দুর্গম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, সকল পর্যায়ে দুর্নীতি।
- সামাজিক রক্ষণশীলতা, অনুন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা, প্রবাসীদের মধ্যে আইন তুলে ধরা, শিক্ষার হার কম, ধর্মীয় গোঁড়ামি।
- আদিবাসীদের যেন হেয় না করা হয়, কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে সৎ থাকতে হবে, অফিসে বিলবোর্ড টাঙানো নিশ্চিত করতে হবে, ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
- স্বার্থান্বেষী মহলের বাধা, এ বিষয়ে অজ্ঞতা, বিশেষ মহলের করলে এটি এড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, অনেক অফিসে তথ্য অফিসার না থাকা।
- তথ্য না পাওয়ায় হাওর অঞ্চলে এত ক্ষতি হয়েছে, তথ্যের অভাবে সিলেটে শিল্প হচ্ছে না, তথ্যের গোপনীয়তার জন্য চা চাষ সঠিকভাবে হচ্ছে না, পুঁজিওয়ালাদের কাছে তথ্য না পৌঁছার কারণে বিনিয়োগ করছে না।
- সরকারি কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা, জনগণের হীনম্মন্যতা, প্রভাবশালীদের প্রভাব, সঠিক সময়ে তথ্য প্রদানে গাফিলতি।
- বিনা মূল্যে জনগণকে কী দিচ্ছে তা অনেকে জানে না, সহায়ক তহবিল বিষয়ে জানাতে অনাগ্রহী, তথ্য অফিসারের স্বল্পতা, তথ্য ঘাটতি, সচেতনতার অভাব।
- হাওর অঞ্চলে তথ্যের স্বল্পতা, সরকারি কর্মকর্তা ও জনগণের মধ্যে হীনম্মন্যতা, তথ্য প্রদানকারী অফিসারের খামখেয়ালিপনা ও অবহেলা, এখনো এ বিষয়ে ৭০ ভাগ মানুষ জানে না, অবাধ তথ্যের অভাব।
- মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়, যেহেতু শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত সুযোগ না পাওয়ার দরুণ এ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, অধীনস্থরা মনে করে, তথ্য দিলে সরকারের ক্ষতি হবে এমন মনোভাব পরিহার করতে হবে, বিভিন্ন আইনের দোহাই দিয়ে মানুষকে তার তথ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, তথ্য প্রদানকারী ও কর্মকর্তাদের তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে পরিপূরক আস্থার অভাব।
- তথ্য অধিকার আইনের প্রচারে ব্যবস্থাপনাজনিত সীমাবদ্ধতা, সঠিক তথ্য সংগ্রহে জনবল, দক্ষতা ও সাপোর্ট সার্ভিসের অপ্রতুলতা, তথ্য সমন্বয় ও সংরক্ষণে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব।
- সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তারা কী ধরনের সংবাদ এবং কতটুকু পেতে পারেন, প্রশিক্ষণবিহীন এবং অজ্ঞতাবশত কোন কোন ব্যক্তি অফিসের তথ্য, ব্যক্তিগত তথ্য, অফিশিয়াল সিক্রেটস অনুযায়ী যে তথ্য দেয়া যাবে সেসব তথ্য অথবা যেসব তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে আইনি জটিলতা, তা দেওয়া বাধ্য করার প্রবণতা থাকতে পারে। অযাচিতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজন, শত্রুতামূলকভাবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তথ্য প্রদানে চাপ প্রয়োগ করতে পারে, শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে সিলেটে কম থাকায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হতে পারে। তথ্যগ্রহীতার সুনির্দিষ্টভাবে সঠিকভাবে তথ্য চাইতে হবে।

৪. আগামী এক বছর পর তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের কতটা অগ্রগতি হয়েছে তা পরিমাপের জন্য কী মাপকাঠি ব্যবহার করা যেতে পারে?

- প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো কম্পিউটার ব্যবহার করে কি না, তথ্য চাহিবামাত্র দেয়ার ব্যবস্থায় রাখা হয় কি না, সাধারণ মানুষের মধ্যে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে, সাংবাদিক তথ্য অধিকার আইনের সুফল পেয়েছেন কি না, তা জানতে ওয়ার্কশপ করা যেতে পারে।
- এ ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে এ বিষয়ে জনমত জরিপ করা যেতে পারে, তথ্যদাতা এবং তথ্যগ্রহীতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।
- সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে তথ্য চার্ট আছে কি না, তথ্য চাওয়ামাত্র পদক্ষেপ নেয়া হয় কি না, জনগণের আস্থা অর্জন করছে কি না, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আচরণ পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে, দালালের দৌরাত্ম্য কমেছে কি না।
- জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে, বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের ব্যক্তি ও পেশাজীবীদের নিয়ে আলোচনা করে কিছু ইন্ডিকেটর তৈরি করতে হবে। এক বছর পর সেই ইন্ডিকেটর অনুযায়ী মনিটরিং করতে হবে।
- আইনগত সহায়তা পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পেলে বোঝা যাবে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার আবেদন বৃদ্ধি পেলে, হাওর অঞ্চলে না ডুবলে, মৎস্য খাতে ক্ষতি না হলে।
- ক্ষতির পরিমাণ কমে আসবে, সরকারি অফিসগুলোতে জনগণের যাতায়াত বৃদ্ধি পাবে, সমস্যার সমাধান পাওয়া সহজ হবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে।
- নৈতিক পরিবর্তন হবে, দুর্নীতি কমবে।
- সংবাদমাধ্যমের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। এর ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করা যেতে পারে, এক বছর পর জরিপ চালানো যেতে পারে তথ্য গ্রহণ করাদের নিয়ে, তথ্য প্রদানকারীদের সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে, কী পরিমাণ তথ্য দিয়েছেন, আইনের অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে জানিয়ে দেওয়া যেতে পারে, যেকোনো বিভাগে বিভাগীয় পদোন্নতির ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অন্তর্ভুক্তি করা দরকার।
- বিভিন্ন আবেদনের সংখ্যা যাচাই করে।
- লোকজন কতটা জানতে চেয়েছে।
- বিষয়গুলো যাচাই, স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের মনিটরিং ব্যবস্থা থাকতে পারে, সেবা প্রদানকারী ও গ্রহণকারীদের নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া, জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ভালো কর্মদক্ষতা ও সেবা প্রদানে অবদানস্বরূপ পুরস্কৃত করা যেতে পারে।
- জনমত জরিপ করা যেতে পারে, তথ্য প্রাপ্তির সহজলভ্যতার মাত্রা নিরূপণমূলক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কতটি সেবা প্রদান করেছেন তার পরিসংখ্যান টানা, সেক্টরওয়ারি জবাবদিহিতা প্রয়োজন, প্রতিনিয়ত কতজনের সাথে আলোচনা করেছেন তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানো, সেবার মানদণ্ড বিবেচনা করে পুরস্কৃত করা যে, যে ক্ষেত্রেই হোক, সম্প্রতি উদ্বুদ্ধকরণে খেলার মাধ্যমে তথ্য অধিদপ্তর দুজনকে পুরস্কৃত করেছে।
- নমুনায়নের মাধ্যমে জরিপকাজ পরিচালনা করা যেতে পারে, ক্লাস্টার সিস্টেম বা গুচ্ছ নমুনায়নের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে, জেলা-উপজেলায় মিটিংয়ে জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, তথ্য নেওয়ায় যারা বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তথ্য নেওয়া যেতে পারে, দৈব নমুনায়ন পদ্ধতি অণুসরন করে তথ্য নেওয়া যেতে পারে।

৫. সার্বিকভাবে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে আপনার কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে কি?

- সকল সরকারি ও বেসরকারি অফিসে অফিস-প্রধান ছাড়াও তথ্য প্রদানের জন্য বিকল্প থাকতে হবে। অতি গুরুত্বপূর্ণ যেসব তথ্য প্রদান করতে রাষ্ট্রীয় বাধা নেই, সেসব তথ্য কম্পিউটারে ফাইল করে রাখা যেতে পারে, কেউ চাইলেই সিডি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে সরবরাহ করার সুবিধার জন্য। প্রত্যেকটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন হলে বা মেনে চললে জনগণ কীভাবে উপকৃত হবে সে বিষয়ে একটি করে বিলবোর্ড করা যেতে পারে।
- আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের নানা অসংগতি, অনিয়ম, দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তি পর্যায়ের অনিয়ম-দুর্নীতি ঠেকাতে এই আইন বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে। তথ্য প্রাপ্তির বা জানার অধিকার নিশ্চিত হলে দুর্নীতি-অনিয়ম কমে আসবে। এজন্য তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক হতে হবে।
- একমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছাড়া কোনো তথ্যই গোপন রাখা উচিত নয়। মানুষের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও তথ্য অধিকারে বাধাগ্রস্ত করে। আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অধিকারসচেতন নয়; সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রান্তিক আধুনিক ও ইতিবাচক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার আইনের ১৯ ধারার ধারেকাছেও আমাদের দেশ নেই, আর কোনো সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ নয়।
- আইনটি বাস্তবায়নের আগে জনগণকে অবহিতকরণের জন্য ২-৩ বছর আগে থেকেই প্রচারাভিযান চালানো দরকার ছিল। আমাদের দেশে আইন প্রণয়ন হয় কিন্তু জনগণের অসচেতনতা ও না জানার কারণে বাস্তবায়ন সফলতা পায় না। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী রাজনৈতিক ব্যক্তি ও দল, সুশীল সমাজ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার– সবার আইন বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মাঠ পর্যায়ে সাধারণ জনগণকে অবহিত করতে হবে। আদিবাসীসহ সাধারণ মানুষের জন্য/কাছে সহজলভ্য করতে হবে। গণমাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে রোড শো করাও সম্ভব।
- এ বিষয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ-কৌশল ব্যবহার করতে হবে, এটি বাস্তবায়ন হওয়া দরকার কাজে। এই আইন সবাইকে জানাতে হবে, এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন করতে হবে। এ আইন বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে।
- এ আইনের অনেক পরিবর্তন দরকার। যা হয়েছে তা শতভাগ বাস্তবায়ন চাই। তথ্য অফিসার সব অফিসে শতভাগ নিয়োগ হতে হবে। তথ্য অফিসারকে আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- এ বিষয়ে সমাজের সকলকে আরো উদ্যোগী হতে হবে। এটি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে আগে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সরকারি তথ্য অফিসের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে ছোট নাটক, ছবি, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার।
- ব্যানার, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড করে এ বিষয়ের প্রচার দরকার। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সবাইকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তথ্য না প্রদান করলে অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা করা যেতে পারে– এ বিষয়ে জনগণকে জানাতে হবে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অফিসারের উদার থাকতে হবে, সবাইকে তথ্য পাওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে।
- ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড সব অফিসে ব্যবহার করতে হবে। তথ্য অফিসারকে অনেক তথ্য নিজে থেকে দিতে হবে। আইনজীবী/সাংবাদিকদের এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। এর ধারকদের আত্মোপলব্ধিতে নিয়ে আসতে হবে।
- মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যা পাওয়ার তা পেলেই হবে। স্থানীয় ইস্যুকে এ আইনের আওতায় এনে জানার অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ আইনের আওতায় এনে সিলেট অর্থনৈতিক জোন তথ্য সবাইকে জানাতে হবে, প্রবাসীদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করে মিল-কারখানা গড়ার বিপুল সম্ভাবনা এ আইনের আওতায় এনে সবাইকে জানাতে হবে।

- আরো প্রচার করা দরকার। উক্ত আইনের ব্যপারে সচেতন হওয়া ও বাস্তব প্রয়োগ নীতিমালা থাকা আবশ্যক। ১৯২৩ সালের অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের সঙ্গে এটা পরস্পরবিরোধী কি না দেখা দরকার। জবাবদিহিতার স্বার্থে প্রত্যেকটি বিভাগের কী কী তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায়, তার তালিকা টাঙানো দরকার। তথ্য অধিকার কমিশন থাকা উচিত। সরকারকে সময় সময় কাজের ধরন জানাবেন কীভাবে কী করা উচিত।

- আইনটি খুবই সময়োপযোগী, জনবান্ধব। এর ফলে জনগণ সচেতন হবে। তথ্য অধিকার আইনের ফলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবে। যথাসময়ে এর কার্যক্রম শুরু হওয়া প্রয়োজন। এ আইনের প্রতি সবাইকে শ্রদ্ধাশীল থেকে সেবা প্রদানে কাজ করে যেতে হবে। তথ্য প্রদানে কোনো কর্মকর্তা অনীহা প্রকাশ করলে তা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো আবশ্যক। এর পরও সুরাহা না হলে সিভিল কোর্টে মামলা দায়ের করতে পারেন।

- তথ্য অধিকার আইনের অন্তরালে জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এমন তথ্যাদি অন্যদের হাতে চলে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হতে পারে। এ সম্ভাবনা দূরীকরণে সবাইকে সর্বাত্মক সচেষ্ট হতে হবে। জনস্বার্থ সংরক্ষিত হয়, এমন তথ্যের অবাধ প্রবাহ শুধু কল্যাণকর হবে।

- আইন করায় ভালো হয়েছে। এটা সাধারণ জনগণের জন্য জটিল, তাদের জন্য সাধারণভাবে আইনটি উপস্থাপন করা প্রয়োজন। প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা থেকে উত্তরণ করার উপায় বের করা, যারা সেবা নিতে আসে তাদের সঠিক সেবা সম্পর্কে জানতে হবে। কেউ ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চাইলে তা দেওয়া সম্ভব হবে না সে বিষয়ে জানতে হবে। তথ্য নিতে পারিপার্শ্বিক খরচ ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

- সংবিধানের সাথে এবং দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইনের সাথে তথ্য অধিকার আইন সাংঘর্ষিক কি না, আরো খতিয়ে দেখা দরকার

- যেহেতু আইনটি এ ব্যাপারে সেবা প্রদান ও গ্রহণকারীর ব্যাপকভাবে জানানোর জন্য আরো সময়ের প্রয়োজন, তাই। মামলা গ্রহণ ও শাস্তির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো অনীহার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাকে প্রথমে জানানো প্রয়োজন এবং তিনি ব্যর্থ হলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারেন। আমরা স্বাধীন জাতি, তাই সাংবিধানিকভাবে তথ্য পাওয়ার অধিকার একজন নাগরিকের রয়েছে। একটি সভ্য জাতির জন্য এ আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এর সুফল পেতে হলে তথ্য প্রদানকারীকে বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে।

জাতীয় সেমিনার

জাতীয় সেমিনার

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০, শেরাটন হোটেল, ঢাকা

Right to Information Act

How to Move Forward

সঞ্চালক	:	*মনজুরুল আহসান বুলবুল* এডিটর ইন চিফ অ্যান্ড সিইও, বৈশাখী টিভি
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক	:	*ড. অনন্য রায়হান* নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট
আলোচক	:	*ড. ইফতেখারুজ্জামান* নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
		তানজিব-উল আলম অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট
প্রধান অতিথি	:	*আবুল কালাম আজাদ* মাননীয় তথ্যমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিশেষ অতিথি	:	*শাহীন আনাম* নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশান
		জেমস এফ মরিয়ার্টি বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত
		ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
		গোলাম রহমান চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন
		মোহাম্মদ জমির প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ
সভাপতি	:	*হাসিবুর রহমান* নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

স্বাগত বক্তব্য

মো. সাহিদ হোসেন

অ্যাডভাইজর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এমআরডিআই

শুভেচ্ছা সবাইকে। ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভের আয়োজিত আজকের এই জাতীয় সেমিনারে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ; বিশেষ অতিথি প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মো. জমির; দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান; তথ্যসচিব জনাব আব্দুল নাসের চৌধুরী; বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি; তথ্য অধিকার ফোরামের কনভেনার মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহিন আনাম; এই সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অনন্য রায়হান; আলোচক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক জনাব ইফতেখারুজ্জামান এবং ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম (এখনো এসে পৌঁছাননি); অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, সিইও এবং প্রধান বার্তা সম্পাদক, বৈশাখী টিভি এবং সভার সভাপতি জনাব হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই; উপস্থিত সুধীবৃন্দ আসসালামুআলাইকুম and a very good morning to all of you। এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। দেশের নাগরিক, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এ সরকারের জনগণের প্রতি জবাবদিহিতার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় এমআরডিআই ইউএসআইডি প্রগতির সহায়তায় গত সাত মাসে ১২টি জাতীয় ও ৭টি স্থানীয় পত্রিকার ৩৮০ জন সাংবাদিক, তৃণমূলের ৪১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প-প্রধান এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সারা দেশের ১০০ জন পরিচালক ও উপ-সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার কর্মচারীকে তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। পাশাপাশি বিভাগীয় শহরে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ব্যুরো-প্রধান জনাব ফরিদ হোসেন; আইন বিশেষজ্ঞ মো. মইনুল কবির এবং ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম। তারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

এই সব সভা থেকে সমন্বিত প্রতিবেদন উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে আজ এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। বিভাগীয় মতবিনিময় সভার সুপারিশমালার সমন্বয়ের কাজটি সুচারুভাবে সমপন্ন করেছেন ড. অনন্য রায়হান এবং আজকে তিনি মূল প্রবন্ধটি উপস্থাপন করবেন আপনাদের কাছে। এই জন্য তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা। আজকের সভার আলোচনা ও পরামর্শ থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকার, তথ্য কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এমআরডিআই আশা করে, প্রতিবেদনটি তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করবে। আমরা কৃতজ্ঞ তথ্য অধিকার ফোরামের কাছে। For our foreigner guests, as the seminar will be in Bangla, if you need translation, MRDI will provide that facility। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুলকে দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে।

সঞ্চালক

মনজুরুল আহসান বুলবুল, সিইও এবং প্রধান বার্তা সম্পাদক, বৈশাখী টিভি

ধন্যবাদ জনাব সাহিদ হোসেন। এখানে আমি যাদের দেখতে পাচ্ছি, তারা কোনো না কোনোভাবে এই আইন প্রণয়ন, প্রণয়নের পূর্ব ও পরবর্তী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। আমি ধন্যবাদ জানাই আজকের সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দকে এবং মাননীয় তথ্যমন্ত্রীকে, এই অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে সংসদে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমি দুটি লাইন বলে আমার কাজ শুরু করতে চাই, সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশে এই প্রথম একটি আইন যে আইনের প্রণয়নের আগে থেকে জনসচেতনতামূলক কাজ শুরু হয়। এখনে উপস্থিত আছেন তথ্য অধিকার ফোরামের কনভেনর শাহিন আনাম, তিনিসহ আমাদের সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা এই আইন প্রণয়নের পটভূমিতে কাজ করেছেন। এবং সম্ভবত এই প্রথম কোনো আইনের খসড়া উপস্থাপন করা হয় স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে এবং মতামত নেওয়া হয় এবং মতামত নেবার প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়। শুধু তা-ই নয়, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী যখন এই আইনটি সংসদে নিয়ে যান, তখন সংসদ থেকে গঠন করা কমিটির বক্তব্য, মত ও মন্তব্য নিয়ে এই আইনটি পাস হয়। এর মধ্যে নানা অসম্পূর্ণতা মনে হয় আছে, যা ধীরে ধীরে আমরা সংশোধন করে নেব। তার পরও আমরা আশাবাদী যে একটি আইন হয়েছে এবং যোগ্য একজন তথ্য কমিশনারের নেতৃত্বে এর যাত্রা শুরু হয়েছে।

এই আইন বাস্তবায়নের সচেতনতা সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় এমআরডিআই দেশব্যাপী সেমিনারের মাধ্যমে এই আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত ও সুপারিশমালা নিয়েছে। আজকে সেই মতামত ও সুপারিশগুলো একটি সংক্ষিপ্তসারে ড. অনন্য রায়হান আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন।

আমরা নির্ধারিত সময় থেকে কিছু পিছিয়ে আছি। সুতরাং যে মূল প্রবন্ধটি পরিবেশন করা হবে, যা নিয়ে আমরা আলোচনাটি করব তা সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা যেন নতুন পয়েন্ট তুলে আনি, যাতে যারা এই আইন নিয়ে কাজ করছেন, তারা উপকৃত হতে পারেন। আমাদের মধ্যে প্রায় সবাই উপস্থিত আছি শুধু ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম ছাড়া। আমরা আশা করব, তিনি অতি শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগ দেবেন।

যেই সংক্ষিপ্তসারটি আপনাদের কাছে আছে তা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে মূল বিষয়টি কত বড়। আমি অনুরোধ করব ড. অনন্য রায়হানকে, যেন তিনি এই সংক্ষিপ্তসারটিকে সংক্ষিপ্ত করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক

ড. অনন্য রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট

Dear Foreign guests you have the English translation of the summary, you can flip through the pages for a glimpse of the discussions that will take place। প্রথমেই আমি প্রধান অতিথিবৃন্দ, ইউএসএআইডি প্রগতি এবং এমআরডিআইকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আরটিআই অ্যাক্ট ২০০৯ প্রণয়নের পেছনে বেসরকারি সংস্থা, মিডিয়া ও সিভিল সোসাইটি অরগানাইজেশনগুলো সরকারের সাথে ওতপ্রোতভাবে কাজ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এর ফলে আমরা ২০০৯ মার্চে আইনটি পাই এবং জুলাই মাসে এটি কার্যকর হয়। ইতোমধ্যে একটি বছর পার হয়ে গেছে। এই এক বছরে আইনটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কী। যারা আইন-সংশ্লিষ্ট

আছেন তারা আইনটিকে কীভাবে বাস্তবায়ন করছেন। আইনটিকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানাটা জরুরি ছিল। পাশাপাশি আমরা আরও কীভাবে একসঙ্গে কাজ করতে পারি বিষয়গুলো চিহ্নিত করা জরুরি ছিল। সে কারণেই এমআরডিআই সারা দেশব্যাপী বিভাগীয় পর্যায়ে সভার আয়োজন করে। এই সভাগুলো খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল এবং চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুধু সিলেটে সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। সেখান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং আজকে ঢাকায় এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যেখানে এই বিভাগগুলোতে যেসব বিষয় আলোচনা হয়েছে তা আলোচনা করব। এই আলোচনাগুলো মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি, বিচারক, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জনপ্রশাসন এবং তৃণমূল-পর্যায়ের উন্নয়নকর্মীরা। এবং সবাই তাদের মতামতগুলো খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করেছেন। আজকে আমরা যে উপস্থাপনা করতে যাচ্ছি সেটা মূলত তৃণমূল-পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। এখানে আমার কোনো নিজস্ব বক্তব্য নেই বললেই চলে, শুধু উপসংহার ছাড়া। যেগুলো খুব প্রবলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলো আমি উপস্থাপন করছি। যেসব বিষয়ে আমরা মতামত পেয়েছি, সেগুলোকে কয়েকটি মোটা দাগে ভাগ করা।

- একটি হলো সাধারণ মানুষের এই আইন সম্পর্কে ধারণা কী এবং এই আইন সম্পর্কে তারা কতটুকু জানতে পেরেছেন।
- দ্বিতীয়টি হলো তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কী?
- আইনের দুর্বলতা ও সবলতা সম্পর্কে মানুষ কী মনে করছেন এবং তারা কী মতামত প্রকাশ করছেন সেটি।
- চতুর্থত আইনের যে চাহিদার দিক অর্থাৎ যাদের জন্য আইনটি হয়েছে, আইনের যে সরবরাহের দিক, সে ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। কী করা যেতে পারে? করণীয় কী হতে পারে? যার ফলে আইনটি বাস্তবায়ন সহজ হয়।

বিশেষ করে, এখানে মতামতগুলো উপস্থাপিত হয়েছে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান কী করতে পারে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মতামতগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। সবশেষে আইনটা বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যালোচনা আমরা কীভাবে করতে পারি। প্রত্যেকটি ক্যাটাগরিতেই মূল যে মন্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে আমি প্রথমেই তা উপস্থাপন করব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিও উপস্থাপিত করব, যেগুলো আলোচনার জন্য সুবিধা হবে।

সাধারণ যে আইন সম্পর্কে সচেতনতা সাধারণ মানুষের, সেগুলো সম্পর্কে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ মতামত এসেছে কিংবা আমাদের পর্যবেক্ষণে আমরা যেগুলো দেখেছি যে কিছু কিছু স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর আইন সম্পর্কে ভালো ধারণা রয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে এটি সম্পর্কে সচেতনতা আশানুরূপ নয়। সব জায়গায় সব বিভাগেই আমরা এটা দেখতে পেয়েছি। খুবই উপরি ভাষায় আইন সম্পর্কে একটা ধারণা রয়েছে। প্রায় সব আলোচকই যে বিষয়টি চিহ্নিত বা বলতে চেয়েছেন, যেটি খুবই উদ্বেগজনক মনে হয়েছে আমাদের সবার কাছে যে আইনটি মূলত গবেষক, সাংবাদিক ও আইনজীবীদের জন্য। এটি যে সাধারণ মানুষের তথ্য অধিকারের জন্য, সে বিষয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। এবং আরেকটি বিষয়ে সবাই বিভ্রান্ত যে তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও পরিধি কতটুকু এবং আইনটার ইনফোর্সমেন্ট কীভাবে হতে পারে সে সম্পর্কেও অনেকটা বিভ্রান্তি লক্ষ করা গেছে। এবং আমরা একটি সাধারণ প্রবণতা লক্ষ করেছি, সবাই আইনটির দুর্বলতা অনুসন্ধানে বেশি ব্যস্ত এটি বাস্তবায়ন কীভাবে হতে পারে তার থেকে।

যেসব ইতিবাচক মন্তব্য এসেছে আইন সম্পর্কে এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কে যে এ আইনের ফলে আইনের শাসন, মানবাধিকার, রাজনৈতিক ও সামাজিক যে ইকুইটি এবং জাস্টিস এনশিওর করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এ আইনের ফলে জনগণের যে ধারণা মৌলিক অধিকারগুলো সম্পর্কে, সেগুলো আরও স্পষ্ট হবে এবং শক্তিশালী করা সম্ভব হবে। এ আইনের ফলে সরকার আরও বেশি জবাবদিহিমূলক হবে। এবং সাংবাদিকবৃন্দ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম করতে আরও বেশি সহজে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এবং অনেকেই মনে করেছেন, এ আইনের বাস্তবায়নের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করা সহজ হবে। এবং আরটিআই-এর ফলে একটি স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বচ্ছতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং অধিকাংশ মানুষ মনে করেছেন যে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে এ আইন একটি বড় ভূমিকা পালন করবে।

যেসব ইতিবাচক ধারণা উঠে এসেছে, তার মধ্যে আমি চারটি উপস্থাপন করতে চাই।

— খুলনায় একজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা হতাশা ব্যক্ত করেছেন আইন সম্পর্কে ধারণার যে নিম্নমাত্রা সেটি দেখে। যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের ধারণাই যদি এমন হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের ধারণা কেমন হবে, এ ব্যাপারে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সচেতনতার ব্যাপারটি যে খুব নিচের দিকে, এটি হতাশার ব্যাপার। অনেকেই এ মত ব্যক্ত করেছেন।

— দ্বিতীয় যে দিকটি এসেছে যে চাহিদার দিকটি এবং যোগানের দিকটি আছে, যদি চাহিদার দিকটি অনেক বাড়ে অর্থাৎ মানুষ অনেক তথ্য চাওয়া শুরু করে কিন্তু সে অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে না পারে, সে ক্ষেত্রে একটি হতাশা তৈরি হবে। এবং আইন সম্পর্কে একটি নীতিবাচক ধারণা তৈরি হবে। যে ব্যাপারে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে।

— এর পরের যে মন্তব্যটি এসেছে, কোটেশন দিয়ে উপস্থাপন করেছি : 'বাংলাদেশের এখন সবকিছুই অনিয়মে পরিণত হয়েছে। সবকিছুর আগে এ অনিয়ম প্রতিরোধ করা দরকার। প্রশাসন এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে সাধারণভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয়। তথ্য আনতে গেলে টাকা দিতে হয়। যেখানে যে কাজের জন্য যাই না কেন, ঘুষ দিতে হয়। সেখানে তথ্য অধিকার আইন কতটুকু কার্যকর হবে বলা মুশকিল।' এটি একজন বক্তার উদ্ধৃতি আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম।

— আরেকটি হচ্ছে : 'রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা শিক্ষিত মানুষের কতজনই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কতটা জানে। এমনকি আমি যদি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৭ হাজার শিক্ষার্থী সম্পর্কেই ধরি, তাদের মধ্যে কত জন এই আইন সম্পর্কে জানে। শিক্ষকরাই বা কয়জন জানেন। না জানার কারণ হলো এই আইনের প্রচার-প্রচারণা কম হয়েছে। যেভাবে প্রচার-প্রচারণা উচিত ছিল, আমার মনে হয়, তা সম্ভব হয়নি।'

মোটামুটি এগুলোই নেতিবাচক মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ। এবং চট্টগ্রামে একজন সাংবাদিক বলেছেন, 'আমি একজন মাঠপর্যায়ের সংবাদকর্মী। সে অবস্থান থেকে আমার কথাগুলো বলা। আমি এ আইন পাস হওয়াতে ঝামেলায় আছি। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, কেন ঝামেলায় আছি? এ আইন পাস হওয়ার আগে আমার তথ্য সংগ্রহ করতে কোনো সমস্যা হয়নি। কিন্তু পাস হওয়ার পর ঝামেলা হয়েছে। আগে আমি এক দিনে একটি ভালো রিপোর্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারতাম, এখন সেটা তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পরে পাই না। এখন দেখি হিতে বিপরীত হলো।'

তথ্য কমিশন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা

এটি হচ্ছে যে তথ্য কমিশন গঠনে যে প্রক্রিয়া সেটি যথেষ্ট স্বচ্ছতামূলক উন্মুক্ত ও গঠনমূলক অংশীদারিত্ব হতে পারত, যেটি আসলে হয়নি। দ্বিতীয় হচ্ছে, তথ্য অধিকার আইনের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করবে একটি শক্তিশালী তথ্য কমিশনের ওপর। এবং সবাই সেটি দেখতে চায়। তথ্য কমিশন গঠন এবং অ্যাকটিভ হতে অনেক সময় লাগছে, সে ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন। তথ্য কমিশনারের সংখ্যা যে কজন রয়েছেন, অনেকে বলেছেন, এটি যথেষ্ট নয়, সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। এবং বড় সীমাবদ্ধতা রয়েছে তথ্য কমিশন যে রায় দেবে সেটি চ্যালেঞ্জ করার অধিকার আইনে রাখা হয়নি।

শক্তিশালী দিক

— আইনের শক্তিশালী দিকগুলো সম্পর্কে আমার মতামত যে আইনের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে কোনো নাগরিক তথ্য না চাইলেও সেকশন ৬ অনুযায়ী কিছু তথ্য তাদের স্বপ্রণোদিত হয়ে উপস্থাপন করতে হবে। এটি একটা আইনের শক্তিশালী দিক। আরেকটি হচ্ছে যে খুব কম আইনই রয়েছে বাংলাদেশে, যেটি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক কমিশন রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন এমন একটি আইন। আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনগুলোকেও এখানে কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানও এখানে কর্তৃপক্ষ। এটি আইনের একটি শক্তিশালী দিক। এবং এটি একটি মাইলফলক এই আইনের।

— আরেকটি ইতিবাচক দিক হলো তথ্য দিতে না চাইলে বা ভুল তথ্য দিলে এটি একটি পানিশেবল অফেন্স এবং তিন ধরনের পানিশমেন্টের কথা বলা হয়েছে।

— আরেকটি হচ্ছে প্রতিবন্ধী মানুষের তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে।

আইনের দুর্বলতার দিক

- তথ্য পাওয়ার যে প্রক্রিয়া, এটি ২০ দিনের সময়ের ব্যাপারে অনেকেরই আপত্তি রয়েছে যে তথ্য পাওয়ার জন্য এত দেরি কেন লাগবে। এটা আরও কমানো যায় কি না এবং একে সংশোধন করা যায় কি না। একজন সরকারি কর্মকর্তার উক্তি হলো, 'আইনের ২৭(ঙ) ১ ও ৩-এ আইনের শাস্তির বিধান সম্পর্কে যে বলা হয়েছে জরিমানা ও বিভাগীয় শাস্তির কথা দৈনিক ৫০ টাকা হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা। এখন দুটি শাস্তির জন্য ১০ হাজার টাকা জরিমানা করলে আমার তো বেতন থাকবে না। তাতে করে আমাকে দুর্নীতির দিকে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। জরিমানা ও অসদাচরণ যেকোনো একটি বিধান থাকা দরকার। এ ক্ষেত্রে শুধু অসদাচরণের জন্য শাস্তির বিধান করা উচিত। এটি আমি সংশোধন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।' এটি কয়েক জায়গাতেই অনুরণিত হয়েছে।

- আর একটি দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে, দিবস ও কার্যদিবসের পরিষ্কার ব্যাখ্যা কিছু কিছু জায়গাই বলা নেই। তার ফলে ১০ দিন ২০ দিন যেসব সীমা রয়েছে সে ক্ষেত্রে আরও বেশি সময় লাগতে পারে।

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের যে দিক

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের যে দিকগুলো সেগুলো সম্পর্কে অনেকে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। সাধারণভাবে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট ল'ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি তথ্য চাওয়ার ঘটনা যে, বিজিএমইএ ভবন যে বেগুনবাড়ি খালে হয়েছে, এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পত্রিকায় এসেছে। আরেকটি হচ্ছে রিচার্স ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশের দলিত সম্প্রদায়ের তথ্য চাওয়ার যে ঘটনা পত্রপত্রিকায় এসেছে এবং আমরা জেনেছি। কিন্তু এর বাইরে কী কী তথ্য সাধারণ মানুষ নিয়েছে সেগুলো কিন্তু পত্রিকায় আসেনি। বক্তাদের মতে, যারা এই পাঁচটি বিভাগীয় শহরে বক্তব্য রেখেছেন তাদের মতে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কথা বিবেচনা করলে আইনের বাস্তবায়নের অগ্রগতি মাত্র ১০ শতাংশ। এটি কম অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করে। অনেকেই মনে করেছেন যে সরকারি কার্যালয়গুলোতে ইতিবাচক মনোভাব দেখানো হয়েছে আগের থেকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে। কোনো কোনো এনজিও, বিশেষ করে যারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে তারা তাদের তথ্য, অর্থের উৎস এবং অন্যান্য তথ্য প্রকাশ্যে প্রকাশ বা প্রচার করছে। বিশেষ করে, খুলনা অঞ্চলে এ রকম বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও এটা বাধ্যতামূলক, তবু এনজিওগুলো সময়মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি। মাত্র ২ শতাংশ এনজিও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। এবং এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো চিঠির পরে অনেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেছে। এটি আমাদের জন্য একটি বড় চিন্তার কথা কারণ, এই আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরোর একটি বড় ভূমিকা ছিল। খুলনাতে একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেছেন যে তিনি আইন প্রণয়নের জন্য অপেক্ষা করেননি, তিনি নিজ উদ্যোগেই নয়টি উপজেলাতেই উঠান বৈঠক করে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো শুরু করেছেন। এবং অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য জানাতে শুরু করেছে।

- দু ধরনের মতামত হয়েছে এই আলোচনায়। একটি হচ্ছে, তথ্য চাইলে পাওয়া যায় না; অন্যটি, কেউ তথ্য চাইতে আসে না। অনেকেই বলে, 'দোকান খুলে বসে আছেন কেউ আসছে না'; আবার অনেকেই বলছেন, তথ্য চাইলে পাওয়া যায় না।

- কক্সবাজারের একজন সাংবাদিক দুটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা উল্লেখ করেছেন। একটি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি কিছু তথ্য চাইতে গেছেন এবং ১১ দিন গেছেন এবং আইন অনুসারে শেষ পর্যন্ত তিনি চেয়েছেন, যেটা আগে তিনি এমনিতেই গেলে পেতেন, সেটা তাকে বলা হয়েছে আবেদন করতে। আইনের কপি তাকে দেখানো হয়েছে যে আপনি আইন পেতে গেলে তথ্য আমরা ৩০ দিন পরে দেব। এখানে আমি সে সাংবাদিকের নামও প্রকাশ করেছি তার অনুমতি নিয়ে। তিনি নাম প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বান্দরবানের বেতারকেন্দ্র কবে তৈরি হয়েছে, এ রকম আরেকটি তথ্য তিনি জানতে চেয়েছেন। সে ক্ষেত্রেও তাকে বলা হয়েছে, দেশে এখন তথ্য অধিকার আইন চালু হয়েছে। তথ্য পেতে দরখাস্ত করে ২০ দিন অপেক্ষা করতে হয়। এবং তিনি পরামর্শ দেন, আপনি আজই দরখাস্ত করুন, ২০ দিনের মধ্যেই আপনি তথ্য পেয়ে যাবেন।

- আমি আগেই বলেছি, সবাই আইনের খুঁত ধরতে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন, আমি তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি। আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ—একটি হচ্ছে জনগণের ব্যাপক অসচেতনতা। এবং আরেকটি হচ্ছে জনগণের উদাসীনতা। উদাসীনতার কারণ সিলেটের একজন প্রতিনিধি বলেছেন, এখানে যারা আসেন, তারা কখনোই নিজেদের জনগণের সেবক ভাবেন না। সচেতনতার অভাব, লেগে থাকার অভাব, হয়রানি শিকার হওয়ার কারণে অনেকে তথ্যের জন্য যান না। এটি একটি চ্যালেঞ্জ মনে করেছেন। তথ্য চেয়ে লাভ নেই। এমন একটি মানসিকতা।

- দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিয়োগে অবহেলা। দক্ষ জনবলের অভাব। অবকাঠামোগত অভাব। তথ্যপ্রযুক্তির যে অবকাঠামো তা যথেষ্ট নয়। প্রশিক্ষণের অভাব। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের কর্মকর্তাদের একধরনের নেতিবাচক মানসিকতা। তথ্য চাওয়াকে অনেকে মনে করেছেন সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা। অর্থাৎ যারা ক্ষমতার কাছাকাছি রয়েছেন, তাদের সঙ্গে

ক্ষমতাসীনদের সম্পর্ক, সে সম্পর্কের কারণেই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা খুব কম সংগঠনগুলোর হয়। এই কারণেই তথ্য অধিকার আইন করে তথ্য আদায়ের ঘটনা সীমিত। এগুলো তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে যেসব সুবিধাভোগী গোষ্ঠী জড়িত, তাদের সম্মিলিত নেতিবাচক মনোভাব বাধা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে করে। যেমন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও খাসজমি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাটপারদের সাথে ভূমিকর্মকর্তাদের যোগসাজশ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। এখনো অনেক জায়গায় সরকারি দিক-নির্দেশনা পৌঁছায়নি। বরিশাল বিভাগের একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেন, 'সবাই মনে করেন, তথ্য কর্মকর্তার কাছে অনেক তথ্য আছে। আসলে এই যে আমার কাছে একটা গেজেট দেখছেন, এটা ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। তথ্য অফিসে কোনো কাজ নেই, কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। এটা বরিশাল বিভাগের একজন সরকারি কর্মকর্তার কাছ থেকে পেয়েছি।'

করণীয়

উল্লেখযোগ্য করণীয়গুলো হলো

কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সঠিকভাবে জানানো। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, তাহলে জনগণ উদ্বুদ্ধ হবে। আরেকটি হলো স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ। যেগুলো আইনে সেকশন ৬ বলা হয়েছে। সেগুলো যদি প্রকাশ করা হয় সঠিকভাবে, তাহলে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে। তথ্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছেন অনেকে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল। এবং এটি এখনই যদি আমরা সাজানো শুরু না করি, তাহলে দেখব যে একটা পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সচেতনতা ও প্রণোদনা। সবশেষে অনেকে বলেছেন, জাতীয় তথ্যভান্ডার গঠনের কথা। যেখান থেকে তথ্য দেওয়া সম্ভব হবে। এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যে অ্যাসিস্ট্যান্স ইনফরমেশন কর্মসূচি রয়েছে, সেখানে একটি জাতীয় ই-তথ্য কোষ চালু রয়েছে। সেটির কথাও অনেকে বলেছেন; এটিও একটি কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। এখানে কয়েকটির মধ্যে একটি মতামত আমি উপস্থাপন করতে চাই। এটি বরিশাল থেকে এসেছে, নির্বাচন কমিশন এক বছর ধরে সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার জন্য বলেছে। কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত সম্পদের হিসাব দেননি। যদিও তারা নির্বাচনী ইশতেহারে সম্পদের হিসাব দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তাহলে যারা আইন প্রণয়ন করলেন, তাদের যদি তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এ অবস্থা হয়, তাহলে এ আইন বাস্তবায়ন কী করে হবে?

কী কী মাপকাঠি হতে পারে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে

অনেকগুলো পরিমাপের কথা বলা হয়েছে। যেমন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সংখ্যা, যথাযথ নিয়ম পালন করে তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবের সংখ্যা। আপিল কিংবা অভিযোগের সংখ্যা, তথ্য অধিকার ভিত্তিতে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের উপস্থিতির সংখ্যা, প্রদত্ত তথ্য ডিজিটাল ভাণ্ডারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, কতজন নাগরিক তথ্য চাইলেন এরকম বিভিন্ন ইন্ডিকেটরের কথা বলা হয়েছে। কিছু কিছু ইন্ডিকেটরের কথা বলা হয়েছে; যেমন, ফেসবুক ব্যবহারে প্রবণতা। সচেতনতা বৃদ্ধিতে ফেসবুক ব্যবহার হচ্ছে কি না, সেটিও একটি মাপকাঠি হতে পারে। সবশেষে মিডিয়া রিপোর্ট ও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠির কথা বলা হয়েছে। মিডিয়া কতটা সক্রিয়ভাবে তথ্য অধিকার সম্পর্কে প্রচার করছে।

পদক্ষেপ

এই মনিটরিং করতে গেলে যে পরিবীক্ষণব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, যারা নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে। নিয়মিত জরিপের ওপর অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জেলাভিত্তিক তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সভা যদি আয়োজন করা যায়, ইন্টারভেলে তাহলে প্রতিটি অফিসেই কতটুকু অগ্রগতি হলো সেটার প্রতিবেদন জাতীয়ভাবে প্রেরণ করতে পারে। কেউ কেউ তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ওপেনসোর্স ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেসব আবেদন চাওয়া হয়েছে, তথ্য চাওয়ার জন্য সেগুলো বিশ্লেষণ করে কোন কোন তথ্য বেশি করে প্রচারের ব্যবস্থা করা যায়, তার ওপর অনেকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

আমি কয়েকটি ব্যক্তিগত মতামত উপস্থাপন করতে চাই

দেশব্যাপী এই যে সভা আয়োজন করা হয়েছে তা থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়, সার্বিকভাবে তথ্য অধিকার আইন সীমিতসংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও নাগরিককে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবতা হলো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠনগুলোর ভূমিকা থাকলেও আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তা প্রচারের প্রবণতা কম। এজন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ করাই অর্থাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো তথ্য অধিকারের আইনের আওতায় আনায় এমনটি ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন। আইনের খসড়া প্রণয়নের সময় সুকৌশলে কাজটি করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। যেহেতু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরা প্রস্তুত হতে সময় নিচ্ছে, তার ফলে সরকারি তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে নাগরিককে সহায়তা করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না। তথ্য প্রকাশে অনীহা ও গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। এজন্য যুক্তিসংগতভাবে তথ্য কমিশনের দায়িত্ব শুধু অভিযোগ নিষ্পত্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সক্রিয় নির্দেশনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু কমিশনের কার্যপরিধি জনগণের মাঝে এখনো উদ্দীপনা সৃষ্টি

করতে পারেনি। কমিশনকে আরও সক্রিয় করতে বেসরকারি সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করে অর্থবল ও জনবল ঘাটতি মোকাবিলা করা যেতে পারে। তবে যে ব্যাপারে কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট দেখা দিতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার।

আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার আরেকটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। সেটি হলো সর্বগ্রাসী পেট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক। সমাজের একটি গোষ্ঠীর স্বার্থের নির্ভরতার আরেকটি গোষ্ঠীর ওপর এমন যে কেউ কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চান না। একজন দরিদ্র নাগরিক তথ্য চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরাগভাজন হয়ে তার অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করতে চান না। একজন এনজিও প্রতিনিধি তথ্য চেয়ে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়ে তার প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ফেলতে চান না। একজন সরকারি কর্মকর্তা অন্য কোনো কার্যালয় থেকে তথ্য চেয়ে পদোন্নতি বাধাগ্রস্ত করতে চান না কিংবা ওএসডি হতে চান না। এটি হচ্ছে আইনের শাসনের অভাব এবং মানুষের আইনের শাসনের প্রতি আস্থার সংকটের একটি প্রকট বহিঃপ্রকাশ। তাহলে এ বৃত্ত ভাঙবে কে? তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগ দিয়ে আসলে সম্ভব নয়। প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন জনসম্পৃক্ত উদ্যোগ। সে ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক চর্চা এবং মানুষের সাহসী হয়ে ওঠার কোনো বিকল্প নেই। সবাইকে ধন্যবাদ...

আলোচক

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. অন্যান্য রায়হান এবং এমআরডিআইকে অবশ্যই আমি স্বাগত জানাব। আপনারা জানেন, তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার আগে থেকেই এনজিও, সিভিল সোসাইটি, মিডিয়া ও সাধারণ জনগণের ও একটা বড় অংশগ্রহণ ছিল। এবং এখানে চাহিদা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের কাজ হয়েছে। তবে স্থানীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের এই আইন সম্পর্কে যে ধারণা বা চ্যালেঞ্জের বিষয়গুলো এই প্রথম একটা স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে সেজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। ড. রায়হান যেটা পড়েছেন যে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা তার দুর্বল-সবল দিকগুলো আপনারা শুনেছেন। প্রয়োগের অবস্থাটা বর্তমানে কী রকম এবং চ্যালেঞ্জ এবং সে ক্ষেত্রে করণীয়, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করণীয় কী তার একটা সুন্দর জিনিস আছে তার প্রবন্ধে। অগ্রগতি পরিমাপের কিছুটা প্রমাণ এবং সে ক্ষেত্রে করণীয় যা সেগুলো মনে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমরা যারা এগুলো নিয়ে কাজ করি, তাদের জন্য সহায়ক হবে বলে মনে করি। আমরা এমন একটি পরিবেশ এ বাস করি, যেখানে কালচার অব সিক্রেসি কাজ করে। বা গোপনীয়তার সংস্কৃতি প্রবলভাবে জেঁকে আছে। সেখানে তথ্য অধিকারের আইনটা চট করে এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন, আমরা আশা করি, সেটার একটা ন্যাচারাল রূপ আমরা এখানে দেখতে পেলাম। এবং এটা আমার কাছে খুব ন্যাচারাল মনে হয় যে এটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন চাই। এবং সেখানে যে কতগুলো মৌলিক উপাদানের প্রয়োজন, সেগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য ইমপর্টেন্ট। সবার আগে মডারেটর বলেছেন যে এই একটা আইন, যেটা জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয়েছে।

একটা জিনিস আমরা দেখতে পেয়েছি যে জনগণের মধ্যে যে চাহিদা ছিল, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের পক্ষ থেকে মিডিয়াসহ অন্যান্য পর্যায়ে এবং সেটা কিন্তু একটা পর্যায়ে রাজনৈতিক পর্যায়ে ডেভেলপ করেছিল। এবং সেটা আমরা দেখতে পাই, এটা নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল। আমাদের দেশের সরকার অনেক অঙ্গীকারই করে কিন্তু এই আইনটি সম্পর্কে যে অঙ্গীকারটা ছিল যে মানুষের তথ্য অধিকার আইন, সেটা জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তারা পাস করেছেন। এবং এটা একটা স্ট্রং মেসেজ যে এটা ব্যতিক্রমী আইন, যেটা মডারেটরও বলেছেন। আমাদের দেশে এই ধরনের আইনগুলো অনেক সময় দেখি যে আমাদের দেশের দাতাগোষ্ঠীর চাপে হয়। কিন্তু এটা অবশ্যই ব্যতিক্রম। আমরা যারা এই আন্দোলনে ছিলাম, আমরা কোনো পর্যায়েই দেখিনি দাতা সংস্থাকে এর পেছনে। এখন অবশ্যই আছেন সেটা অবশ্যই স্বাগত জানাই। কাজেই আমি যেটা বলছি, এটা আমাদের গভর্নমেন্টের হাইলেভেল থেকে একটি খুব ক্লিয়ার কমিটমেন্ট। সেটা

আমাদের জন্য ইমপর্টেন্ট। কারণ এই কমিটমেন্টটাই হচ্ছে গোপনীয়তার সংস্কৃতিটাকে দূর করার জন্য খুবই ক্রিটিক্যাল হবে। এই গোপনীয়তার সংস্কৃতির অনেক কারণ আছে; বিশেষ করে, আমাদের সরকার বা পৃথিবীর সব দেশের সরকার কিন্তু পরিচালিত হয় একটি গোপনীয়তার সংস্কৃতির বেড়াজালে। যারা সরকারি কর্মকর্তা, তারা মনে করেন, তাদের কাছে যে তথ্যগুলো আছে যে সিদ্ধান্ত নেন তা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তাদের তত বেশি পাওয়ারফুল মনে করেন। এটাকে ভেঙে ফেলার জন্য আমাদের যেটা দরকার হবে, তা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এই জায়গাগুলো অবশ্যই ডেভেলপ করতে হবে। আমরা খুবই গর্বিত যে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে এ আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। তাই সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আমরা যারা কর্ণধার, তারা যেন এই আইনটা ওন (own) করতে পারি। আমাদের নিজেদের স্বার্থে দেশের স্বার্থে ওনারশিপটা ডেভেলপ করতে পারি। এটা বলাটা সহজ কিন্তু কীভাবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে, এটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি একটা বিষয়। যেটা দরকার সেটা হলো, এই আইনটা সম্পর্কে জানা, এটার উপযোগিতা সম্পর্কে জানা। এটার মধ্যে তথ্য কীভাবে ডিসক্লোস করতে হবে, সেটা জানা। একটা বিরাট কাজ হচ্ছে, আমার যে ইনফরমেশন সিস্টেম, তথ্য ব্যবস্থাপনার যে বিষয়টি, সেখানে কিন্তু একটা বিরাট লেবারিয়াস কাজ আছে। এমন বলব যে আর্কাইভ একটা সিস্টেম, যেখানে ইনফরমেশন ডিসক্লোস করার আগে ইনফরমেশনটা পাওটাই কঠিন। কাজেই, সেখানে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকবে। আমাদের যে স্টেকহোল্ডার আছে, তাদের কথাও এখানে আসছে। এই যে স্টেকহোল্ডার সরকার, রাজনৈতিক দল, এনজিও, ইনফরমেশন কমিশন, তথ্য কমিশন, মিডিয়া, এনজিও, সিভিল সোসাইটি এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের বিষয়টি সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিল্ড-আপ করার জন্য আমাদের সকলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা যে কাজগুলো আলাদা আলাদা করি, সেটা যৌথ ফোরামে একসাথে করতে পারি। এবং সে ক্ষেত্রে সকলেরই দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি, আইনটা বাস্তবায়নে যেহেতু সরকারের টপ লেভেল থেকে একটা উদ্যোগ আছে এবং একই সময়ে যেহেতু মাননীয় তথ্যমন্ত্রী এখানে আছেন, সেহেতু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব– আমাদের সংবিধানের যে রিভিউটা হচ্ছে, সেখানে মনে হয় অপূর্ব সুযোগ, যেখানে আইনটির সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার। তাতে এই আইনটার ক্রেডেবিলিটি এবং বিশেষ করে, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয় যে বিষয়টি, সেটা হলো, আমাদের যে কেপাসিটি বিল্ডিং এবং আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য যে প্রতিবন্ধকতা, সেগুলোকে ফেস করার জন্য যে জিনিস দরকার, তা সম্পদ বা রিসোর্স। প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদের স্বল্পতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই ইনফরমেশন সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করার জন্য, কেপাসিটি বিল্ডআপ করার জন্য, ডিসক্লোজ করার জন্য; যার ফলে ইনফরমেশনের চাহিদাটা কমে যাবে। এ রকম পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যে ধরনের সম্পদ দরকার, সেটার অভাব আছে।

আমি মনে করি, সরকার আগামী বাজেট থেকে এই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আলাদা বাজেট প্রভিশন উচিত। সবশেষে আমি বলব, আমাদের প্রত্যাশা অনেক হাই, কিন্তু বাস্তবায়ন অনেক সময় কঠিন হয়। আমাদের অনেক কন্ট্রাস্ট আমাদের জাতীয়ভাবে আছে। খোলাখুলিভাবে বলব, আমরা স্বাধীনতার জন্য যেমন রক্ত দিই, সে রকমভাবে স্বাধীনতার রক্ষা করার জন্য আমরা ততটা সক্রিয় হই না। কার ভূমিকা কী রকম, সেটা নির্ধারণ করতে আমরা ৪০ বছর পার করে দিই। এটা একধরনের কন্ট্রাস্ট। আমরা গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিই। কিন্তু আমরা সেই গণতন্ত্র চর্চাটা থেকে দূরে থাকি। এই যে বিষয়টা, সেটারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টের ক্ষেত্রে। যে আইনটি সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশে এই আইনটি পাস করা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই আইনটি পাস হলে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে, দুর্নীতি দূর হবে এবং গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে। সেই দেশেই প্রধানমন্ত্রীর একজন অ্যাডভাইজার এই আইনটাকে ক্রাশ করে দেন। দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। আমি আশা করি, মাননীয় তথ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত দেবেন। কিন্তু এটা আমি এ প্রসঙ্গটা এজন্যই তুললাম, Because it matters a lot whether we are sending a right signal or a wrong signal।

আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এই যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার আছে—সরকার, তথ্য কমিশন, মিডিয়া, এনজিও, সিভিল সোসাইটি এবং সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি, এবং এই সব স্টেকহোল্ডারের মধ্যে একটি রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা। আমাদের সবার কথা যৌথভাবে বলার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আমি আর দুটি পয়েন্ট বলে আমার বক্তব্য শেষ করব; একটি হচ্ছে : আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন—সংসদে এই আইনটিকে তুলে ধরে একটি সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া—যাতে এটার ক্রেডেবিলিটি, স্ট্রেনথ অনেক বাড়বে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে : রিসোর্স (in clear term money)—এটি দরকার, যাতে এই আইন প্রয়োগ অনেক দ্রুতগামী হয় বিভিন্ন কেপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রামের দ্বারা। প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে রিসোর্স-স্বল্পতা একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের যত ইতিবাচক পরিবর্তন, তার পেছনে রাজনৈতিক একটি প্রভাব সব সময় রয়েছে। সুতরাং এই আইনটি বাস্তবায়নের পেছনে রাজনৈতিক ভূমিকা রয়েছে। তাদের কাছেই অঙ্গীকার সবাইকে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক

ধন্যবাদ ড. ইফতেখারুজ্জামান। আপনি যথার্থই বলেছেন। আসলেই আমাদের এই গোপনীয়তার সংস্কৃতি থেকে উন্মুক্ততার সংস্কৃতিতে নিয়ে যাবে। আপনি যখন প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি থেকে বলেন, সেটা একটা সংস্কৃতি, আবার প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার যে উদ্ধৃতি সেটিও একটি সংস্কৃতি। কাজেই সংস্কৃতির পরিবর্তন করতে চাইলে আমাদের সবাইকে একই ধরনের সংস্কৃতি ধারণ করতে হবে।

আলোচক

ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট

আমি 'আরটিআই : হাউ টু মুভ ফরওয়ার্ড' নিয়ে সরাসরি পয়েন্টে যেতে চাই। এমআরডিআই আয়োজিত দেশব্যাপী সেমিনারগুলোর মধ্য দিয়ে আমার অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা অন্যান্য রায়হান তুলে ধরেছেন। এর বাইরে, এক সেমিনারে একজন অফিসার বলেছিলেন যে তথ্য দেওয়ার জন্য আমাদের যে মেকানিজমগুলো দরকার, সেই দিকটা সরকারকে দেখতে হবে। এবং আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেটা কীভাবে সম্ভব? উনি বলেছিলেন, সব মিনিস্ট্রি যদি সমন্বিতভাবে একটি সেল গঠন করে এবং সেখানে নিজ নিজ তথ্য জমা দেয়, তাহলে তথ্য প্রদান করা অতি সহজ হবে। তথ্য কমিশনকে একটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেকশন ৫ সাব-সেকশন (৩)-এ। সেকশন ৫টা হচ্ছে রিপোর্টিং ভলান্টারি ডিসক্লোজার; সেখানে বলা হয়েছিল, 'তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।' সুতরাং আমি মনে করি, সাপ্লাই সাইডে আমরা যদি প্রস্তুত না হই, তাহলে ডিমান্ড যেটা আসবে, আমরা তা মিট করতে পারব না।

তথ্য কমিশনের এমন কোনো উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি, যেখানে জনগণ উৎসাহিত বোধ করতে পারে। তথ্য কমিশন প্রথমেই একটি লিস্ট অব অর্গানাইজেশন সেট আপ করতে পারে, যাদের তথ্য প্রদানের জন্য প্রাথমিক টার্গেট হিসেবে বিবেচনা করা হবে। টার্গেট বিবেচনার জন্য আমরা দেখতে পারি, কোন কমিটমেন্ট থেকে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেটার একটা এসপেক্ট ছিল দুর্নীতি দমন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন সময় জনমত নিয়ে কোন কোন খাতে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে তার একটি তালিকা তৈরি করেছে। তথ্য কমিশন সেই তালিকা ধরে ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি দমন করার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করতে পারে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ট্রান্সপারেন্সি যদি তৈরি হয় তাহলে কিন্তু তারা এটা নিয়ে ডিমান্ড তৈরি করতে পারেন— যা একটু আগে অন্যান্য রায়হান বলেছেন। কিন্তু তারা নিজেদের ঘরটাকে ঠিক না করে অন্যের দিকে আঙুল তুলতে পারছে না। এই ক্ষেত্রে যেসব এনজিও তথ্য অধিকার আইনের কমপ্লায়েন্ট ফুলফিল করে, তথ্য কমিশন সেসব এনজিওর একটি তালিকা প্রকাশ করতে পারে। এর ফলে বাকি সব এনজিওর মধ্যে একটি উৎসাহ তৈরি হবে। আমি পুরো বিষয়টিতে তথ্য কমিশনের ভূমিকাকেই সেন্টার পয়েন্ট হিসেবে দেখছি; এবং তারা তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাহায্য পাচ্ছেন। ইফতেখার সাহেব বলেন রিসোর্সের কথা। আইনে উল্লেখ আছে যে তথ্য কমিশন সরকারি সাহায্যের পাশাপাশি বেসরকারি অনুদানও নিতে পারেন। আমি আশা করি, আমরা নিজেদের দিকটা যদি সবল করতে পারি, ঠিক রাখতে পারি, জনগণও আমাদের সাথে একদিন এসে দাঁড়াবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

মুক্ত আলোচনা

মো. লুৎফুল হক
কেম্পেইন টু রাইট টু ইনফরমেশন, রাজশাহী

আমার প্রস্তাবনাটা হচ্ছে যে পৃথিবীর প্রায় ৭০টি দেশে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট রয়েছে, পাশাপাশি সেসব দেশে পাবলিক রেকর্ডস অ্যাক্ট বা রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এমন কোনো লেজিশলেশন নেই। বলা হয়ে থাকে, রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট যে দেশে যত উন্নত, সে দেশে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট তত ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়। সরকার এ ব্যাপারে যেন পদক্ষেপ নেয়।

কোহিনুর বেগম
বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি

বলা হয়েছে যে ২ শতাংশে এনজিও তথ্য অফিসার নিয়োগ করেছে। কারা নিয়োগ করেছে, জানতে পারলে ভালো হতো। এটি সার্কুলেট করা হলে সকলে জানতে পারবে। তথ্য কমিশনের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার।

আবদুর রহমান
পল্লী তথ্য কেন্দ্র পরিচালক, ঝিনাইদহ

গ্রাম পর্যায় তথ্য অধিকার আইনটির বেশ ভালোভাবে প্রচার দরকার এবং এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিগগির সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

ড. এম আনিসুর রহমান
ডিন, ফেকাল্টি অব ল, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি

দেশব্যাপী প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে 'ল' বিভাগ আছে, এই আইনটি তাদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

হাসিবুর রহমান বিলু
সাংবাদিক, বগুড়া

অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টটি এখনো সক্রিয়, এর বলে আমাদের তথ্য দেয় না। এটা বন্ধ করা দরকার, যেটা এই আইনে উল্লেখ আছে।

রহিমা সুলতানা কাজল
আভাস, বরিশাল

বিভিন্ন তথ্য, যেমন- ভিজিএফ, ভিজিডি নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে চাইলে তারা তা দিতে নারাজ। তাই ইউনিয়ন পরিষদকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করা দরকার।

তানভির সিদ্দিকী
চেঞ্জমেকার, ঢাকা

এই আইনটি স্কুল, হাইস্কুল লেভেলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে লং রানে এর সুফল আমরা পেতে পারি।

সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ
নির্বাহী পরিচালক, শিশুক, ঢাকা

আমাদের প্রায়োরিটি ঠিক করা উচিত। জনশক্তি রপ্তানিবিষয়ক রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে এই তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আনা উচিত। কারণ বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ লোক বিদেশ গিয়ে তাদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে।

মিলা রানী সরকার নির্বাহী পরিচালক

নারী ও শিশু বিকাশ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ সরকার যদি বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই আইনটি জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে আমরা লাভবান ও সচেতন হব।

সুব্রত ঘোষ

বিটা, চট্টগ্রাম

তথ্য কমিশনের ইনিশিয়েটিভগুলোকে যেন আরও বাড়ানো হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে তথ্য আদান-প্রদান করা হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত।

তালেয়া রেহমান

নির্বাহী পরিচালক, ডেমক্রেসিওয়াচ

ডিমান্ড সাইডে নারীসংগঠনগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এবং প্রতি ইউপিতে একজন করে তথ্য অফিসার থাকা উচিত।

সৈয়দ দুলাল

সম্পাদক, আজকের পরিবর্তন, বরিশাল

আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোকে সপ্তাহে এক দিন তথ্য অধিকার আইন প্রচার করার নির্দেশ দিতে পারে তথ্য কমিশন এবং তথ্য মন্ত্রণালয় যেহেতু এই পত্রিকাগুলো তৃণমূল পাঠকেরা পড়েন।

মিজানুর রহমান

নিজেরা করি, নোয়াখালী

সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে কালচার অব সিক্রেটস দূর করতে হবে। ২০ দিন পরে গেলেও তথ্যের জন্য আপিল করতে হয়।

আসাদুজ্জামান সেলিম

নির্বাহী পরিচালক, এমইউকে, মেহেরপুর

সাধারণ নাগরিক কীভাবে আইনটি পেতে পারে তা বলুন।

মবিনুল ইসলাম মবিন

সম্পাদক, গ্রামের কাগজ, যশোর

সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে রিপোর্টিংয়ের জন্য সরকার/বেসরকারি অ্যাওয়ার্ড থাকতে পারে, যেমনটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আছে।

মেজর তুহিন মোহাম্মদ মাসুদ

উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, বরিশাল

এলাকাভিত্তিক কোনো কার্যক্রম নিতে পারি কি না, যার দ্বারা আমরা এই আইনবিষয়ক সচেতনতা পরিমাপ করতে পারি। মডেল হিসেবে বরিশাল জেলাকে বেছে নিতে পারে, যেখানে এর অগ্রগতি পরিমাপ করা যেতে পারে।

সংগ্রাম সিংহ
দৈনিক যুগান্তর, সিলেট

সিলেট সিটি করপোরেশন কিন্তু এই আইনটি মানে না, কারণ আইনের সেই ধারায় তথ্য দিলে তারা বকশিশ বা ঘুষটা পায় না। মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি সিলেট সিটি করপোরেশনের ওপর নজর দিতে অনুরোধ করছি।

গ্রামীণ আলো
বগুড়া

অনেক সময় তথ্য নিতে গেলে, যেমন– সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর তারা তথ্যে সমৃদ্ধই থাকে না। সে ক্ষেত্রে তথ্যসমৃদ্ধ হতে হবে তাদের।

পুলক চ্যাটার্জি
দৈনিক সমকাল, বরিশাল

'তথ্য দিতে সবাই রাজি, যদি আপনি চান, সরকারি বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান'– এমন একটি স্লোগান আমি দেখেছিলাম। কিন্তু এটি কতটুকু সত্যি তা আমরা জানি। সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পেতে পারে; কিন্তু সরকারি উচ্চ কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো সমস্যা। তাদের সচেতন করা দরকার তথ্য দেওয়ার ব্যাপারে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাত
সম্পাদক, দৈনিক রূপসী গ্রাম

আমি মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের উদ্দেশে বলছি, উপজেলা ও জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এনজিওদের সমন্বয় সভা হয়। সেখানে যদি তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেওয়া হয় যে এই সভাগুলোতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তাহলে মাঠ পর্যায়ে এনজিওরা আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে।

নাসিরুল হক
সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম

আমরা যেদিনে আইনটি পাস হয়েছে, সেদিনটিকে একটি তথ্য অধিকার আইন দিবস পালন করতে পারি।

চিত্ত ঘোষ
সম্পাদক, আজকের দেশ বার্তা, দিনাজপুর

আইনটি পাস হয়েছে দেড় বছর, কিন্তু এর মধ্যে জেলা প্রশাসন বা উপজেলা প্রশাসনের যতগুলো সভা হয়েছে কোনোটাতেই এ বিষয়ে কোনো আলোচনা শুনি নাই। জনগণ যেমন জানে যে থানায় গেলে মামলা করা যায়, তেমনই জনগণকে জানাতে হবে, সরকারি প্রতিষ্ঠানে গেলেই তাদের জন্য যেসব সেবা আছে তা জানতে পারবে।

বিশেষ অতিথি

মোহাম্মদ জমির, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ

Firstly I thank MRDI. I'll speak in English so that those who are not able to understand Bangla can understand.

One has to be patient. No use calling a glass half-empty. A glass is half full- that's the way you need to approach the whole issue.

Since I've taken over as Chief Information Commissioner, various things have happened in the Information Commission despite various difficulties. We have moved forward, we have managed to reach certain important goals. And I request all of you, if you have time, to come by, to meet us, to discuss with us on how we can move forward.

For example, I'll give you what happened. In June, we sent out a circular letter to all the 64 Deputy Commissioners of the country. Till today, 59 responses were received which doesn't include Barishal, Chittagong, Rajshahi. It came only yesterday.

So, I'm surprised that those of you here from Rajshahi, Barishal, Chittagong are not meeting their responsibilities properly and it's futile to say all this, coming here in Dhaka.

The Anti-corruption commission Director of Barishal must ask Deputy Commissioner about why the answers to 8 questions weren't sent? The questions covered whether the information are organized, are the trainings in progress, what is the overall progress? It's your job to do it. No use coming and complaining in Dhaka. Similarly I would request everyone here that while we want accountability in the process of imparting information, it is equally important for the lawyers to enlighten their own community about it. Pointing out to Barrister Tanjib who was there at the discussion in the commission yesterday he could have mentioned

that he was one of the resource person used by Article 19 yet he got my designation wrong I'm not the Chairman, I'm the Chief Information Commissioner. This shows lack of commitment. Similarly I'm pointing out to Dr. Ananya Raihan that it is important to find positive and constructive engagement.

We now have an Information Commission and as you all know various important steps have been taken in the last four months. We have been in front of the standing committee in the parliament on information on two occasions. I've myself been in touch with various NGOs, so when you talk of NGOs, I was asking Shaheen Anam about how many NGOs there are aware of appointing designated officers. She said 22000. When few months back I wanted to check, I found only 10 (3 from Dhaka and 7 outside) sent names of designated officers. I was very disappointed at this lack of commitment from the NGOs. Since, my several efforts in front of the media print and electronic the number has slowly crept up to 131 so I do not know where they have got this figure 2%, it is 0.0176%. So we have to get our act together, you have to quote our statistics correctly.

The next thing, I would request all of you to understand that I've requested the Education Minister and I've mentioned this in front of the standing committee in parliament that in order for us to get a wider audience we need to take certain steps. In this context, I've had discussions with the CEO of Grameen Phone, Robi- as they have more than 60 millions mobile subscribers and I requested them of the idea of having free text-messaging facility to which they agreed. So it will take time but it's underway. I told the education minister on whether he can and he said he is considering it. I discussed with the Honorable President and he liked the idea. I want a four and a half to five page text made available in the text books of Grade 8 to 10 of secondary schools and Madrasa.

I don't see any students here. MRDI should have invited students in the audience today. They are the future. I'm just pointing out the difficulties and challenges. Now, I've heard about health care and capacity building. We had two sessions of 4.5 hours each yesterday and one of same duration attended by Armies, BDR, others is being carried out today at the commission.

All of them pointed out to one thing- why are we getting punished? What is our benefit in disseminating information through all the hard work because it is not easy digging out 12 or more years' information out of the records? So I'm requesting the attention of Information Minister here to take this issue up to the cabinet. There should be a level of reward for the officers (Go/NGO) for disseminating information. They should be given institution funded mobile phones to communicate in this purpose instead of spending own money.

I would also seek attention of the honorable Minister that if the defense services receive medals as recognitions to achievements. The government should similarly initiate this process for the information officers for their services. This will give them the zeal to move ahead and be committed. It is important.

I've been a civil servant for 34 years. I still remember the quotes from M K Gandhi- That civil servants are neither civil nor servants- they are very lowly paid. I would like the NGO community even in front of me to get the same salary as a government servant, get the same benefits of a government servant and I want them to understand that it is not easy being a government servant. I'm not being harsh or critical.

We are opening up an inter-active web portal to be ready by the end of this month. We have signed a MOU with AtoI in the Prime Ministers' office. They are associated with UNDP, and we have already uploaded around 130 pages of web content. By the middle of October the names of 5500 plus designated info officers from GO/NGOs will be available in the web portal. I want you all to use it.

More importantly, I want all of you to come to information commission to see what is happening, see the difficulties with which we are working and I would like the NGOs to come forward and say 'Ok, you have difficulties, here are some people we would like to give to you as intern, volunteer for helping you out.'

I want all of you to come forward with positive suggestions and help us form all over the country. Go down to the divisional levels not just sit in Dhaka. Don't call the glass half empty, call it half full.

Thank you!

সঞ্চালক

ধন্যবাদ, অনেক কিছুর মধ্য তার বক্তব্যে উদার অংশটি হলো তিনি আমাদের সকলকে তথ্য কমিশনে যেতে অনুরোধ করেছেন, ওয়েবসাইট দেখতে বলেছেন, তার সাথে কথা বলতে বলেছেন। শক্ত কথাগুলো বাদ দিয়ে আমরা যদি উদার অংশটি গ্রহণ করি, তাহলে মনে হয় আমরা লাভবান হতে পারব।

বিশেষ অতিথি

শাহীন আনাম, কনভেনর, আরটিআই ফোরাম এবং নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

সবাইকে শুভেচ্ছা আরটিআই ফোরামের পক্ষ থেকে। I'm going to be very brief, with mixing my talk in english and Bangla. The right to information Act was enacted due to a number of factors which included civil society movement and the responsiveness of the then-caretaker government who promalgated the ordinance and then a very strong committment of the present government towards accountability and transparency. This is a law for the peoples. It's the peoples' act and we have to use to. It's not to be kept over the shelf and forget about. আমরা আমাদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে এই আইনটি ব্যবহার করতে পারি। The reason why development organizations involved themselves in the act was to see how this act benefitted the common people of this country and I think we should put our focus there. Common people suffer due to accountablity, corruption and lack of transperency. This act can promote and fulfill all these requirements. It was the government's pledge to root out corruption and bring transperancy into governance. That is why they enacted this law.

There are two sides to this: the supply side and the other- the demand side. One problem lies with the demand side which I will elaborate on how to move forward. There is a great hesitency in seeking information for a number of reasons. The grassroots are afraid on asking information- they fear that the government officials will have a negative impression about them. Another problem lies with the supply side. The designated officer when asked for information feels insecure, that how will his/her superiors think about it. Both the supply and demand side needs capacity building and creating awarness in both.

We as NGO are doing it, the media especially the government supported medias should come forward in awaring the peoples about the Act.

The journalists are confused as to why we suddenly have to use the Act to get information as they have been receiving information without the Act since many years and many of them think that many are not getting information due to this Act. But they also have a duty to publicize this Act. They should let the people know about the Act, which we are not doing.

Please do not have this misunderstanding the information commission is in place they are doing their part. Its really uphealed battle and we should give them time. The government has been proactive- through providing all the necessities for the effective implementation of this Act. And we are too involved with the loopholes- what is not there in the Act. We should focus more on what is there and how can we use it?

Why don't we go through the whole procedure and come to the end of appealing to the information commission when we do not get the required information before we come to the conclusion that this Act is not working. I asked the information commissioner- Are they getting appeals to which he said- Yes we are! In India, the number of years the Act is getting older lesser appeals is coming, because informaiton are being disclosed proactively. So we the GOs/NGOs should disclose information on the website so that peoples can get it without asking. I totally agree that the NGOs should be more forthright in giving out information, identifying designated officers and informing the information commission. This has to be made possible. The main thing is there needs to be a huge change in culture. We need to overcome the culture of secrecy both from the supply and demand side.

We will monitor how this RTI Act is being implemneted and if we do see anything is going out of the spirit of the RTI Act we shall point it out. Thanks to everyone!

সঞ্চালক

ধন্যবাদ, শাহীন আনাম। এবার অনুরোধ করব বিশেষ অতিথি জনাব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, তথ্যসচিবকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য।

বিশেষ অতিথি

ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, তথ্যসচিব

আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই এমআরডিআই এবং ইউএসএইড প্রগতিকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং অনন্য রায়হানকে তার সুন্দর উপস্থাপনার জন্য।

আমাদের একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যে ধরনের সম্পদ দরকার, সেটার অভাব আছে। আপনারা অনেক বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আপনারা সবাই বলেছেন এবং মনে করি যে, বর্তমান সরকার এজন্য সাধুবাদ পেতে পারে যে পার্লামেন্টের প্রথম সেশনে এই তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। আমি বলব যে আমাদের দীর্ঘদিনের বহু চর্চিত যে মানসিকতা, সে মানসিকতার অচলায়তন কিংবা অপথদর্শী বাতায়নকে যে মুক্ত করা যায়, তার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেটা হলো তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে। এবং তথ্য অধিকার আইন পাস করার পরই কিন্তু খুব দ্রুততম সময়ে সরকার তথ্য কমিশন গঠন করেছে। একজন বলেছেন, তথ্য কমিশনের কাজ শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটি হয়তো সেভাবে বস্তুনিষ্ঠ নয়। এজন্যই যে আমরা কিন্তু ১লা জুলাইতেই আইনে যা বলা ছিল তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আমরা যখন কাজ শুরু করেছি, কিছু সমস্যা ছিল; এ বিষয়ে আমি পরে

আলোকপাত করব। আমি এখন ড. অনন্যা রায়হানের উপস্থাপনা থেকে কিছু বিষয় বলব। তিনি বলেছেন যে এখানে একজন সাংবাদিক ভাই বলেছেন, আগে তথ্য চাওয়া সহজ ছিল এখন তথ্যের জন্য ২০ দিন অপেক্ষা করতে হয়। ব্যাপারটি কিন্তু আসলে তা নয়। আমরা যারা নিজেদের সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ মনে করি, আমরা নিজেরাই হয়তো অনেক সময় অনেক বিষয়ে আলোকিত নয়। আইন হওয়ার পরও এখনো কিন্তু অনেক সাংবাদিক ভাই তথ্য চাইতে যান এবং তা পান। তথ্য অধিকার আইনের কিছু রুলস রেগুলেশন আছে, সেগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে। তথ্য অধিকার আইন পাস হওয়ার পর আমরা সরকারিভাবে কিছু উদ্যোগ নিয়েছি। তথ্য অধিকার আইনটি যখন পাস হয়, তখন কিন্তু কিছু কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছিল। কিছু কিছু তথ্য গোপন রাখার কথা বলা হয়েছে।

আমি আপনাদের বিবেচনার জন্য বলতে চাই, এই আইনটি যখন হয়েছে, তখন ভারতে এবং পৃথিবীর ৮৮টি দেশে এই আইন পাস হয়েছে। বাস্তবায়ন সব দেশেই হয়েছে, তা আমি বলব না। ভারতে হয়েছিল ২০০২ সালে ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট। তখন এটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। তারপর কিন্তু ২০০৫ সালে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট করেছে। ইউকেতে যখন এই আইন পাস হয়েছে, তখন এই আইনটার রুলস রেগুলেশন হতে পাঁচ বছর সময় লেগেছে। আমাদের এই আইনটির বয়স হয়েছে ১৪ মাস। তাই এই কয় মাসের মধ্যে আমাদের সবকিছু আশা করাটা মনে হয়, তথ্য কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা, তাদের প্রতি সুবিচার হবে বলে আমি মনে করি না।

কিছুক্ষণ আগে তথ্য কমিশনার সাহেব সরকারি কর্মকর্তাদের ট্রেনিংয়ের কথা বললেন, সেখানে আমি গিয়েছিলাম। এটা আসলে ঠিক ট্রেনিং না, ওরিয়েন্টেশন বলা ভালো হবে। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম, তারা আইনটি দেখেছেন কি না? তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যে হাত তোলা আর এমন হাত তোলা দেখেই বোঝা গেল, তারা কজন দেখেছেন। তারপর রুলস কতজন দেখেছেন তা জানতে চাইলাম। একজন-দুজন ছাড়া আর কাউকে হাত তুলতে দেখা যায় নাই।

আমাদের রুলস পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু রেগুলেশনটা এখনো হয়নি। রেগুলেশনটা এখনো আইন মন্ত্রণালয়ে আছে। রুলসটা আসলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল করার। আর রেগুলেশনটার দায়িত্ব ছিল তথ্য কমিশনের । তথ্য কমিশন রেগুলেশনটা পাঠিয়েছেন আইন মন্ত্রণালয়ে আছে। আশা করি, দ্রুতই রেগুলেশনটা হয়ে যাবে।

আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই। আমরা সব সময় নারী ও শিশু অধিকারের কথা বলি। কিন্তু শিশু অধিকারের কথা বলতে গেলে সিআরসি ছাড়া কোনো কিছু আমাদের নজরে পড়ে না। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সময় একটি শিশু অধিকার আইন পাস হয়েছে। আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা শিশু আইনটা কি পড়েছেন? বাংলাদেশের শিশু অধিকার আইনে শিশুর বয়স কত বলা হয়েছে। সরকার সব সময় সমালোচনার মধ্যে পড়ে। কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যজনক যে সেখানে একজনও বলতে পারেনি।

আমাদের একটা আইন আছে 'প্রফেশনাল অফেন্ডার অ্যাক্ট'। তারা সমাজে বিপন্ন মানুষদের নিয়ে কাজ করে। আমি রাজশাহীতে অনেকজন পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা কি 'প্রফেশনাল অফেন্ডার অ্যাক্ট' আইনটা পড়েছেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা কেউ আইনটা পড়ে নাই। এটা আমাদের বাস্তব অবস্থা। আমারা নিজেরা যারা এ বিষয় নিয়ে কাজ করি, তারা কিন্তু নিজেরাই কাজগুলি করতে গিয়ে অনেক সময় করতে পারি না। আমার কাছে মনে হয়েছে, আপনাদের অনেকেই অনেক প্রশ্ন করেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, সবাই এই আইনটা ঠিকভাবে পড়েন নাই। আইনে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি বলা আছে। আইনের প্রথম লাইনটিতে বলা হয়েছে, সরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বিদেশি অর্থয়ানে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থা— সকল বেসরকারি সংস্থা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধু সরকারি অফিসগুলো এবং বিদেশি অর্থায়নে বেসরকারি সংস্থা এর অন্তর্ভুক্ত। বিষয়টিকে সেভাবে আনা হয় নাই। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার যখন আইনটা করেছে– সরকার কিন্তু অনেক বেশি অগ্রসর— আমি কেন বলব, ভারতে শুধু সরকারি অর্থায়নে বেসরকারি সংস্থারা অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু আমাদের তা নয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি অর্থায়নে যে সংস্থাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। আরও একটি বিষয় আছে, ভারতের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন আছে। তাদের যে বাছাই কমিটি আছে, সেটা তিন সদস্যের কমিটি; সেখানে প্রধানমন্ত্রী কমিটি-প্রধান, বিরোধী দলীয় নেতা এবং একজন কেবিনেট মিনিস্টার সদস্য।

আমাদের দেশের বাছাই কমিটিতে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে, একজন সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, বিরোধী দলের সদস্য, বিজ্ঞ সমাজের সদস্য আছেন, তার মানে অনেক বেশি স্বচ্ছতার জায়গায় কিন্তু আমরা আছি।

আমাদের কাছে প্রত্যাশা থাকবেই, এর মধ্যে ব্যর্থতা থাকতেই পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কেপাসিটি বিল্ডিং, যা আপনারা সবাই বলেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা এখন ৫২০০, আমরা পেয়েছি, যেখানে বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তার সংখ্যা খুব কম। কেউ কেউ বলেছেন, আইনটা কীভাবে পেতে পারি। এই আইনটা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। রুলসও দেওয়া আছে এবং আইনের ইংলিশ ভার্সনটাও দেওয়া আছে। সেখানে কীভাবে তথ্য চাইতে হবে, সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে।

তবে যেহেতু রেগুলেশনটা হয়নি, তাই নির্দেশনাটা, যেটি ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম সাহেবও বলেছেন, কীভাবে তারা ক্যাটাগরাইজ করবেন, কী কী তথ্য ওয়েবসাইটে থাকবে, রেগুলেশনে সেগুলোর একটি নির্দেশনা থাকা জরুরি। সেই কাজটা রেগুলেশনের মাধ্যমে হচ্ছে, আমার ধারণা, এটি অতি দ্রুত হয়ে যাবে।

আমরা তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে যা করেছি, তা হলো, আমরা বেশ কয়টি মন্ত্রণালয়ের সাথে বসেছি, চিঠিপত্র দিয়েছি, ডিসিদের অবহিত করেছি।

সবাইকে ডেজিগনেটেড অফিসার নিয়োগ করতে বলেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত যারা নিয়োগ করেছেন, তার সংখ্যা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে সমস্যাটি আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত ফেস করছেন, তা হলো, আইনে বলা আছে– ক্যাটালগ করতে হবে, রেগুলার আপডেট করতে হবে, আইনে কিন্তু বছর শেষে সংশ্লিষ্ট অফিস যে কাজগুলো করছে তা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ বা জনগণকে অবহিত করতে হবে বলা আছে। তার জন্য প্রয়োজন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। একজন আমাকে বলেছেন, জেলা পর্যায়ের তথ্য অফিসগুলো অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের তথ্য দিতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের প্রত্যন্ত এলাকায় অর্থাৎ জেলা পর্যায়ে যে তথ্য অফিসগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু তথ্যের হাব হিসেবে তৈরি হয়নি, আমাদের তথ্য অফিসগুলো এখনো যে কাজগুলো করে তা হলো সরকারের প্রেসনোট, বিজ্ঞপ্তি ও আর মাঠ পর্যায়ে মাইক সাপ্লাইয়ের কাজ– আমি মাঝে মাঝে বলি। তথ্য সেল হিসেবে যে তারা তৈরি হবে সেই ক্যাপাসিটি কিন্তু এখনো তাদের তৈরি হয়নি। এমনকি যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, তারাও কোনো ট্রেনিং পায় নাই। পেন্টিয়াম থ্রি দিয়ে এখন কিন্তু অনেক কাজ করতে পারে না, এমন অনেক অফিস আছে, যারা কম্পিউটার চালাতে পারে না, তাদের যদি তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, তারা তো সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। আরও সমস্যা আছে, এমনও অনেক অফিস আছে, যেখানে একজনই অফিসার; তিনি যখন আপিল অথরিটি হয়ে যাচ্ছেন তখন কিন্তু তিনি একজন সাধারণ কর্মীকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিচ্ছেন। এ ধরনের সমস্যা কাজ কাজ করতে আমরা ফেস করছি; একসময় আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এগুলো সমাধান হবে।

শুরুতে তথ্য কমিশনের বসারও জায়গা ছিল না, এখন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের যে অফিসে তারা এখন বসছে, এটাও পারমানেন্ট না। গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এক বিঘা জমি দিয়েছে, সেখানে তথ্য কমিশনের স্থায়ী কার্যালয় হবে। জনবল নিয়োগের ব্যাপারে আমরা লিখেছিলাম। আপনারা জানেন জনবল নিয়োগের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পৃক্ত আছে। এখন পর্যন্ত ৭৬ জন জনবল অনুমোদিত আছে। আমরা আশা করছি, নিয়োগবিধি কমপ্লিট হলে তা হবে। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, এটা কোনো বায়বীয় বিষয় নয়, এর জন্য রুলস প্রয়োজন। সেগুলো কমপ্লিট হলে সবার সহযোগিতায় সব সম্ভব হবে। বিপিএটিসিতে আমাদের পাবলিক অফিসারদের যে ট্রেনিং হচ্ছে, যেখানে বিসিএস দিয়ে যারা আসছেন, তাদের ফাউন্ডেশন কোর্সে আইনটি যুক্ত করা হয়েছে। মানিকগঞ্জে একটা কাজ হচ্ছে, সেখানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সিলেবাস তৈরি করছে। প্রধান তথ্য কমিশনার একটি কথা বলেন নাই, তা হলো তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন, আইনটি যাতে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়। একজন অধ্যাপক বলেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য; বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সিন্ডিকেটের মাধ্যমে একটা প্রস্তাব নিয়ে এটি করতে পারে। তথ্য অধিকার আইন তৃণমূলে পৌঁছে দিতে আপনাদের সুপারিশ আমরা গ্রহণ করব। তথ্য কমিশনও ইতিমধ্যে জেলা পর্যায়ে কিছু কাজ করছে। আসলে গ্যাপটা কী? গ্যাপটা হলো একচুয়াল সিচুয়েশন ও আইডিয়াল সিচুয়েশন। আমরা কিন্তু সবাই কেন্দ্রে আছি। কেন্দ্র থেকে প্রান্তে যাওয়ার গ্যাপ হলো নলেজ এবং নরম্যালের যে গ্যাপ। এটি পূরণ করতে হবে।

আমাদের ভিশন হচ্ছে, নান্দনিকভাবে যদি বলি, দিগন্ত দেখা এবং সেটির পথে কোনো অচলায়তন বা বাধা থাকলে সেটিকে সরিয়ে দেওয়াই আমাদের মিশন। দিগন্ত দেখতে হলে আমাদের মানসিকতার যে অচলায়তন, সক্ষমতার অভাব, সেগুলো সরিয়ে দিতে হবে, তাহলেই আমরা দিগন্ত দেখতে পাব। সবাইকে ধন্যবাদ।

সঞ্চালক

ধন্যবাদ, তথ্যসচিব মহোদয়। এবার অনুরোধ করব বিশেষ অতিথি গোলাম রহমান, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন– তার বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য।

বিশেষ অতিথি

গোলাম রহমান, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন

সবাইকে শুভেচ্ছে। একটা কথা বলা হয়, Information is power তথ্য হলো ক্ষমতার ভিত্তি। তাই দুর্নীতি করতে হলে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সব সময় তথ্যের গোপীয়তা পছন্দ করে। অন্যদিকে, যারা সাধারণ মানুষ, তারা যদি তথ্য পান, তাহলে দুর্নীতি কমবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই এই আইনটি একটি যুগান্তকারী আইন; এতে কোনো সন্দেহ নাই। এজন্য সরকার সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

দুর্নীতি কী? নিয়মনীতি, আইনকানুন-পরিপন্থী কোনো কাজ করে, কাজে ক্ষমতার অপব্যবহার, তা-ই দুর্নীতি, অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন হলো দুর্নীতি। তথ্যের যদি অবাধ প্রবাহ থাকে, তাহলে এসব কাজ করা দুরূহ। দুর্নীতি দুই ধরনের হয়। উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি, সাধারণ পর্যায়ের দুর্নীতি। উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি করে বড় বড় আমলা, বড় বড় ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট পেশাজীবী জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ তারা। আর সাধারণ পর্যায়ে দুর্নীতি করে ছোট ছোট আমলা। এখন তথ্য অধিকার আইন দিয়ে যদি দুর্নীতি দমন করতে হয়, তার সাথে দরকার প্রচার-প্রচারণা Implementation। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অনেক জোরেশোরে একটা বিষয় চালু হয়েছিল, সেটা হলো সিটিজেন চার্টার। যারা সেবা প্রদান করে বা বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, তারা কী কী সার্ভিস ডেলিভারি করে, কখন করবে, কীভাবে করবে– যিনি সার্ভিস চাচ্ছেন তার ওপর। তাই তথ্য অধিকার আইনের Implementation, সিটিজেন চার্টার যেমন জরুরি, তেমনই ডিমান্ড সাইড তৈরি করা জরুরি। দুর্নীতি দমন করতে হলে আরেকটি জিনিস প্রয়োজন, সেটা হলো আইটির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সার্ভিস ডেলিভারি প্রতিষ্ঠানে যদি এর ব্যবহার বাড়ানো যায়, তাহলে সাধারণ জনগণ অনেকটাই দুর্নীতির হাত থেকে রেহাই পাবে। এতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। দুর্নীতি প্রসার রোধ করতে হলে তিনটি বিষয়– তথ্য অধিকার আইনের যে সচেতনতা তা বৃদ্ধি এবং এর যে Implementation সক্রিয় করা উচিত। তাহলে আমাদের জাতীয় আয় ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি দেড় থেকে দুই শতাংশ বাড়বে এবং দারিদ্র্য বিমোচন দ্রুততর হবে।

এখন যেটা হচ্ছে, আমাদের দেশের উন্নতি হচ্ছে উচ্চবিত্তের বা মধ্যবিত্তের। নিম্নবিত্তের মানুষেরা উন্নয়নের সুফল খুব কম পাচ্ছে; তাই দুর্নীতির দমন অত্যন্ত জরুরি, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সঞ্চালক

ধন্যবাদ, গোলাম রহমান, চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন। Now I would like to request US Ambassador to Bangladesh His Excellency Mr. James F. Moriarty to deliver his thought on RTI, how to move forward.

বিশেষ অতিথি

জেমস এফ মরিয়ার্টি, বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত

লিখিত বক্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব আবুল কালাম আজাদ

গণমাধ্যমের সদস্যবৃন্দ, সহকর্মীগণ, সুধীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার ও শুভ অপরাহ্ন!

আমি আমাদের সহযোগীদের সঙ্গে বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ওপর আজকের এই সময়োপযোগী ও অপরিহার্য সংলাপে অংশগ্রহণ করতে পেরে আনন্দিত। আজ এখানে গণমাধ্যম থেকে আগত আমাদের এতজন গণমাধ্যম পেশায় নবাগত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

সহকর্মীর উপস্থিতি দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আর সবশেষে, বাংলাদেশ সরকার, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি খাত থেকে আগত আমাদের বন্ধু ও সহযোগীদের দেখেও উৎসাহ বোধ করছি। আর আমাদের সঙ্গে আজকে এখানে যোগ দেওয়ার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রসারের প্রতি আপনার সরকার যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ– এখানে আপনার উপস্থিতিই তা প্রমাণ করে।

আমরা সকলেই জানি, যেকোনো গণতন্ত্রে তথ্য একটি অপরিহার্য অংশ। বিশেষত একটি সরকার ও তার জনগণের মধ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একধরনের সংলাপের ভূমিকা পালন করে, যার মাধ্যমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদিত হয়। এটা নাগরিকদের তথ্যাভিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। আর এটা সরকার পক্ষকেও মনে করিয়ে দেয় যে তাদের ক্ষমতা মূলত সেই জনগণের হাতেই রহিত, যাদের সেবা করা সরকারের দায়িত্ব। একই সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেয় যে, একটি তথ্যাভিজ্ঞ সমাজই হলো একটি অধিকতর স্থিতিশীল ও নিরাপদ সমাজ। প্রেসিডেন্ট ওবামার ভাষায়, 'একটি মুক্তমনা ও তথ্যবান্ধব সরকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবচেয়ে প্রগাঢ় জাতীয় প্রতিশ্রুতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হলো তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতা। আর এই প্রতিশ্রুতির মূলে রয়েছে এই ধারণা যে জবাবদিহিতা হলো সরকার ও নাগরিক উভয়ের জন্যই কল্যাণকর।'

এখানেই গণমাধ্যম অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে । তথ্য সংগ্রহের সব রকম সুযোগ রয়েছে, এমন একটি তথ্যাভিজ্ঞ গণমাধ্যম এই সংলাপকে আরও সুগম করে। এটা সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখে এবং যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঘটনা এবং মানুষ জনগণের জীবন ও দেশের ভবিষ্যতে প্রভাব ফেলতে পারে, তাদের সম্পর্কে জনগণ যাতে গভীর ও সঠিক তথ্য এবং বিশ্লেষণ লাভ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতার একটি বলিষ্ঠ ঐতিহ্য রয়েছে। আমাদের ইতিহাস জুড়েই সংবাদপত্র আমাদের গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এই বাংলাদেশেও আমরা একটি প্রাণবন্ত ও সক্রিয় গণমাধ্যম দেখতে পাই, যা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অব্যাহত উন্নয়নের একটি মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের গণতন্ত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যুক্ত হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর মাধ্যমে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার রোধকল্পে ও ভারসাম্য বজায় রাখার প্রক্রিয়ায় পেশাদার ও সঠিক সাংবাদিকতার গুরুত্ব যে কতখানি, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। বিশ্বজুড়ে পেশাদার সাংবাদিকরা নাগরিক-সচেতনতাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুশীল সমাজের লড়াইয়ে একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। তথ্যের স্বাধীনতা, তথ্য অধিকার ও অন্যান্য নাগরিক স্বাধীনতাগুলো এই লড়াইয়ের অনেক প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে এবং সকল খাতে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে 'সতর্ক প্রহরী' হিসেবে কাজ করে থাকে ।

পাশাপাশি, দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব ও দলবাজি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন। যে গণমাধ্যম বহিরস্থ প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন, সেটিই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম। প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সর্বোচ্চ মানের পেশাদারিত্ব নিয়ে গণমাধ্যম প্রয়োজনীয় সরকারি সংস্কারের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে, একটি 'প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে কাজ করতে পারে; আইনের শাসন জোরদার করতে সহায়তা করতে পারে এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা-সংবলিত পদ্ধতিগত সংস্কারসাধনে সহায়তা করে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এবং তা বুঝতে সহায়তা করতে বাংলাদেশের সরকার ও গণমাধ্যমকে এই সংলাপে সহযোগিতা করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিগত কয়েক মাসে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে 'ইউএসএআইডি'র প্রগতি প্রকল্পটি দেশব্যাপী আলোচনা সভা পরিচালনা করেছে। প্রগতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতীকী দুর্নীতিবিরোধী প্রকল্প। প্রগতি বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংস্কৃতির প্রসারে এবং একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী সাংবাদিক গড়ে তুলতে নবগঠিত তথ্য কমিশনসহ বাংলাদেশ সরকার ও সুশীল সমাজের সঙ্গে কাজ করে থাকে। এই লক্ষ্যে, প্রগতি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশের একমাত্র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমরা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আজকের আলোচ্য বিষয়, 'তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও

বাধাসমূহ'-এর ওপর অনেক ভালো ভালো সুপারিশ শুনেছি। যেসব তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিক এই তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করবে এবং এর থেকে লাভবান হবে, আজকের এই সুপারিশগুলো তাদেরই চিন্তাধারা ও মতামতের প্রতিফলন ঘটায়। আমি বিশ্বাস করি যে মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রণালয় এই বিষয়গুলো যত্ন সহকারে বিবেচনা করবেন। বাংলাদেশের অনেক পুরোনো মিত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের সরকার ও নাগরিকদের আইনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশের বাস্তবায়নের পথে বাধা-বিপত্তিগুলো পার করতে সহায়তা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

অবশেষে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রগতিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগে সহায়তা করতে পেরে গর্বিত। সংশ্লিষ্ট সকলের আমি সাফল্য কামনা করি এবং আগামী মাসগুলোতে এই বিষয়ে আরও শুনতে পাব বলে আশা করি।

ধন্যবাদ এবং খোদা হাফেজ।

মূল তথ্য উপস্থাপক

ড. অনন্য রায়হান, নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট

আমি একটি বিষয়ে শুধু আলোকপাত করতে চাই, এখানে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে সংক্ষিপ্তসার এর ৯৯ শতাংশ মতামত যেগুলো গ্রাসরুটসের বিভিন্ন বক্তারা বলেছেন, সেগুলো আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেছি। যেসব তথ্য-উপাত্ত এখানে বলা হয়েছে, ১০ শতাংশ কিংবা ২ শতাংশ কিংবা ৫ শতাংশ এগুলো মূলত বিভিন্ন বক্তার। তবে দুই শতাংশ এনজিও যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম তথ্য কমিশনে পাঠিয়েছে এ তথ্যটি আমি একজন সম্মানিত তথ্য কমিশনারের কাছ থেকে পাওয়া। এ বিষয়টি আমি ইতিমধ্যে এনজিও ব্যুরো রয়েছে তাদের সঙ্গেও একটু যাচাই করেছি। যে চার হাজার নিবন্ধিত এনজিও রয়েছে, যারা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত এবং কিছু এনজিও রয়েছে, যারা সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধিত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি বিদেশি অর্থ পেয়ে থাকে। সেই হিসেবে আমার মনে হয়েছে, বিষয়টি সত্যের কাছাকাছি। আমার মনে হয়, এই বিভ্রান্তিটি দূর করা দরকার ছিল। যেসব আলোচনা বা বক্তব্য আজকে এসেছে, সেগুলো আমরা আমাদের যে পরবর্তী সংকলন প্রকাশিত হবে, সেখানে আমরা সঠিকভাবে প্রকাশের চেষ্টা করব।

প্রধান অতিথি

আবুল কালাম আজাদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। Right to Information Act : How to move forward অনুষ্ঠানের পরিচালক হাসিবুর রহমান, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমান, চলে গেছেন জনাব মোহাম্মদ জমির, আমাদের তথ্যসচিব, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, এই সেমিনারের মূল তথ্য উপস্থাপক ড. অনন্য রায়হান, আলোচকবৃন্দ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান এবং ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম-সবাইকে আসসালামুআলাইকুম, নমস্কার and good afternoon his excelency. I thank you, you are here and for a long time, probably you understand some bangal word.

বিশ্বায়নের এই যুগে এই যে তথ্যপ্রবাহ এবং গণমাধ্যমের যে স্বাধীনতা, শুধু বাংলাদেশে না, পৃথিবীর সব জায়গাতেই আছে। গণতন্ত্রের একটা পূর্বশর্ত হলো অগ্রগতি করতে গেলে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান সরকার এ বিষয়ে যতটা সচেতন, আপনারা বলতে পারেন, এর আগে আর কোনো সরকার এমন ছিল? ছিল না। বর্তমান নির্বাচিত সরকার Free flow information-এ বিশ্বাস করে আর সে কারণে গুরুত্ব দিয়ে এ আইনটি আমরা পাস করেছে। তবে আইনটি পাস করার আগে এবং পরে কিছু কিছু কথা আসছে, আজকে যারা এখানে এসছেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন, তারা এখানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং এখানে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক তথ্য আছে, হয়তো পড়ে আপনারা উপকৃত হবেন। এই যে সচেতনতা সৃষ্টির করার জন্য আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিই। অবাধ তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার প্রভাব বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়নি। দু-একটা ঘটনা ঘটতে পারে, হয়তো দু-একজন কিছু বলে থাকতে পারেন কিন্তু সেটা তো সরকারের কমেন্ট না, সেটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি হেড অব দ্য গভর্নমেন্ট, আমাদের কোনো এমপি বা নেতা কোনো কমেন্ট করলে তা সরকারের কমেন্ট না।

তথ্যপ্রবাহে গণমাধ্যমের ভূমিকা আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আমরা কমিউনিটি রেডিও দিয়েছি, আরও টিভি চ্যানেল দিয়েছি এবং সংবাদ প্রচার ও পরিবেশনের গণমাধ্যমগুলি স্বাধীনভাবে যাতে কাজ করতে পারে সেজন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি এবং দেব। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন।

আমরা অবাধ, নিরপেক্ষ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করেছি। কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে সে সময় কী ছিল? সে সময় ছিল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল, সন্ত্রাস ছিল, কৃষক সার পাচ্ছিল না। সুতরাং এই সমস্যাগুলো তখন মনে রাখতে হয়েছে। সুতরাং তখন আমরা এই কাজগুলো করছিলাম। সাথে সাথে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর আমরা তথ্য অধিকার আইন পাস করেছি যাতে জনগণ তথ্য পায় এবং সাংবাদিকরা যাতে সঠিক তথ্য জোগাড় করে জনগণকে সঠিক তথ্য দিতে পারে, তার জন্য আমরা কাজ করছি। তার পরও তো আরও সমস্যা ছিল– আমাদের বিডিআর সমস্যা হয়েছিল, আইলা হয়েছে, ঢাকা শহরে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল। সরকার তো শুধু তথ্য অধিকার নিয়েই শুধু ব্যস্ত না। সরকারের প্রথম দায়িত্ব জনগণের কল্যাণ। সুতরাং আপনারা যারা এখানে আসছেন তারা এই বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করবেন। সরকারের অনেক অ্যাজেন্ডার মধ্যে একটি হলো তথ্য অধিকার আইন। তথ্য অধিকার আইন যাতে বাস্তবায়িত হয়, সেজন্য আমরা তথ্য কমিশন গঠন করেছি। সচিব সাহেব বলেছেন, আপনাদের এর জন্য অর্থ প্রয়োজন, লোকবল প্রয়োজন। তার পরও আপনাদের প্রধান তথ্য কমিশনার বলেছেন, তারা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, তারা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। ১৪ মাস বা এক বছরেই সবকিছু অর্জন সম্ভব নয়। এর জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। বিষয়টা বাংলাদেশে এত সহজ নয়; সরকারি কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। সুতরাং আমরা যারা রাজনীতি করি, আপনারা যারা বিভিন্ন পেশায় আছেন, তাদের মনে রাখতে হবে, আমরা যদি দেশকে ভালোবাসি, যারা দেশের জনগণকে ভালোবাসি, তাহলে আমাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। এ পরিবর্তন আনতে সময় লাগবে। একসময় বাংলাদেশকে বলা হচ্ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ, দুর্নীতির জন্য এইড দেয়া বন্ধ করে দিচ্ছিল। এগুলো থেকেও সরকারকে কাটিয়ে উঠতে হচ্ছে।

যুগ যুগ ধরে গোপনীয়তার সংস্কৃতি পরিবর্তনে সময় লাগবে। এখন সরকার এসব বিষয়ে কাজ করছে। আমরা সবাই যদি যার যার জায়গাতে ট্রান্সপারেন্ট হই, তাহলে দুর্নীতি এমনিতেই কমে আসবে।

যেকোনো আইন বা নীতিমালা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, এর বাস্তবায়ন জরুরি। বাংলাদেশে অনেক আইন আছে, যা আমরা মানি না। যেমন ট্রাফিক সিগন্যাল। উন্নত দেশে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আইন মানা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে আমরা মানি না।

তথ্য অধিকার আইন যতটা বাস্তবায়ন করা যাবে ততই সাধারণ মানুষ এর সুবিধা পাবে। এজন্য বিপিএটিসিতে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও আমরা করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি ২০২১ সালের মধ্যে। সুতরাং এ ব্যাপারেও আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। তথ্যের ভান্ডার করার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যাতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা প্রশাসকের কাছে মানুষ তথ্য পায় সে ব্যাপারে আমরা কর্মসূচি নিয়েছি। আসলে যারা এই আইন ব্যবহার করবে, যারা তথ্য দেবে তাদের সবাইকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সুইডেনে এই আইন হয়েছে সবার আগে, সেখানে কিন্তু দুর্নীতি ছিল না। সুতরাং আমাদের সেভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। ব্যারিস্টার তানজিব ও অনন্য রায়হান, চলেন, আমরা অন্যের সমালোচনা না করে আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আইনটা বাস্তবায়ন করি। মিডিয়াকেও এভাবে ইতিবাচকভাবে কাজ করতে হবে। আপনারা জানেন, গ্রামের মানুষ যাতে তথ্য পায়, আমরা তাই ১৪টি কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করছি। সুতরাং আমরা কাজ করছি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলেই জনগণ এর সুফল পাবে। তাহলেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আমি একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কমিটেট এবং পার্টিকুলার তথ্য অধিকার আইন নিয়ে। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি তার নির্দেশনা মতো। তথ্য কমিশনে আর্থিক ও জনবলের কারণে কিছু দুর্বলতা থাকতেই পারে; আমরা তা ধীরে ধীরে ওভারকাম করছি।

এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন, যারা প্রশ্ন করেছেন, মূল্যবান মতামত দিয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ। যেকোনো প্রয়োজনে তথ্য মন্ত্রণালয়ে আপনাদের আমন্ত্রণ রইল। ধন্যবাদ সবাইকে।

সঞ্চালক

মনজুরুল আহসান বুলবুল
সিইও এবং প্রধান বার্তা সম্পাদক, বৈশাখী টিভি

ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে। আমি শুধু একটি কথাই বলতে চাই, এই আইনটি যখন ছিল না তখনো কিন্তু আমরা সাংবাদিকতা করেছি, এখন এই আইনটি একটি সহায়ক হিসেবে আমাদের এখন সাহায্য করবে। এটি আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এ আইনটি শুধু সাংবাদিকদের জন্য নয়। আইনটি সাধারণ মানুষের। এখন যেকোনো তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে জনগণকেও আমরা সাথে নিতে পারি।

সভাপতি

হাসিবুর রহমান মুকুর, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবর্গকে। তথ্যমন্ত্রী মহোদয়, তথ্যসচিব, আমেরিকার রাষ্ট্রদূত, ইফতেখার ভাই, তানজিব ভাই, রায়হান ভাই ও শাহীন আপা– পুরো সময়টায় উপস্থিত ছিলেন। তাদের দীর্ঘসময় ধরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা প্রমাণ করে, এই আইন বাস্তবায়নের প্রতি তাদের কমিটমেন্ট। একটি কথা বলব, আইনটি হয়েছে, এবং তার অনেক দুর্বল দিক আছে। কিন্তু আমরা প্রথমেই সেই দুর্বল দিকগুলো নিয়ে আলোচনা না করে যদি এর ভালো দিকগুলো নিয়ে এগিয়ে যাই, তাতে আমাদের আইনটি বাস্তবাস্তবায়ন আরও গতিশীল হবে বলে আমি মনে করি।

ধন্যবাদ ইউএসএআইডি প্রগতিকে, যারা আমাদের এই উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রগতির অ্যাডভাইসরি গ্রুপ মেম্বারদের। My heartiest thanks and gratitude to my friends who can not speak in Bangla to be here with us। আমার প্রিয় বুলবুল ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সময়মতো অনুষ্ঠানটি শেষ করা এবং সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের তালিকা

খুলনা বিভাগ
হোটেল রয়েল, খুলনা, ৫ জুন ২০১০

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
০১.	ড. অনন্য রায়হান	নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট (সঞ্চালক)
০২.	তানজিব-উল আলম	অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট (মূল তথ্য উপস্থাপক)
০৩.	এস এম হাবিব,	স্টাফ রিপোর্টার এটিএন বাংলা, খুলনা (সমন্বয়কারী)
০৪.	সত্যেন্দ্র কুমার সরকার	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা
০৫.	এম মুজিবুর রহমান	পরিচালক, গণগবেষণা ও উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, যশোর
০৬.	মো. সিরাজুল ইসলাম	সহকারী পুলিশ কমিশনার, সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা
০৭.	মবিনুল ইসলাম মবিন	সম্পাদক, দৈনিক গ্রামের কাগজ, যশোর
০৮.	তৌহিদুর রহমান	সম্পাদক, প্রেসক্লাব, যশোর
০৯.	জিনাত আরা আহমেদ	উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, খুলনা
১০.	ম জাভেদ ইকবাল	সিনিয়র তথ্য অফিসার, পিআইডি, খুলনা
১১.	নার্গিস ফাতেমা জামিন	জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা
১২.	জহির ঠাকুর	জেলা প্রতিনিধি, এটিএন বাংলা, নড়াইল
১৩.	শিরীন আফরোজা	প্রজেক্ট ম্যানেজার, ২য় ইউপিএইচ সিপিপিএ-২, খুলনা সিটি করপোরেশন
১৪.	কাজী হাফিজুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, স্বাবলম্বী, নড়াইল
১৫.	প্রভাষ চন্দ্র বিশ্বাস	প্রকল্প ব্যবস্থাপক, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ
১৬.	অ্যাড. শামীমা সুলতানা শীলু	প্রধান নির্বাহী, মাসেস, খুলনা
১৭.	অনিতা রায়	নির্বাহী পরিচালক, কাত্তাপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা, বাগেরহাট
১৮.	মো. কামরুজ্জামান	নির্বাহী পরিচালক, আস বাংলাদেশ, বাগেরহাট
১৯.	সোহেল শামীম	অ্যাডভোকেট, জেলা আইনজীবী সমিতি, যশোর
২০.	আশেক-ই-এলাহী	সম্পাদক, প্রগতি, সাতক্ষীরা
২১.	কাজী শহিদুল হক রাজু	উত্তরণ, সাতক্ষীরা
২২.	গৌরাঙ্গ নন্দী	সিনিয়র রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, খুলনা
২৩.	শামীম আরফীন	নির্বাহী পরিচালক, অ্যাওসেড
২৪.	প্রফেসর সাধন ঘোষ	উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক জন্মভূমি, খুলনা
২৫.	আহমদ আলী খান	সভাপতি, খুলনা প্রেস ক্লাব, নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক পূর্বাঞ্চল
২৬.	স্বপন গুহ	নির্বাহী পরিচালক, রূপান্তর
২৭.	খান মো. রেজাউল করিম	অতি. জেলা প্রশাসক (রা.), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা
২৮.	শিল্পী হারুণ	কো-অর্ডিনেটর, প্রদীপন, খুলনা
২৯.	মিজানুর রহমান পান্না	প্রধান কো-অর্ডিনেটর, রূপান্তর

রাজশাহী বিভাগ

অ্যারিস্টোক্রেট, রাজশাহী, ১৯ জুন ২০১০

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
০১.	ফরিদ হোসেন	ব্যুরো-প্রধান, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (সঞ্চালক)
০২.	ড. অনন্য রায়হান	নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট (মূল তথ্য উপস্থাপক)
০৩.	মো. আনোয়ার আলী	নিজস্ব প্রতিনিধি, দি ডেইলী স্টার, রাজশাহী (সমন্বয়কারী)
০৪.	ফরিদুল করিম	জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক কালের কণ্ঠ, নওগাঁ
০৫.	হাসান মিল্লাত	বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সোনালী সংবাদ, রাজশাহী
০৬.	মো. হাসিব হোসেন	নির্বাহী পরিচালক, প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৭.	মো. হাসিবুর রহমান বিলু	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার, বগুড়া
০৮.	ড. এম আনিসুর রহমান	ডিন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
০৯.	মো. আবদুস সালাম	আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটি, রাজশাহী মহানগর
১০.	ফজলুল হক	সভাপতি, সুপ্র, রাজশাহী
১১.	মো. আব্দুস সামাদ	ব্লাস্ট, সমন্বয়কারী
১২.	মো. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী শাহীন	প্রধান নির্বাহী, মোতরাজ গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও
১৩.	এ কে আজাদ	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি
১৪.	এ এফ এম আমির উদ্দীন	আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, শরিক, লোকাল গর্ভনেন্স প্রোগ্রাম, ইন্টার কোঅপারেশন
১৫.	মুহাম্মদ লুৎফুল হক	নির্বাহী পরিচালক, ক্যাম্পেইন ফর রাইট টু ইনফরমেশন, রাজশাহী
১৬.	মো. হাফিজুর রহমান	কো-অর্ডিনেটর, টিডিসি পল্লী তথ্য কেন্দ্র, রাজশাহী
১৭.	মো. সিরাজুল হক সরকার	গবেষণা কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিস রাজশাহী
১৮.	মো. শহীদুল ইসলাম মুন্সী	জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, রাজশাহী
১৯.	বিধান চন্দ্র কর্মকার	উপপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, রাজশাহী
২০.	মোহন আখন্দ	ব্যুরো-প্রধান, দৈনিক সমকাল, বগুড়া ব্যুরো
২১.	ফেরদৌসী বেগম	নির্বাহী পরিচালক, গ্রামীন আলো, বগুড়া
২২.	চিত্ত ঘোষ	জেলা বার্তা পরিবেশক, দৈনিক সংবাদ, দিনাজপুর
২৩.	ডা. কামরুন নাহার	শিরোইল আরবান ডিসপেনসারি, রাজশাহী
২৪.	শাহীনা লাইজু	কো-অর্ডিনেটর, আলো, নাটোর
২৫.	মো. আব্দুল করিম	উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সজেকা, রাজশাহী
২৬.	ড. হাসিবুল আলম প্রধান	সহযোগী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৭.	ফরিদা ইয়াসমিন	সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী
২৮.	আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রাজশাহী
২৯.	জিএম ইকবাল হাসান	নিজস্ব সংবাদদাতা, দৈনিক জনকণ্ঠ, নাটোর
৩০.	মো. আনোয়ার আলী	নিজস্ব প্রতিনিধি, দি ডেইলি স্টার, রাজশাহী

চট্টগ্রাম বিভাগ

হোটেল আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, ৩১ জুলাই ২০১০

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
০১.	ড. অনন্য রায়হান	নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট (সঞ্চালক)
০২.	তানজিব-উল আলম	অ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট (মূল তথ্য উপস্থাপক)
০৩.	এম. নাসিরুল হক	নগর সম্পাদক, সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম (সমন্বয়কারী)
০৪.	সৈয়দ কামরুল আনোয়ার	চট্টগ্রাম সহকারী প্রধান, পরিচালক (স্বাস্থ্য)-এর দপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ
০৫.	মো. শফিকুল ইসলাম	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম
০৬.	আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন	উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
০৭.	এস এম শাব্বির হাসান	উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
০৮.	মোহা. ইকবাল	জেলা কর্মকর্তা, এফপিএবি, কক্সবাজার
০৯.	মুনির হেলাল	পরিচালক, কার্যক্রম কোডেক, চট্টগ্রাম
১০.	মাহমু	হিসাব রক্ষক, গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, বান্দরবান
১১.	নার্গিস আক্তার	সমন্বয়কারী, এভাব, কুমিল্লা
১২.	ইয়াছমীন রীমা	নিউ এইজ প্রতিনিধি, কুমিল্লা
১৩.	মং থোয়াইচিং	নির্বাহী পরিচালক, গ্রীনহিল, রাঙ্গামাটি
১৪.	মুহাম্মদ আলী জিন্নাত	নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক রূপসী গ্রাম, কক্সবাজার
১৫.	শিশির দত্ত	নির্বাহী পরিচালক, বিটা, চট্টগ্রাম
১৬.	সুনীল কান্তি দে	পার্বত্য অঞ্চল প্রতিনিধি, দৈনিক সংবাদ, রাঙ্গামাটি
১৭.	ধীমান খীসা	সেক্রেটারি, টংগ্যা
১৮.	মনিরুল ইসলাম মনু	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, বান্দরবান
১৯.	হরি কিশোর চাকমা	স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, রাঙ্গামাটি
২০.	হোসনে আরা বেগম	জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম
২১.	অনুজনা ভট্টাচার্য	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
২২.	আখতার কবীর চৌধুরী	আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটি টিআইবি, চট্টগ্রাম
২৩.	নাজমুল বরাত রনি	প্রোগ্রাম অফিসার, ইপসা, চট্টগ্রাম
২৪.	এম. নাসিরুল হক	নগর সম্পাদক, সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম
২৫.	দ্বৈপায়ন বড়ুয়া	স্টাফ রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার
২৬.	রেজাউল করিম চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি

বরিশাল বিভাগ

বিডিএস কনফারেন্স রুম বরিশাল, ৯ আগস্ট ২০১০

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
০১.	ফরিদ হোসেন	ব্যুরো-প্রধান, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (সঞ্চালক)
০২.	মো. মইনুল কবির	আইন বিশেষজ্ঞ (মূল তথ্য উপস্থাপক)
০৩.	লিটন বাশার	ব্যুরো-প্রধান, দৈনিক ইত্তেফাক (সমন্বয়কারী)
০৪.	রহিমা সুলতানা	নির্বাহী পরিচালক, আভাস
০৫.	সৈয়দ দুলাল	সম্পাদক, দৈনিক পরিবর্তন
০৬.	মো. খায়রুল বারী	এরিয়া ম্যানেজার, নুলক, বরিশাল
০৭.	ইসহাক আলি মিজান	নির্বাহী পরিচালক, ইয়েস বাংলাদেশ
০৮.	সোহেল হাফিজ	জেলা প্রতিনিধি, এনটিভি ও দৈনিক কালের কণ্ঠ
০৯.	নাসিম আলী	স্টাফ রিপোর্টার, ইত্তেফাক, পিরোজপুর অফিস
১০.	মেজর তুহিন মোহাম্মদ মাসুদ	পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, নুলক, বরিশাল
১১.	মো. সিরাজুল হক মল্লিক	সহকারী তথ্য অফিসার, বিভাগীয় তথ্য অফিস বরিশাল
১২.	সৈয়দ গোলাম মাসউদ বাবলু অ্যাডভোকেট	সাবেক সম্পাদক, বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতি, বরিশাল
১৩.	পঙ্কজ রায় চৌধুরী	জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, বরিশাল
১৪.	মো. সিরাজুল হক	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরিশাল
১৫.	মো. মনিরুজ্জামান	উপ-পুলিশ কমিশনার, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ, বরিশাল
১৬.	লুৎফুন্ নাহার আফরোজ	সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিস, বরিশাল
১৭.	মো. আনছার উদ্দিন	উপাধ্যক্ষ, সরকারি বিএম কলেজ, বরিশাল
১৮.	এইচ এম আখতারুজ্জামান	নির্বাহী পরিচালক, দুস্থ মানব উন্নয়ন সোসাইটি নলছিটি, ঝালকাঠি
১৯.	জিয়াউল আহসান	নির্বাহী পরিচালক, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, পিরোজপুর
২০.	এ কে এম খালেক	নির্বাহী পরিচালক, আরডিএম, বাউফল, পটুয়াখালী
২১.	জাকির হোসেন মাহিন	নির্বাহী পরিচালক, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, ভোলা
২২.	মো. নেয়ামত উল্যাহ	জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক প্রথম আলো, ভোলা
২৩.	মো. ফুলকাম বাদশাহ	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি
২৪.	লিটন বাশার	সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল প্রেসক্লাব
২৫.	মো. শফিউল ইসলাম সৈকত	ঝালকাঠি সংবাদদাতা, দৈনিক ইত্তেফাক
২৬.	বেলায়েত বাবলু	জনসংযোগ কর্মকর্তা, বরিশাল সিটি করপোরেশন
২৭.	মো. মনিরুল ইসলাম	জেলা নির্বাচন অফিসার, বরিশাল
২৮.	কাজল বরণ দাস	এনটিভি ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রতিনিধি, বরিশাল
২৯.	অ্যাড. মো. শহীদুল ইসলাম	কো-অর্ডিনেটর, আভাস, বরিশাল
৩০.	মো. শফিউল আযম	ডকুমেন্টেশন অফিসার, আইসিডিএ
৩১.	শেখ রফিক	গবেষণা প্রতিনিধি, ডি.নেট
৩২.	আবুল কাসেম	এমএলএসএস, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
৩৩.	প্রদীপ দাস	কোঅর্ডিনেটর, আভাস, বরিশাল

জাতীয় সেমিনার

২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০, ঢাকা শেরাটন, ঢাকা

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১.	আবুল কালাম আজাদ	মাননীয় তথ্যমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (প্রধান অতিথি)
২.	শাহীন আনাম	নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশান (বিশেষ অতিথি)
৩.	জেমস এফ মরিয়ার্টি	বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত (বিশেষ অতিথি)
৪.	ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয় (বিশেষ অতিথি)
৫.	গোলাম রহমান	চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন (বিশেষ অতিথি)
৬.	মোহাম্মদ জমির	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ (বিশেষ অতিথি)
৭.	মনজুরুল আহসান বুলবুল	এডিটর ইন চিফ এন্ড সিইও, বৈশাখী টিভি (সঞ্চালক)
৮.	ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম	(আলোচক)
৯.	ড. ইফতেখারুজ্জামান	নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (আলোচক)
১০.	ড. অনন্য রায়হান	নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট (মূল তথ্য উপস্থাপক)
১১.	হাসিবুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই (সভাপতি)
১২.	লিটন বাশার	ব্যুরো চিফ, ইত্তেফাক, বরিশাল
১৩.	মো. আমির খসরু	ডেপুটি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, সিঅ্যান্ডএজি বাংলাদেশ
১৪.	চিত্র ঘোষ	জেলা বার্তা পরিবেশক, সংবাদ, দিনাজপুর
১৫.	পুলক চ্যাটার্জি	ব্যুরো-প্রধান, দৈনিক সমকাল, বরিশাল
১৬.	শাহানা হুদা	কো-অর্ডিনেটর মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
১৭.	কায়েদ-ই-আজম	প্রধান নির্বাহী, এওয়াক, চিটাগাং
১৮.	মুহাম্মদ লুৎফুল হক	ক্যাম্পেইন ফর রাইট টু ইনফরমেশন, রাজশাহী
১৯.	মোয়াজ্জেম হোসেন	সম্পাদক, ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস
২০.	সেরিনা তাবাসসুম	গর্ভানেন্স অ্যাডভাইজর, ইউএসএআইডি
২১.	হাসান মজুমদার	কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন
২২.	আসাদুজ্জামান সেলিম	নির্বাহী প্রধান, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), মেহেরপুর
২৩.	শরিফা খাতুন	পরিচালক, ওয়েল ফেয়ার এফোর্টস (উই), ঝিনাইদহ
২৪.	রহিমা সুলতানা কাজল	নির্বাহী পরিচালক, আভাস, বরিশাল
২৫.	হাসানাত কামাল	জেলা প্রতিনিধি, বিটিভি/নিউ এইজ
২৬.	মাহমুদা আক্তার	সভানেত্রী, হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, কুমিল্লা
২৭.	স্বপন খন্দকার	মায়বায়দিন, বরিশাল
২৮.	মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইএসডিই, কক্সবাজার
২৯.	আইরিন খান	কনসাল্টিং এডিটর, ডেইলি স্টার
৩০.	হিউ ওয়োজকো	চিফ অব পার্টি, প্রগতি

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৩১.	মিজানুর রহমান	বিভাগীয় প্রধান, নিজেরা করি
৩২.	রফিকুল ইসলাম	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ
৩৩.	প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য	পিআরও, দুদক
৩৪.	সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ	নির্বাহী পরিচালক, শিশুক
৩৫.	শামীম আরা শিউলি	মিডিয়া প্রোগ্রাম অফিসার, প্রগতি
৩৬.	তালেয়া রহমান	নির্বাহী পরিচালক, ডেমক্রেসিওয়াচ
৩৭.	ফরিদ হোসেন	ব্যুরো চিফ, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস
৩৮.	ইকরাম চৌধুরী	ফটোসাংবাদিক, পিআইডি
৩৯.	সঞ্জীব দ্রং	সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী ফোরাম
৪০.	মঞ্জুর মোর্শেদ	পরিচালক (ইন চার্জ), দুদক, খুলনা বিভাগ
৪১.	মেজর তুহিন মোহাম্মদ মাসুদ	পরিচালক, দুদক, বরিশাল
৪২.	মেজর মো. শফিকুল ইসলাম	পরিচালক, দুদক, রাজশাহী
৪৩.	হরি কিশোর চাকমা	স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, রাঙ্গামাটি
৪৪.	আব্দুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, আরডিসি, ঝিনাইদহ
৪৫.	মনিরুল ইসলাম মনু	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, বান্দরবান
৪৬.	মবিনুল ইসলাম মবিন	সম্পাদক, গ্রামের কাগজ, যশোর
৪৭.	ইয়াছমীন রিমা	জেলা সংবাদদাতা, নিউ এইজ, কুমিল্লা
৪৮.	মোহন আখন্দ	ব্যুরো প্রধান, দৈনিক সমকাল বগুড়া
৪৯.	সৈকত দেওয়ান	জেলা সংবাদদাতা, দৈনিক প্রথম আলো, খাগড়াছড়ি
৫০.	আলম পলাশ	ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক চাঁদপুর, চাঁদপুর
৫১.	মাহমুদা শেলী	মহাপরিচালক, দুর্বার নেটওয়ার্ক
৫২.	মিনা রানী সরকার	নির্বাহী পরিচালক, নারী-ও-শিশু বিকাশ কেন্দ্র
৫৩.	সংগ্রাম সিংহ	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর, সিলেট
৫৪.	গৌরাঙ্গ পাত্র	নির্বাহী পরিচালক, পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদ (পাসকপ), সিলেট
৫৫.	সুগত ধর	ম্যানেজার ট্রেনিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন, বিটা, চট্টগ্রাম
৫৬.	ড. এম আনিসুর রহমান	ডিন, আইন অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
৫৭.	সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক, হিড্রো, চাঁদপুর
৫৮.	মো. হারুন-অর-রশিদ	নির্বাহী পরিচালক, লাইট হাউজ, বগুড়া
৫৯.	সামসুল হাসান মীরন	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, নোয়াখালী
৬০.	মো: হাসিবুর রহমান বিলু	সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, দি ডেইলি স্টার, বগুড়া
৬১.	সুকান্ত গুপ্ত অলক	যুগ্ম সম্পাদক, দেশ টিভি
৬২.	জিনাত রহমান	এমঅ্যান্ডই ম্যানেজার, প্রগতি
৬৩.	ওমর ফারুক	রিপোর্টার, দিগন্ত টিভি
৬৪.	মেজর মো. মেসবাহুল ইসলাম	পরিচালক, দুদক, চট্টগ্রাম

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৬৫.	এস এম হাবিব	স্টাফ রিপোর্টার, এটিএন বাংলা, খুলনা
৬৬.	এম. নাসিরুল হক	নগর সম্পাদক, সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম
৬৭.	সুনীল কান্তি দে	পার্বত্য অঞ্চল প্রতিনিধি, দৈনিক সংবাদ, রাঙ্গামাটি
৬৮.	সেকেন্দার আলী	পরিচালক, সোপান, সাতক্ষীরা
৬৯.	বিশ্বনাথ রায়	কো-অর্ডিনেটর, প্রদীপন, খুলনা
৭০.	হাসিব নওয়াজ	রিপোর্টিং অফিসার, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, যশোর
৭১.	অ্যাড. শামীমা সুলতানা শীলু	প্রধান নির্বাহী, মাসাস খুলনা
৭২.	আনোয়ার সাদাৎ ইমরান	নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক প্রগতির আলো, টাঙ্গাইল
৭৩.	সৈয়দ দুলাল	সম্পাদক, দৈনিক পরিবর্তন, বরিশাল
৭৪.	হাসান মিল্লাত	বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সোনালী সংবাদ
৭৫.	মুহাম্মদ আলী জিন্নাত	নির্বাহী সম্পাদক
৭৬.	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য শংকর	বার্তা সম্পাদক, দৈনিক করতোয়া, বগুড়া
৭৭.	আরিফ রেহমান	স্টাফ রিপোর্টার, যায়যায়দিন, বগুড়া
৭৮.	অরুণ চক্রবর্তী	লেকচারার, হাটকরই ডিগ্রি কলেজ, নন্দীগ্রাম, বগুড়া
৭৯.	আব্দুল মুকিত	সম্পাদক, দৈনিক শ্যামল সিলেট, সিলেট
৮০.	বিপ্লব কুমার বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক, রিক
৮১.	ইমরান আলম	স্টাফ রিপোর্টার, নয়া দিগন্ত
৮২.	আমিনুল এহসান	টিম লিডার, রূপান্তর
৮৩.	শামীমা সুলতানা	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ম্যাব
৮৪.	আফসানা জাহান	রিপোর্টার, মোহনা টিভি
৮৫.	ইসরাত জামান	রিপোর্টার
৮৬.	দীপা চৌধুরী	দৈনিক ইনকিলাব
৮৭.	সাঈদা ইসলাম	এবিসি রেডিও
৮৮.	আলী যুনায়েদ	ক্যামেরাম্যান, এনটিভি
৮৯.	মো. খোরশেদ আলম খান	কম্পোনেন্ট ম্যানেজার, প্রগতি
৯০.	আরেফিন মাসুদ	রিপোর্টার, বিটিভি
৯১.	কামাল আহমেদ	বাংলাদেশ বেতার
৯২.	সৈয়দা নাজনীন ফেরদৌসী	সিনিয়র প্রেস অফিসার, ব্রিটিশ হাইকমিশন
৯৩.	পরিমল পালমা	সিনিয়র রিপোর্টার, দি ডেইলি স্টার
৯৪.	ইরাজিন ওয়াদুদ	রিপোর্টার, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস
৯৫.	অমিতা দে	সিভিল সোসাইটি কম্পোনেন্ট ম্যানেজার, প্রগতি
৯৬.	মো. দেলোয়ার হোসেন	বিটিভি
৯৭.	শাহিন আকতার	নিউ এইজ
৯৮.	নিবারণ বড়ুয়া	রিপোর্টার, বাংলাদেশ প্রতিদিন

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৯৯.	শেখ আদনান ফাহাদ	রিপোর্টার, ইউএনবি
১০০.	তারেক মাহমুদ	মাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার
১০১.	আরাফাত সিদ্দিকী	রিপোর্টার, এনটিভি
১০২.	মনজুরুল আলম	রিপোর্টার, ইটিভি
১০৩.	সাব্বির নেওয়াজ	রিপোর্টার, সমকাল
১০৪.	শামীম আহসান	কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন অফিসার, ইউনেস্কো বাংলাদেশ
১০৫.	আশীষ সৈকত	রিপোর্টার, প্রথম আলো
১০৬.	নেপাল চন্দ্র সরকার	সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
১০৭.	আজিজুল পারভেজ	রিপোর্টার, দৈনিক কালের কণ্ঠ
১০৮.	মাহফুজ কবির	রিসার্চ ফেলো, বিআইএসএস
১০৯.	মাসুম	রিপোর্টার, বাংলাদেশ বেতার
১১০.	এম. ইমামুল হক	হেড অব এক্সটারনাল রিলেশন, বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি
১১১.	আশরাফ মাসুদ	রিপোর্টার, ইটিভি
১১২.	মো. মইনুল কবির	আইন বিশেষজ্ঞ
১১৩.	জামিল আহমেদ	চিফ, যাত্রি
১১৪.	আরিয়ান স্টালিন	রিপোর্টার, তারা নিউজ
১১৫.	মনিরুল আলম	রিপোর্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট
১১৬.	মো. নাজমুল	নিউজ অ্যান্ড ইমেজেস
১১৭.	নাভেদ ইশতিয়াক তরু	রিপোর্টার, বাংলানিউজ২৪.কম.বিডি
১১৮.	রুহুল আমিন	স্টাফ রিপোর্টার, বাংলাদেশ বেতার
১১৯.	মাহমুদুল করিম চঞ্চল	সিনিয়র রিপোর্টার, চ্যানেল আই
১২০.	তানবির সিদ্দিকী	সভাপতি, চেঞ্জ মেকার
১২১.	ডায়ান কুশিনান	ডেমোক্রেসি অ্যাডভাইজার, ইউএসএইড
১২২.	জাহিদ হোসেন	মিডিয়া কম্পোনেন্ট ম্যানেজার, প্রগতি
১২৩.	কোহিনুর বেগম	ডেপুটি ডাইরেক্টর, বিএনডব্লিইএলএ
১২৪.	আরিফা এস. শারমিন	কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ
১২৫.	ইয়াসিন মনজু	নির্বাহী পরিচালক, মাইশা, চট্টগ্রাম
১২৬.	কাজী আলী রেজা	অফিস-ইন চার্জ, ইউনিক
১২৭.	রোখসানা খন্দকার	নির্বাহী পরিচালক, খান ফাউন্ডেশন
১২৮.	তরিকুল ইসলাম	রিপোর্টার, আমাদের সময়
১২৯.	মাসুম বিল্লাহ্	রিসার্চ ফেলো, ডি.নেট
১৩০.	মো. বেলাল উদ্দিন	হেড অ্যাডভোকেসি, অ্যালাইভ অ্যান্ড থ্রাইভ
১৩১.	জান্নাতুল ফেরদৌস	রিপোর্টার, বিডিনিউজ২৪.কম
১৩২.	এস এম শিবলী রহমান	প্রোগ্রাম অফিসার, চেঞ্জ মেকার

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১৩৩.	আসিফ আহমেদ	রিপোর্টার, যায়যায়দিন
১৩৪.	সাইফুল ইসলাম কল্লোল	সিনিয়র ফটো জার্নালিস্ট, প্রথম আলো
১৩৫.	সুজানা রহমান	স্টাফ রিপোর্টার, দেশ টিভি
১৩৬.	তরুণ কুমার	রিপোর্টার, দেশ টিভি
১৩৭.	উমা চৌধুরী	পরিচালক, সুপ্র
১৩৮.	মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল	সিনিয়র রিপোর্টার, যুগান্তর
১৩৯.	মেরিনা ইয়াসমিন	হেড, প্রেস সেকশন, আমেরিকান দূতাবাস
১৪০.	এ এইচ এম বজলুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন
১৪১.	জাকির হোসেন	চিফ ফটোগ্রাফার, দি ডেইলি সান
১৪২.	রালফ ফ্রেমোলিনো	মিডিয়া কনসালটেন্ট
১৪৩.	মীর আসলাম	পাবলিক রিলেশন অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়
১৪৪.	মো. জাহিদ হোসেন	প্রাক্তন সচিব, ব্রিজ ডিভিশন
১৪৫.	মো. মখলেছুর রহমান	মাননীয় চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন
১৪৬.	সিরাজ	স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা নিউজ২৪.কম
১৪৭.	হাসানুল শাওন	স্টাফ রিপোর্টার, দিগন্ত টিভি
১৪৮.	রহমান মাসুদ	স্টাফ করেসপন্ডেন্ট
১৪৯.	নাসিম শিকদার	ফটোজার্নালিস্ট, নয়া দিগন্ত
১৫০.	রাহাদ ইজাজ	ডিপ্লোমেটিক কোরেসপনডেন্ট, প্রথম আলো
১৫১.	রাশেদউজ্জামান	ফটোজার্নালিস্ট, বিডিনিউজ২৪.কম
১৫২.	উজ্জ্বল আজিম	প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, আইপিডিএস
১৫৩.	সফর রাজ হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রাম অ্যাডভাইজর, প্রগতি
১৫৪.	মো. মোরশেদুর রহমান	স্টাফ রিপোর্টার, বিএসএস
১৫৫.	রাহাত মিনহাজ	রিপোর্টার, এটিএন বাংলা
১৫৬.	শেখ নজরুল ইসলাম	অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর, বৈশাখী টিভি
১৫৭.	শান্ত	রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব
১৫৮.	মোস্তাফিজুর রহমান	ফটো এডিটর, অর্থকণ্ঠ
১৫৯.	নাইমুল হক	বার্তা সম্পাদক, জেটিভি
১৬০.	এস বাবলু	রিপোর্টার, দৈনিক ইনকিলাব
১৬১.	মো. মামুন-উর-রশিদ	রিপোর্টার, নিউজ অ্যান্ড ইমেজেস
১৬২.	আলী আহমদ	রিপোর্টার, বাংলাদেশ বেতার
১৬৩.	ফেরদৌস আরেফিন	রিপোর্টার, ইসলামিক টিভি
১৬৪.	হুমায়ুন কবির	রিপোর্টার, বাংলাদেশ বেতার

‘একটা সময় আমাদের ধারণা ছিল যে
ঈশ্বর বাস করেন টাকায়, কিন্তু বর্তমানে আমরা
এমন একটা সময়ে উপনীত হয়েছি যে
এখন ঈশ্বর বাস করেন তথ্যে।’

—সাংবাদিক, চট্টগ্রাম বিভাগ